গাথা গীতিকায় চিরন্তনী বাঙলা

অজিত কুমার মিত্র

সেঞ্চুরী পাবলিশার্স
৫৩ পটুয়াটোলা লেন
কলিকাতা-৯

প্রকাশক
শ্রীবিমলেন্দু হুই
৫৩, পটুয়াটোলা লেন
কলিকাতা-১

প্রথম প্রকাশ
রথযাত্রা, ১৩৬৫

মুদ্রক
শ্রীগৌরচন্দ্র ভুক্ত
মুদ্রণ ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিমিটেড
১৫৪, তারক প্রামাণিক রোড, কলিকাতা—৬

ভূমিকা

সাম্প্রতিককালে লোক সংস্কৃতির পটভূমিকায় মানব সমাজের বিচিত্র গতি প্রকৃতির এক সুসম্বদ্ধ চিত্র ফুটিয়ে তোলার প্রতি অনেকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। মানুষের জীবনের বিভিন্ন রীতি-নীতি, শিল্প, ধর্ম, সাহিত্য, সংগীত প্রভৃতির এক বিধিবদ্ধ সংমিশ্রনই হল তার সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতির আলোচনায় সামাজিক মানুষের এক ছন্দময়রূপ ধরা পড়ে। জীবনের তালে তালে বয়ে চলে সংস্কৃতির এই প্রবাহ। একের পরিবর্তন অপরের মধ্যে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করে। লৌকিক সংস্কৃতিই হল বঙ্গ সংস্কৃতির মূল ভিত্তি। বৃহত্তর বাংলার সাংস্কৃতিক রূপ তাই প্রভাবিত হয়েছে বিভিন্ন লৌকিক উপকরণে। যুগযুগ ধরে এগুলোই গ্রামবাংলার সামাজিক জীবনের ধারাকে সঞ্জীবিত করেছে—কর্মক্লান্ত জীবনে এরাই যুগিয়েছে প্রেরণা, মনে করেছে আনন্দসঞ্চার। দৈনন্দিন জীবনের টানা-পোড়েনে ব্যতিব্যস্ত মানুষ পালপার্বন, লোকাচার, উৎসব অনুষ্ঠান ও শিল্প সাহিত্যের মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করেছে আর আয়ত্ত করতে চেয়েছে অজনাকে, অসীমকে। এই জানার বিরাম নেই, শেষ নেই। এই সব তথ্যাবলীর বিশ্লেষণপূর্ণ অনুশীলনের মধ্যে জনমানসের জীবনধারার প্রকৃতরূপ প্রকট হয়ে উঠে। অনুসন্ধানীর অকৃত্রিম নিষ্ঠা আর মননশীলতায় এবং প্রকাশভঙ্গীর বিচিত্রতায় সুদূর অতীতের স্তব্ধিত সমাজের প্রতিচ্ছবি গতিশীলতায় মুখর হয়ে উঠে চোখের সুমুখে ভেসে উঠে—এ যেন পাষানপুরীতে ঘুমন্ত রাজকন্যা সোণার কাঠির পরশে উঠে জেগে।

'গাথা গীতিকায় চিরন্তনী বাঙলায়' লেখক আপন পরিশ্রমে সংগৃহীত বিভিন্ন তথ্যাবলী যেমন গ্রামীন ছড়া, প্রবচন, লোকসংগীত, লৌকিক দেবদেবী প্রভৃতির মাধ্যমে গ্রামবাংলার একটা চিরন্তন রূপ ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। আজ থেকে কুড়ি বাইশ বছর আগে যখন লোকসংস্কৃতি ও লোক সাহিত্যের আলোচনা, গবেষণা, চিন্তন মনন অধিকাংশ তথাকথিত উচ্চ পর্য্যায়ের সাহিত্যিক-গবেষকদের দৃষ্টি সীমার বাইরে ছিল শ্রীঅজিতকুমার মিত্র তখন অকল্পনীয় উদ্যম, কঠোর শ্রম ও বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতের মাধ্যমে অনুসন্ধানীর দৃষ্টি আর মনোবল সম্বল করে গ্রামের পর গ্রাম পরিক্রমা করেছেন আর অসীম আগ্রহে সংগ্রহ করেছেন লোক সাহিত্য-সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান। সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রতিটি লৌকিক ভাবধারার রূপায়ণের গতিবিধি শ্রীমিত্রের লেখনীকে প্রভাবিত করেছে যার ফলে মানুষ আর তার সমাজের বিভিন্ন উপকরণই

তাঁর আলোচনার প্রধান উপজীব্য বিষয় হয়ে উঠেছে। তাই মানুষকে ছাড়িয়ে দেবতার প্রকৃতি বর্ণন বড় হয়ে উঠে নি। গ্রামীন দেবদেবী এবং তাদের পূজাপদ্ধতির উৎসমূলক বিস্তারিত আলোচনার একঘেঁয়েমিতে, যা তদানীন্তন অনুসন্ধানীদের প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল, লেখক মাথা ঘামাননি। মানুষের প্রয়োজনেই দেবতা এসেছেন তার সমাজে ; তাই যুগে যুগে দেখি মানুষ দেবতাকে আপন সমাজেরই একজন হিসেবে গ্রহণ করেছে। সুখে দুঃখে এগিয়ে গেছে তাঁর কাছে—কোন দ্বিধা মেই, কোন সঙ্কোচ বা ভীতি নেই। এই এগিয়ে যাওয়াকে কেন্দ্র করেই রূপ নিয়েছে কত সব গ্রামীন গাথা আর গীতিকা—যার মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে গনমানসের গতিশীল জীবনপথের বিচিত্রতা। গ্রামীন ধর্মজগৎ ও সামাজিক রীতিনীতি লোকাচার বিষয়ক প্রতিটি আলোচনার মাধ্যমেই লেখক জনজীবনের প্রকৃতরূপ উদ্ঘাটনে সচেষ্ট হয়েছেন।

রাঢ়ের এই ভূখণ্ডের সভ্যতা ও সমাজ-সংস্কৃতির ইতিহাস সংঘর্ষ আর সমন্বয়ের প্রকৃতিতে প্রভাবিত। জাতি-উপজাতি, দল-উপদল আর নানান ধর্মবিশ্বাস ও ভাবধারার মধ্যে হয়েছে দ্বন্দ্ব, হয়েছে সংঘাত—সেই দ্বন্দ্ব-সংঘাতের পরিসমাপ্তি ঘটেছে কখনও সমন্বয়ের পথে, আবার কখনও বা ভয়াবহরূপ নিয়ে গ্রাস করেছে মানুষের জীবন ; স্তব্ধ করেছে কর্ম চঞ্চল সমাজ জীবনের এগিয়ে চলার ছন্দ। গ্রামীন ছড়া প্রবচন আর লোকশ্রুতির মাধ্যমে তার রেশ আজিও প্রতিধ্বনিত হয় ; পথে-প্রান্তরে, মন্দিরে-মসজিদে, বনানীর শ্যামল প্রান্তচ্ছায়ায়, নদনদীর কূলে-উপকূলে, আর প্রতিটি মানুষের গৃহাঙ্গনে সেদিনের স্মৃতি-বিজড়িত ঘটনারাজির প্রতিফলন আজিও দেদীপ্যমান। আলোচ্য গ্রন্থে লেখক বিভিন্ন ধর্মী প্রবন্ধের মাধ্যমে সমাজ ও সম্প্রদায়ের নানান সংঘাত-সমন্বয়ের যে চিত্র সাহিত্যিক ও সমাজবিজ্ঞানীর দৃষ্টিভঙ্গীতে তুলে ধরেছেন তা সাধারণ পাঠক আর অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিদের চিন্তাধারার যথেষ্ট খোরাক জোগাবে বলে বিশ্বাস করি।

রেবতী মোহন সরকার

নিবেদন

এই পুস্তক প্রকাশিত হওয়ার সামান্য একটু ইতিহাস আছে। সবিনয়ে সেই ইতিহাস বিবৃত করবার সুযোগ পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করছি।

সন ১৩৫৩ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা সংহতি মাসিক পত্রিকায় ভগবতী মংগল গান নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ার পর লোক সাহিত্য সংগ্রহ করবার সুযোগ সৃষ্টি হয়। তার জন্য সংহতি সম্পাদক ও সাধারণ সম্পাদক, বংগ সাহিত্য সম্মেলন, শ্রীসুরেশ নিয়োগীকে অশেষ শ্রদ্ধা জানাই। তখন আমি দশম শ্রেণীর ছাত্র। সেই সময় সাহিত্যের এই বিভাগে নব পর্য্যায়ে ব্যাপক-ভাবে অনুসন্ধান ও গবেষনা আরম্ভ হয় নি। সংগ্রহের একক প্রচেষ্টা নানা প্রতিকূলতায় ব্যাপকতরো রূপ লাভ করেনি। তাই সাধারণতঃ ১৩৫৩ সাল হ'তে ১৩৬১ সালের মধ্যে সংহতি, দেশ, বিদ্যাসাগর কলেজ (শিউরী) পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধাবলী কোন রকম পরিবর্দ্ধন বা পরিবর্জন না করেই অবিকল এই সংকলনে পুর্ণ মুদ্রিত হলো। কয়েকটি হারানো প্রবন্ধ পরিবেশিত না হওয়ায় এই পুস্তকে লোক সাহিত্য সংগ্রহ যথাযথ বিধৃত হলো না। কুড়ি বছর আগে পত্রিকায় প্রকাশিত হারানো প্রবন্ধের নকল পত্রিকা অফিস থেকে সংগ্রহ করা আর মহাসাগরের তলায় প্রবাল সংগ্রহ করা একই ব্যাপার। তফাৎ শুধু প্রবাল সংগ্রহ করা যায় তা'হলেও কিন্তু হারানো প্রবন্ধের নকল পাওয়া মফঃস্বলবাসী লেখকের পক্ষে অসম্ভব হয়ে ওঠে।

এই বিভাগে কাজ করবার যত সাধ ছিলো ততো সাধ্য ছিলো না। তবু শান্তনা শুধু এই যে আজ থেকে কুড়ি বছরের আগে এই বিভাগে কাজ করবার জন্য সুধীজনকে আহ্বান জানানো হয়েছিলো। সে আবেদন একেবারেই ব্যর্থ হয়নি। এই প্রবন্ধাবলী পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়ে তারই সাক্ষী রইলো। ভবিষ্যতের ইতিহাস লেখক এর বিচার করবেন।

সে আমলে গাথা গীতিকা সংগ্রহ করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার ছিলো। এ কথা বলতে গেলে লোক সাহিত্য পরিক্রমা নামে একটা পুস্তক প্রকাশিত করা যায়। ১৩৫৩-৫৪ সালে বংগ ব্যবচ্ছেদের সময় তেমন তেমন পল্লীতে গাথা গীতিকা সংগ্রহ করতে গিয়ে অনেকের অমূলক সন্দেহভাজন হয়ে পড়তে হয়। তপশীল জাতীয়া জনৈকা স্ত্রীলোকের কাছে গান সংগ্রহ করতে গেলে সে তার স্বামী

পরিত্যাক্তা ভরন্ত যৌবনা কন্যার সাথে অবৈধ যোগাযোগের ছল মনে করে আনন্দে আজ কাল করে করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে হায়রাণ করে। গান বলবার সময় হয় না। এদিকে গ্রামের ছোকরারা দল বেঁধে লাঠি নিয়ে মারতে আসে। নদীর ধারে বৈষ্ণবের আখড়ায় গান সংগ্রহ করতে গিয়ে রাত্রি যাপন করার সময় গায়ের জামা পর্য্যন্ত হারাতে হয়। কত দিন অনাহারে যায়। এখনকার দিনে বাঁদর নাচিয়েরা হিন্দি হিট-ফিল্মের গান গেয়ে বাঁদর নাচায়। কিন্তু তখনকার দিনে তাদের গানে গ্রাম্য সাহিত্যের সুরে অদ্ভুত মাদকতা ছিলো। সে গান সংগ্রহ করতে গিয়ে অনেকের ঠাট্টা উপহাস সহ্য করতে হয়। অতীত গ্লানি আজ ধুয়ে মুছে একাকার হয়ে গেছে। এই লোকসাহিত্য সংগ্রহের পরিধি ছিলো বীরভূম জেলার যত্রতত্র আর সাঁওতাল পরগনার বাংলা ভাষাভাষি গ্রাম। বাঁকুড়ার দামোদর নদের দুই তীর ধরে কোথাও কোথাও আর বর্দ্ধমানের অজয় নদের ধারে ধারে বীরভূম ঘেঁষা অঞ্চলে এবং মুর্শিদাবাদের কোন কোন স্থানে।

প্রকাশিত প্রবন্ধের সংখ্যাগুলো অযত্ন-সঞ্চিত হয়ে পড়ে ছিলো। আমার অনুজ-কল্প অধ্যাপক, বীরভূম কাহিনী ও Fundamentals of Physical Anthro-Polcgyর লেখক শ্রীরেবতী মোহন সরকারের সাহায্য না পেলে এ পুস্তক প্রকাশিত হতো না। তাঁর কাছে ঋণ স্বীকার করে তাঁকে ছোট করতে চাই না। পরিশেষে প্রকাশক শ্রদ্ধেয় শ্রীবিমলেন্দু ভূষণ দুই মহাশয়ের মিষ্টি সুন্দর ব্যবহার ও এই পুস্তক প্রকাশে তিনি যে পরিশ্রম করেছেন তা সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করছি।

অজিতকুমার মিত্র

বিষয়-সূচী

প্রাক্ কথন

নদী বিহ্বল বাঙলায় অশ্রান্ত জলধারার এক সুর আছে। ঐ সুর দেশের জীবনধারায় সংক্রমিত হয়ে গাথা গীতিকা গান আর উপাখ্যান উপকথার এমন একটা জগৎ সৃষ্টি করেছে যেখানে ইতিহাসের ঝড়ঝাপ্টা এসে উল্টোপাল্টা করলেও ছন্দ পতন ঘটাতে পারেনি।

তুর্কীদের তরবারির আঘাতে যুগান্তর হয়ে গেছে কিন্তু ঢাল-তরোয়ালের ঝনঝনানি দেশের মনোজগতে প্রবেশ করতে পারেনি। তা'হলে অত হৈহুল্লোড়ে চর্য্যাপদের মত দর্শন লিখিত ও লালিত হতে পারতো না। তারপর বারে বারে যুদ্ধ এসেছে। এসেছে দুর্ভিক্ষ। কাতারে কাতারে মানুষ মরেছে। পর পদানত হয়েছে এ দেশ। মোগলের ডাণ্ডা বাঙলাদেশকে ঠাণ্ডা করে দিয়েছে। বর্গীর হাজার ঘোড়ার খুরের ধুলোয় আকীর্ণ হয়ে গেছে চারিদিক। হাড় পাঁজরা গুঁড়ো করে দিয়েছে। তবু সুর লহরীর ধারা গানে ভরা দেশে অন্তঃশীলা বইছে। তন্ময় মানসলোকে ভাবকল্পনা অনুদ্বেল রয়ে গেছে। আজও ধারা হারা হয়নি।

বাঙলার দর্শন

ভবনহী গহন গম্ভীর বেগে বাহি।

দু'আন্তে চিখিল মাঝে ন যাহি ॥

এই কথাবস্তুই বাঙলার লোকদর্শন। ভবনদীই অথৈ জীবন নদী। থৈ পাওয়ার আকুলি ব্যাকুলিতেই বিশাল সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব করেছে। নিজস্ব দর্শনের পত্তন হয়েছে—যা বাঙালীর জাতীয় চিন্তা ভাবনা দিয়ে তৈরী। ভালোভাবে মৃত্যু এবং মৃত্যুর পর ভালো থাকার দুর্ভাবনাতে বাঙলার দর্শন তৈরী হয়নি। ভালো করে বাঁচার জন্য সাধনাই বাঙলার প্রকৃত জীবন দর্শন। ক্ষমা, দয়া, মমতায় ঘেরা গার্হস্থ্য ধর্মই এই জীবনের ভিত্তিভূমি।

বাঙালীর দর্শনের সবিশেষ বৈচিত্র্য লক্ষ্য করলে দেখা যায়, নিজস্ব ভাবধারা থাকা সত্ত্বেও ভারতীয় মূলধারায় এই লোকদর্শন সাযুজ্য লাভ করেছে। ব্যাপকতর ভারতীয় চিন্তায় কোন স্মরণাতীত কালে নিজেকে হারিয়ে দিতে সক্ষম হওয়ায় সারবত্তাই প্রমাণিত করেছে। চর্য্যার কবিদের ভারতীয় দর্শনের ধ্যান-ধারণার সাথে বাঙালীর চিরকালাগত চিন্তা আপন ঠাঁই করে নিয়েছে অবলীলাক্রমেই।

বাঙালীর দর্শনের আরও একটি ধারা লোকরচনায় লক্ষ্য করা যায় যে অতি রোমাণ্টিকতার সুগভীরে পরম প্রেয়কে পাওয়ার আর্তি—যা' শ্রীগৌরাংগে—চরম পূর্ণতা লাভ করে—ভাববিহ্বলতার দুর্বার আকর্ষণে নিজস্ব বিশ্বাসকে কার্যকারণ সূত্রে যুক্ত করে সামগ্রিক ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছে।

অচিনপুরের মনের মানুষ কোন বা স্থানে যাও।
শীতলপাটী পেরে দেব বাটার পান খাও॥

অচিনপুরের মনের মানুষই বাঙালী জীবনের মুক্তির আস্বাদ পাওয়ার একান্ত অবলম্বন। এত মিষ্টি নাম তন্নতন্ন করে গোটা পৃথিবী খুঁজলেও কোথাও পাওয়া যাবে না। এই মনের মানুষকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় বাঙালীর নূতন দর্শন তৈরী হয়েছে। তাইত নাথধর্ম, বৌদ্ধ, মুসলমান, শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব প্রভৃতি দর্শনের ধ্যান-ধারণার সাথে বাঙলার চিরকালাগত ভাবধারা মিশিয়ে যে লোকদর্শন তৈরী হয়েছে তা'আবার ভারতীয় দর্শনের মূলধারাকে প্রভাবিত করে নিজস্ব উদারতায় ব্যাপ্তির পরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছে। বাঙালী মানসের সাথে ভারতীয় জীবনের অহরহ আত্মীয়তা সঞ্চারে যুগ ও জীবনের ক্লৈবতা এতটুকু গতি-হারা করতে পারেনি। কোন স্মরণাতীত অতীত হতে এই ধারা অশ্রান্ত জলধারার মত কখনও কখনও অন্তঃশীলা আবার কখনও উজান ধারায় বয়ে চলেছে। বিরাম নেই। বিশ্রাম নেই।

এই দর্শন কোন নির্দিষ্ট প্রচারকের দ্বারা প্রচারিত সুনির্দিষ্ট গণ্ডীতে নিরূপিত করা যায় না। বাঙালীর নিজস্ব ধারা এই দর্শনে। জীব ও জীবন সম্পর্কে তাই তো অপূর্ব ধারণা জন্মে। বাঙলা দেশকে মানুষের স্বর্গ করে গড়ে তোলার সাধনাই এই দর্শনের মূল কথা। যোগী সন্ন্যাসীরাও গ্রাম বাঙলার সাথে যোগাযোগ নিবিড়তর করে গার্হস্থ্য জীবনকে সোনা মাখা করে গড়ে তুলবার উপদেশই দিয়েছেন।

বাঙালীর ধর্মজগৎ

এই সব গাথাগীতিকা গানের প্রভাবে বিচিত্র ধর্মের ধারা প্রবাহিত হয়। বিশাল সংস্কৃত সাহিত্যের কোন প্রভাব নেই। রাধাকৃষ্ণ, হরগৌরী, এবং রামসীতার সংস্কৃত সাহিত্যানুসারী চরিত্র অংকন করা হয়নি। নায়ক-নায়িকার প্রেমের কথায়, চাওয়ার জনকে না পাওয়ার আকুলতায়, রূপের আকর্ষণে অপরূপের প্রতি অপরূপার উন্মাদনায় বাঙালী জীবনের বিশিষ্টতর প্রেমিক মন ভাব-বিহ্বল। পুরুষের প্রতি নারীর টান রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলার উজান বইয়ে নিজস্ব ধর্মজগতের সৃষ্টি করেছে। হরগৌরীর কথাতেও বাঙালীর গার্হস্থ্য জীবনের ছবিই সুপরিস্ফুট হয়ে উঠে। হর আর গৌরী বাঙালী স্বামী-স্ত্রী। অভাব আছে সংসারে কিন্তু অদ্ভুত মানসিক সম্পদও আছে। মহাদেব তাই জটাজুটধারী হিমালয়ের নৈষ্টিক সন্ন্যাসী নয়। গৌরীর সংগে দিনরাত কোন্দল করে; কুচুনিপাড়ায় যায়। গৌরী রাজার মেয়ে হয়েও বাঙালী কন্যার মত গরুর জাবনা দেয়, মেছুনীদের মত জাল নিয়ে মাছ ধরতে যায়; এ সাহিত্যে তার নজীর আছে। রাম-সীতাও বাঙলার নিজস্ব ভাবধারায় রূপলাভ করেছে। রামচরিত্র বাঙালীর অদৃষ্ট বিশ্বাসের ক্রীড়নক। নিয়তির লীলা বহু সম্ভব অসম্ভব উপকথা-আখ্যানে আর গাথাগানে নবরামায়ণের সৃষ্টি করেছে।

অপৌরাণিক লোকধর্ম

বাঙলার একটা নিজস্ব ধর্মজগৎ রয়েছে, যা' বাঙালী চরিত্রের জাতীয় বিশ্বাস, চিন্তাধারা, মানসিক উদ্বেগ, জীবন এবং জগতকে নিবিড় ভালবাসার আকুতিতে লালিত হয়ে এসেছে। ইছাই ঘোষ, লাউসেন, কালকেতু, শ্রীমন্ত, চাঁদসদাগর অপরদিকে রজ্ঞাবতী, ফুল্লরা, লহনা, খুল্লকা, বেহুলা প্রভৃতি চরিত্রগুলি কোন ধর্মলীলার দেব বা অসুরের পুণ্য আর পাপের প্রতীকধর্মী মৃত্যু হীনতা আর মৃত্যু পীড়িত চরিত্র নয়। এরা বাঙলার চিরকালের নরনারী। রোগ, শোক, মৃত্যু, প্রেম, ভালবাসা সবই আছে এদের। বিপদে ঈশ্বরকে ডাকে। ধর্মবিশ্বাস আছে। ধর্মের প্রতি অনুসন্ধিৎসা এবং স্বধর্মের প্রতি প্রগাঢ় আনুরক্তি মহৎ করে তুলেছে প্রত্যেকটি চরিত্রকে। ব্যক্তিত্ব আছে এদের। সর্বোপরি আছে অকুণ্ঠ বাঙালীত্ব।

এই ধারা ধরে লোকদেবতার জগৎ বিভিন্ন স্থানে স্থান, কাল, পাত্র ভেদে সম্প্রসারিত হয়েছে। এসেছে সত্যপীর, মাণিকপীর, দক্ষিরায়, ঘেঁটু, মাকাল,

মাষষ্ঠী, ভাদু, ভাঁজো প্রভৃতি দেবদেবী। এদেরও লীলার কথা আছে। প্রচার উদ্দেশ্যে গাথা, গীতিকা, গানের এবং আখ্যান উপখ্যানের মাহাত্ম্য ও ছন্দ বন্ধো কারো কারো। এই লোক ধর্ম জাতীয় জীবনের আরও গভীরে প্রবেশ করেছে।

প্রায় প্রতিটি গ্রামেই আরও লোক দেবতার অস্তিত্ব রয়েছে। এদের স্বরূপ উপরোক্ত লোক দেবতার মত একেবারেই প্রতীক কল্পনা স্তর পর্যন্ত পৌছেনি বা স্থানীয়ভাব কল্পনা ছাড়া বাঙলায় ব্যাপক রূপলাভ করেনি। তাতে কোন অসুবিধা নেই। গীতার কৃষ্ণ আর রামায়ণের রাম বাঙালীর কাছে পরদেশী। সম্মান পায়। কিন্তু পাথরচণ্ডী, সোনাইচণ্ডী, তুলোরাম, চাঁদরায়, দন্তেশ্বরী প্রভৃতির জন্য ভক্তি ভালোবাসা উপছে পড়ে। অনেক দেব-দেবীর পূজা অনুষ্ঠানে মেলা হয়। মাহাত্ম্য গান গীত হয় কোন কোন দেবদেবীর আসরে। গ্রামের পাশে নদীর ধারে গাছে ভরা ভুতুড়ে ঝোপে ব্রহ্মদৈত্য থাকে। কোথাও বা মাঠের মাঝে শাল তমালের বেড়ায় ঘেরা দেবস্থানে তালগাছে জড়ানো অশত্থতলায় সিন্দুর লিপ্ত জড়ো করা পাথরের স্তুপে নাকি তুলোরাম ঠাকুরের আস্তানা।

এই সব দেবতার কাছে মানুষ আশী লক্ষ যোনী ভ্রমণের কলান্তিতে জীবন-মৃত্যুর হাত থেকে মুক্তি চায় না। জীবনকে ভালবাসে বলেই অতবড় কামনা করে না বাঙালী। অতি সামান্য চাওয়া তাই পাওয়াও যায় অনবরত। তাই দেবশক্তির অনুভূতি সঞ্চারিত হয় বাঙালী হৃদয়ে। বর্ষাকালে ঠিক সময়ে বর্ষণ না নামলে পাথর চণ্ডীর মাথায় দুধ ঢালে এরা। সুচারু চাষ করবার জন্যে সুবৃষ্টির প্রার্থনা। বর্ষার শেষে শাওনডালি পূজার দিন নির্বিবাদে চাষ হওয়ার জন্য গ্রামদেবতার স্থানে কালো পাঁঠা বলি দিয়ে পূজা দেয়। অন্তর পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। আবার সোনার ফসল ঘর ঢুকিয়েও অনেক অঞ্চলে এই সব দেবতাদের পূজা দিয়ে কৃতজ্ঞতা জানায় বাঙলার মানুষ। কোন কাল হতে জড়ো করা অদ্ভুত পাথরকে কেন্দ্র করে কত কথা গাথা গান রচিত হয় এ দেশে। এই সব অপৌরাণিক দেবতার প্রতি বাঙালীর আসক্তি বেশী। তার মূলেও কত কথা, গাথা, গান উপাখ্যান। এই সাহিত্য কোথাও বা সুসম্বদ্ধরূপ পায়, কোথাও তা অলৌকিক কথা কাহিনীর স্তর উত্তীর্ণ হয়নি।

কিন্তু তাই বলে এই সব দেবতার দরবারে সমষ্টি বা ব্যষ্টির ভীড়ে ব্যক্তি হারিয়ে যায় নি। সন্তানহীনার সন্তানকামনা, স্বামীর রোগমুক্তি, পুত্রের

আরোগ্য লাভ, শত্রুর শক্তি ক্ষয় করার জন্য বহু শনি মঙ্গলবারে দেবদেবীর পূজা পাঁঠা লাভ হয় অহরহই।

তীর্থ বৈচিত্র্য

বিচিত্র প্রকৃতি পরিবেশে কোথাও গুপ্তকাশী বা গুপ্ত বৃন্দাবন বা আরও অন্য তীর্থ আছে। বাঙলার বাইরে মানুষ কোনদিন বৃন্দাবন বা কাশী বা অন্য তীর্থস্থানের কথা ভাবতে চায়নি। বাঙলার কত শত গ্রামে কাশী বা বৃন্দাবনের পত্তন হ'তে হ'তে হয়নি। সে সব স্থান গুপ্ত বলেই আখ্যাত। কোথাও বা বিশ্বকর্মার নির্মাণ সময়েই কেউ অকর্তব্য করে শুচিতা নষ্ট করে দেয়। কোন তীর্থস্থান রাত্রের মধ্যেই নির্মাণ করার কথা কিন্তু ভোর হয়ে যাওয়ায় অসমাপ্ত রেখে বিশ্বকর্মা চলে যেতে বাধ্য হন। তাই নাকি বাঙলার বাইরে ঐ সব তীর্থ স্থাপন হয়েছে। এ সম্পর্কে নানা প্রবাদ, প্রবচন, কথা, গাথা, উপাখ্যান আছে।

উপদেশ আর বিধিনিষেধ

বাঙলার নিজস্ব বহু উপদেশ আর বিধিনিষেধ আছে। কোন শাস্ত্রীয় নজীর ব্যতিরেকেই এই সব গাথা গীতিকা দেশে প্রচলিত হয়েছে। নানা প্রকার বাধানিষেধ ও উপদেশের শাসনে জাতীয় চরিত্র পরিবর্ধিত হয়। বাঙালীকে বাঙালী হয়ে গড়ে উঠবার সুযোগ সৃষ্টি করে। জাতীয় অভিজ্ঞতা, বিভিন্ন প্রকার দায়-দায়িত্ব ও বিপদ-আপদ হতে এই উপদেশগুলির জন্ম।

উদ্দাম যৌবনকে সংযত করবার জন্য বহু উপদেশমূলক গাথা-গীতিকার সৃষ্টি হয়েছে এই সাহিত্যে। কোন শাস্ত্রীয় নজীর তুলে উপদেশ দেবার চেষ্টা করা হয়নি। চাক্ষুষ বিষয়বস্তু নিয়েই এগুলি রচিত। সেইজন্য উপদেশগুলির কার্যকরীক্ষমতা খুব বেশী। তাই লোক মুখে বেঁচে আছে আজও। এত প্রতিকূল অবস্থাতেও তা' ধ্বংস হয়ে যায় নি।

অবোধ নারী করে সব যৌবনের গৌরব
বুঝিতে নারি কিসের কারণে।
চিরকালের বস্তু নয়, থাকে বছর আট নয়
একবার ভেবে দেখ মনে॥
বোষ্টম যায় গৃহস্থ ঘরে, বুকের যৌবন থাকলে পরে
আকড়া চাল দিলে ভিক্ষা লয় না।

যদি ঘোষের নারী যৌবন থাকে, ঘোর ঘোর বলিয়া ডাকে
থইল কিনলে আক্রা বইত দেয় না॥
যৌবন গরব মিছে ধন, বাজকরের বাজী যেমন
কিছুদিন সিসে দেখায় সোনা।
যৌবন যাওয়া মাত্র কিসে বা জুড়াবে গাত্র
তালপত্র ছায়ার তুলনা॥

মিথ্যা দর্পের প্রতি এই সব গাথা-গীতিকা গানের ধিক্কার তীক্ষ্ণ কটাক্ষে জাতীয় চরিত্র সুসংযত করতে সাহায্য করে। মিথ্যা দর্পকারী মানুষ যদি সমাজে খ্যাতি পায় তাহলে সত্যিকারের চরিত্র সংগঠনের দৃঢ়তা মানুষ হারিয়ে ফেলবে। গুণীলোক গুণের আদর না পেলে মানুষের বিদ্যা অধ্যয়নের মনোবল অটুট থাকবে না।

দর্প করে বলছে ব্যাঙ
আমার হাতির মত চারটে ঠ্যাং
আমি ভাই সত্য কথাই কৈ।
সর্পের ছানা দেখলে পরে
শশব্যস্তে যায় যে সরে
আমি বাপের ব্যাটা পুরুষ মন্দ নই॥

দর্প করে বলছে ফেঁউ
আমার মত নাইকো কেউ
আমি ভাই বাঘের পিছনে লাগি।
কেলে কুকুর দেখলে পরে
লেজকে গুটাই পিছনে ভরে
নদীর ঝোঁপে পরপরিয়ে কাঁপি॥

দর্প করে বলছে ছার
আমার সব জায়গায় অধিকার
বাগে বুগে পাই যদি লেপ কাঁথার ফাঁকটি।
মরা মানুষের রক্ত খাই

আপন পেটটি ভরে ভাই
জ্যান্তর হাতে পড়লে পরে পটাং করে ফুটিয়ে দেয় পেটটি ॥

দর্প করে বলছে মশা
আমার ভাই বড় গোসা
মশারি খাটালে আমি জব্দ।
ফাঁকা জায়গায় পেলে পরে
রক্ত খাই পেটটি ভরে
সুরাসুর কম্পবান শুনলে আমার শব্দ ॥

দর্প করে বলছে পাঁঠা
আমার বড় বুদ্ধি আঁটা
তাইত আমার মাথা মোটা ছিল।
যদি গাত্রের গন্ধ ঘুচে যেত
শুধু মুখে দাড়ি হত
লোকে বলত শালগ্রাম শিলা ॥

দর্প করে বলছে ষাড়
আমার সব জায়গায় অধিকার
আমি কিষ্টের মত গোষ্ঠ যাত্রা করি।
কিষ্ট যেমন ব্রজাংগনার সনে
ফিরতেন সদাই বনে বনে
তেমনি আমি গাভীগণের পিছনেতে ফিরি ॥

গাথা-গীতিকা গানের নায়ক-নায়িকা

এই সাহিত্যের নায়ক-নায়িকা বাঙালী পুরুষ আর নারী। মানুষের প্রেমকথাই সুললিত ছন্দে অনুরণন জাগায়। এই নায়ক-নায়িকারা বাঙালী। বাঙলা দেশের সত্যিকারের মানুষ। কোন অতীতে জনৈক গোপবালা মহিষাল বন্ধুর প্রেমের তুফানে ডুবে গিয়েছিল আজও তার রেশ গানে গাথায় ভরপুর। তার আকুল সংগীতে বহু গোপ-গোয়ালিনী নিজেদের খুঁজে পায়।

ও মহিষাল বন্ধুরে কোথা যাওরে গুনী।
যেইখানেতে বাজাও বাঁশি আমি যেন শুনি॥
ও বন্ধুরে—

এমনি মাহুত বন্ধুকে উদ্দেশ করেও অনেক গান আছে। বিদেশী নাইয়া ত বাঙালী নায়িকার চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছে। প্রেমাস্পদ যদি বিদেশী হয় তো সংগীত আরও মুখর। পরদেশী, বিদেশী বন্ধু, ও কোন গাঁয়ের নাগরকে পেলে ত নায়িকার প্রেমের নদীতে দু'কানা বান ডাকে। কোন বাধা মানে না। অজানাকে জানার ব্যাকুলতাই এই সব গানে দশদিক মুখর করে তোলে।

সরু ধানের চিড়া দিমু পেট ভরে খেয়ো।
যাবার বেলা পিছন ফিরে একটু চেয়ে যেয়ো॥

পিছন ফিরে চেয়ে যাওয়ার মিনতিতে বাঙালী নায়িকার আর্জি গাথা গীতিকায় অপরূপ হয়ে ওঠে। বহু গানে নাগর-নাগরীর টুকরো ছবি অপূর্ব।

নাগর ছেড়ে দে কলসীর কানা যায় বেলা।
সাবাস আমার মা বাপ সাবাস আমার হিয়া।
অবেলাতে জলকে পাঠায় হাতে কলসী দিয়া॥

বিরহ-জর্জর নায়িকা আবার বলে ওঠে:

হাড়ে হাড়ে জ্বলিয়া মৈলাম অন্তর হইল পোড়া।
পিরীতি ভাংগিলে বন্ধু নাহি লয় জোড়া॥

নায়ক-নায়িকার এই প্রেমকথায় কোন বৈদেশিক প্রভাব পড়েনি। একান্ত বাঙালী নায়ক-নায়িকা। বাঙলার হাটে, মাঠে, বাটে, বনে, প্রান্তরে প্রেম ছড়ানো রয়েছে—যে প্রেম মানুষকে মহত্তর প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হতে সহায়তা করে।

গাথা-গীতিকার প্রচার পদ্ধতি

এই সব গাথা-গীতিকার মধ্যে প্রাণের টান আছে বলে এই সাহিত্য বাঁচিয়ে রাখার জন্য কোন সমস্যার উদ্ভব হয়নি। আপন প্রয়োজনেই মানুষ নিবিড় মমতায় গাথা, গীতিকা, গান আজও বাঁচিয়ে রেখেছে।

অনেক সময় দেশের বহু ঘটনা নিয়েও সাহিত্য রচিত হয়েছে। বর্গীর লুটতরাজ ত' ছেলে-ঘুমপাড়ানো ছড়ায় অক্ষয় হয়ে আছে। 'একবার বিদায় দাও মা' গানের মধ্যে ক্ষুদিরামের আত্মদান স্মরণীয় হয়ে আছে। প্রকৃত বাঙলার ইতিহাস জানতে এই গানগুলি সাহায্য করে। এমনি করে অনেক সাহিত্য

বেঁচে থাকে। চিরকালের বাঙলা আদিতে, মধ্যে ও ভবিষ্যতের দিকে এই সব গানের টানে একইভাবে চলেছে।

তা' ছাড়া নিমাই সন্ন্যাসের গান গাইতে গাইতে পালাবন্দী গানে নিমাইয়ের সন্ন্যাস গ্রহণের পর—'ভিক্ষা দাও মা নগরবাসী' বলে সন্ন্যাসীর ঝুলি হাতে সাজানো নিমাই আসরের লোকের নিকট ভিক্ষা গ্রহণের জন্য ঘুরে আসে। নিমাইকে ভিক্ষা দেবার জন্যে মানুষের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। কৃষ্ণলীলায় বাল গোপালকে ননী খাওয়াবার জন্য সাজানো যশোদাকে কোন্ মা না ননী খাওয়াবার কড়ি না দেবে? মনসামংগলে মাথায় মূল গায়েনের চামর ঠেকিয়ে নেবার জন্য পয়সা দিয়ে নিজের নাম বলে মায়ের কাছে বর চায়। মূল গায়েন বলে :—

অমুককে পেয়ে মাগো তুমি দিও বর।
কল্যাণ কুশলে রেখো যুগ-যুগান্তর॥

রামায়ণ গানে লক্ষ্মণ ভোজনের জন্য গ্রামবাসীকে আজও চালডাল প্রভৃতি দান করতে দেখা যায়।

গায়কদের সংগতির প্রতি লক্ষ্য রেখে প্রত্যেক গানেই আর্থিক লাভের জন্য গানের সংগে সামঞ্জস্য রেখে বিশেষ প্রথার প্রবর্তন হয়েছে। এইভাবে বাঙলা দেশ আজও গানে গানে মুখর আছে। গানের ভিতরেই বাঙলা দেশকে দেখা যায় যে—বাঙলা ছিল, আছে আবার ভবিষ্যতেও থাকবে। বাইরের চাপে এই বাংলাদেশের মধ্যে রূপান্তরের চেষ্টা চলেছে কিন্তু বিশেষভাবে লক্ষ্য করলে সবকিছুই অল্পবিস্তর বজায় আছে দেখা যায়।

এইসব গাথা গান গীত হয় ডুবকি, ডুগডুগি, বিষমঢাকি, গাবগুবি, নূপুর, দোতারা, মন্দিরা, করতাল, একতারা, মৃদংগ, খোল, বিশেষ ভংগিমায় কাঠির তালে তালে, এমনকি মুখের বিচিত্র আওয়াজে ও গায়কের নিজ শরীরে কখনও বা হাতের চাপড়ে তাল তুলে।

ভগবতী মংগল গান

সে কোন অতীতে গো-জাতি প্রথম পূজা পেয়েছিল হিন্দুর কাছে। সেদিন থেকে তারা ভগবতী আখ্যা পেয়ে আজও ঘরে ঘরে পূজা পেয়ে আসছে। আমাদের কাছে গোজাতি দেবতার মাঝে আপন আসন পায়। মায়ের বক্ষ পীযূষের সংগে গোদুগ্ধের তুলনা করে মা বলে ডাকতে আমরা আত্মহারা হয়ে পড়ি।

মানুষ দেবতার নামে সাহিত্য সৃষ্টি করে এসেছে। এ সাহিত্য আর কিছু নয়—পূজা। তাই আমরা দেখি, জয়দেব চলেছে তার পূজার্ঘ্য নিয়ে নীলাদ্রির পথে—এক একটি বারে অনুপম শব্দচয়ন করে মনের সাধে গাঁথামালা—জগন্নাথদেবের চরণে দিতে। বহু সাধক বাংলা সাহিত্যের সাহায্য নিয়ে তাদের অভীপ্সা পূরণ করেছে অভীপ্সিতের পূজা করে। ভগবতী মংগল কাব্যও গোজাতির প্রতি ভক্তির নিদর্শন।

এই সাধনা সাহিত্যের মধ্যে মংগল কাব্যের অভ্যুত্থান অপ্রত্যাশিত নয়। বংগভাষার ইতিহাসে যুগান্তরকাল (Transitional Period) ১২০০ খ্রীষ্টাব্দ হ'তে ১৩০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। এই দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বাঙলা দেশে তুর্কীদের প্রকোপ হয়। সেই রাষ্ট্র সংকটের দিনে বাংলা সাহিত্য প্রসার লাভ করেনি কিন্তু তুর্কীদের অত্যাচারে গোজাতির প্রতি সাধারণের স্নেহ মমতা অত্যধিক বেড়ে যায়। এই প্রথম মানুষের গোজাতির প্রতি ভক্তিতে চাক্ষুষ আঘাত লাগে। দেশের ঘোরতর দুর্দিনে, অরাজকতা, গোলযোগ ও অশান্তির জন্য সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব হয়নি সত্য কিন্তু এই দারুণ দুর্দিন ভগবতী মংগল কাব্য সৃষ্টির প্রত্যক্ষ সহায় হয়েছিল এবং অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল। সাহিত্যের ঐতিহ্য ধ্বংসকারী কালের কবলে ভগবতী মংগলকাব্যও ধ্বংস হ'তে আরম্ভ হয়। লোক-কথায় ভগবতী মাহাত্ম্য প্রচারমূলক কাহিনী মানুষের মধ্যে প্রসার লাভ করে। যেমন এই সাহিত্য-যুগের আবহাওয়ায় স্তিমিতপ্রায় মংগল কাব্য পরবর্তী শতাব্দীর পর শতাব্দী তৈল সঞ্চয় করে পরে খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে তুর্কী আক্রমণযুগের কাণা হরি দত্ত, ময়ুর ভট্ট, মানিকদত্ত প্রমুখ মংগল কাব্যের অগ্রদূতগণের অক্ষুণ্ন প্রভাবে পূর্ণ আলোক বিকীরণ করতে সমর্থ হয়। বৈষ্ণব কবি জয়া ক্ষ্যাপা ও লোচন

দাসের চৈতন্য মংগল, ধর্মমংগল, চণ্ডীমংগল, মনসামংগলও এই যুগের সৃষ্টি। কিন্তু এর মধ্যে ভগবতী কাব্যের নাম আমরা পাই না কারণ দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে কাহিনীগুলি পরিকল্পিত হয় ও সাহিত্যের প্রতিকূল আবহাওয়ায় ধ্বংস হতে থাকে। বিক্ষিপ্ত কাব্যাংশ আজিও এখানে ওখানে পাওয়া যায়।

এই কাব্যের কোন পুঁথির সন্ধান পাওয়া যায় না। বাঁকুড়া জেলার গোয়ালী নামক জাতির মুখে এই কাব্যের ক্ষুদ্র অংশ শুনতে পাওয়া যায়। শতাব্দীর পর শতাব্দী লোকমুখে নিজেকে বাঁচিয়ে রেখে ভগবতী মংগল কাব্য নানা জনের দ্বারা ছন্দবদ্ধ হতে হতে সংস্কৃত হয়ে উৎপত্তি কালের প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত করেছে। জীবিকার্জনের পথ হওয়ায় ও লোকমুখে থাকায় এতটা সম্ভব হয়েছে এবং নিজ সত্ত্বা বাঁচিয়ে রাখতে অপারগ হয়নি। পালাবন্দী মংগল গান যেমন ভক্তি উদ্রেক করে তেমনি ভগবতী মংগলকাব্য প্রসার লাভ করলে মানুষ গোজাতি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে।

মুখ্যতঃ ভগবতী মাহাত্ম্য প্রচার মূলক একটি উপাখ্যান বীরভূম জেলার পটুয়াদের মুখ থেকে শোনা যায়। এ উপাখ্যানে কোন কবির ভনিতা পাওয়া যায় না। মনে হয় পটে আঁকা ছবির সাথে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য অজ্ঞাতনামা কবির এই কাব্যের সহায়তা নেওয়া হত। আজ পট দেখাবার রেওয়াজ প্রায় ধ্বংস হতে চলেছে, সংগে সংগে এই গানগুলিও লুপ্ত হতে আরম্ভ করেছে। পুঁথির সন্ধান পাওয়া যায় না বলে উদ্ধারের কোন আশা নেই। ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত ভাবে তাদের মুখ থেকে যা' কেবল শুনতে পাওয়া যায়।

প্রসন্নবতী গাভীর সেবাঅপরাধে স্বর্ণকান্তি রাজার কুষ্ঠ ব্যাধি হয়। পুত্রের জীবন মরণ সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। পুত্রবধু পাগলিনীর মত হয়ে যায়। রাণী কুলদেবতা শিবের নিকট ধর্না দেয়। শিব এ বিপদের কারণ বর্ণনা করে প্রসন্নবতী গাভীকে এনে সন্তুষ্ট করতে বলেন। এদিকে রাজলক্ষ্মী রাজ্য হতে কাঁদতে কাঁদতে চলে যান। ধর্ম চলে যান রাজার আশ্রয় ছেড়ে। চারদিকে মড়ক, অনাবৃষ্টি। রাজার পাপে প্রজার কষ্ট। লোকে খেতে পায় না।

রাণী তো প্রসন্নবতী গাভীকে আর মর্ত্যে খুঁজে পায় না। শেষে রাণী শিবের বরে কৈলাসে গিয়ে দেবী ভগবতীকে প্রসন্ন করে। দেবী বলেন,

যদি তুমি নিজের হাতে স্বামীর মস্তক ছেদন করতে পার তবে গাভী আবার মর্ত্যে যাবে। সমস্ত অংগ শিউরে ওঠে রাণীর। তবুও—

জগতের দুগ্ধের বালা রাখিবার তরে।
স্বামীর মস্তক কাটিতে খড়্গ নিব করে॥
স্বামী পুত্র তরে আমি আসি নাই হেথায়।
সৃষ্টির কারণ সব দুঃখ লই মাথায়॥
চলগো মোর ভগবতী চল মর্ত্ত পুরে।
সদাই রাখিব আমি অন্তর ভরিয়ে॥
আমা স্বামী পুত্র যাক নাই কোন দুখ।
জগতের শিশু দেখে হবে আমা সুখ॥
জল আসন পিড়ি দোব ওগো ভগবতী।
স্বামীরে বিদায় দোব হব স্বামী সাতী॥
আমার স্বামীর লাগি পিথিমীর জন।
মা হারা পুত্রের মত না হবে কখন॥
এই মোর কীর্ত্তিযশ ঘুষিবেক জগতে।

তারপর প্রসন্নবতী রাণীর সংগে মর্ত্যে আসেন। তাঁর সামনে রাণী স্বামীকে বলি দেবার জন্য যেমন খড়্গা তোলে অমনি কম্পিত খড়্গা নিজেরই ঘাড়ে বসিয়ে দিয়ে ইহ লীলার অবসান করতে চায় কিন্তু গোরূপিণী ভগবতী ঝটিতি মূর্তি ধারণ করে খড়্গা কেড়ে নেন। আকাশে দুন্দুভি বেজে ওঠে।

সেই রাণীর কথা অশীতিপর বৃদ্ধার মুখে ক্বচিৎ শোনা যায়। কেউ বা তার উদ্দেশ্যে প্রণাম করে হয়তো আজও।

এমনি কত উপাখ্যান অনাদৃত ভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। গ্রামীণ সংস্কৃতির ভাংগন রুখতে, আমাদের সাহিত কে রক্ষা করতে এই সবকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে।

সাহিত্যে নতুন কথা

আমাদের ধর্মসাহিত্য এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। অন্য কোন ধর্মকে কেন্দ্র করে এই ধর্মের সাহিত্যের উদ্ভব হয়নি। যুগে যুগে ধর্মের সাহিত্যের অভ্যুদয়ে নতুন ধারার প্রবর্তনও হয়েছে; কারণ সাহিত্যই মুখ্যত ধর্মপ্রচার করেছে। ইতিহাসে অসিবলের দ্বারা হিন্দু ধর্ম প্রচার কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না। তার কারণ এত প্রচারকের আবির্ভাবও হয়নি অন্য কোনো ধর্মে। প্রচারকের অনুপ্রেরণা দেবার ক্ষমতা ছিল; তাদের মধ্যে ছিল আকর্ষণী শক্তি। আর তখনকার জনগণের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার থাকায় পুস্তক ধর্মের সব কথা সাধারণ্যে প্রচার করতো।

হিন্দু ধর্মের ইতিহাসে জোয়ার এল। সেদিনকার বাঙালী দেখলো নদীয়ার মাটিতে চাঁদের উদয়। ভাববিহ্বল বাঙালী কি ভাবোন্মাদ গোরাচাঁদের আবির্ভাবে বিশাল বৈষ্ণব সাহিত্যের সম্ভাবনা কল্পনা করতে পেরেছিল? কিন্তু পাগল ছেলের পথে পথে গেয়ে যাওয়া গানে বাঙলার আকাশ বাতাস ভরে গেছে। সেদিন শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের আবির্ভাবে যুগপৎ বাঙলা সাহিত্য ও হিন্দুধর্মের উন্নতি হয়েছিল এ কথা অনস্বীকার্য। বৈষ্ণব কবিদের প্রেম, আধ্যাত্ম চিন্তা তাঁদের ভক্তি সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করে তুলট কাগজের পাতায় আবদ্ধ হয়ে রইল। শুধু যে পুঁথির পাতায় কথার শিকলে বাঁধা পড়ে গেল তা নয়; তার ভাব সাধারণ্যে প্রচারের জন্য গায়কেরা উঠে পড়ে লেগে যায়। এই ভাবে কীর্তন গান, কৃষ্ণমংগল গান ও চৈতন্য মংগল গান প্রভৃতি সংগীতধারার সৃষ্টি। এইভাবে রাম, চণ্ডী, মনসা প্রভৃতি দেবদেবীর মাহাত্ম্য প্রচার ও লোকশিক্ষা প্রসারের জন্য যথাক্রমে রামমংগল, চণ্ডীমংগল ও মনসামংগলেরও উৎপত্তি। তাই আমরা দেখি কীর্তনীয়া, কথকঠাকুর, মূল গায়েন প্রভৃতির মধ্যে আমাদের সাহিত্যকে বেঁচে থাকতে তা তারা জাতি বৈষ্ণব, ব্রাহ্মণ বা অন্য যে কোনো বর্ণের হোক না কেন।

কিন্তু একথা আমরা লক্ষ্য করি না যে এক একটা জাতি এক ধারার সাহিত্যকে অবিকৃত অবস্থায় মুখে মুখে বংশের পুরুষ পরম্পরায় বাঁচিয়ে রেখেছে। এ সব গানের কোন পুঁথির সন্ধান পাওয়া যায় না। এবং এই সাহিত্যই এদের

জীবিকা অর্জনের সহায়তা করে চলেছে। আমরা এরকম তিনটি জাতি॰ সন্ধান পাই।

বাঁকুড়া জেলার গোয়ালী

গোয়ালী জাতি আজিকার দিনে কালেভদ্রে গৃহস্থের বাড়ীতে এসে ছোট মন্দিরা বাজাতে বাজাতে ভগবতীমংগল গান করে। এবং সেই সঙ্গে গরুর ব্যাধি চিকিৎসা করেও বেড়ায়। এই এদের জীবিকা। গোয়ালী জাতির ভগবতী মংগল কাব্যের কোনো সন্ধান পাওয়া যায় না। বিক্ষিপ্ত কাব্যাংশ লোক মুখে শুনতে পাওয়া যায়। এ কাব্যে "কবি চন্দ" নামক কবির ভনিতা আছে।

কবি চন্দ বলে মাগো অবনীতে চল।
শিবের দোঁহাই যদি আর কিছু বল॥

এই ভনিতা ছাড়া রচনার সাল তারিখ বা আর কোন জ্ঞাতব্য অনুধাবন করা যায় না। তবে শ্রদ্ধেয় দীনেশ সেন মহাশয়ের "বংগভাষা ও সাহিত্যে" কবি চন্দের কোপিলা মংগল কাব্যের নাম পাওয়া গেছে; কিন্তু কোন পুঁথির সন্ধান মেলে না। গোয়ালীরাও কোনো সন্ধান দিতে পারে না। কবি চন্দ বৈষ্ণব যুগের লোক। মনে হয়, পঞ্চদশ শতাব্দী হতে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যেই তাঁর আবির্ভাবকাল। কবি চন্দের রচিত 'উদ্ধব সংবাদ' নামক একটি পুঁথি পশ্চিমবংগে পাওয়া যায়। রাধাকৃষ্ণের অব্যক্ত প্রেমলীলার স্বরূপে উপলব্ধির প্রয়াস যে সাধক বৈষ্ণব কবির মধ্যে তাঁর দ্বারা কোপিলা মংগল বা ভগবতী মংগল কাব্য রচিত হওয়া দুরূহ না হলেও স্বাভাবিক নয়।

কারণ সে যুগে কোন বৈষ্ণব কবির রামমংগল বা অন্য কোন কাব্য পাওয়া যায় না। বৈষ্ণব ধর্মের রাধাকৃষ্ণ ও চৈতন্য ছিলেন তাদের সাহিত্যের উপজীব্য। অবশ্য চৈতন্যপূর্ব যুগের বিদ্যাপতির কথা বাদ দিলে। তুর্কী আক্রমণ যুগের বৈদেশিকদের অত্যাচারবশত গোজাতির প্রতি সাধারণের স্নেহ-মমতা অত্যধিক বেড়ে যায়। তখন গোজাতির মাহাত্ম্য লোকমুখে প্রচারিত হ'ত। সে প্রায় খ্রীষ্টীয় ১১০০ সাল থেকে ১২০০ সালের কথা। তখন রাষ্ট্র বিপ্লব সাহিত্যে ভাঁটা এনে দেয়। পরে মংগলকাব্যের চরম অভ্যুত্থানের যুগের খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে পূর্ণ বিকাশ। গরুকে হিন্দুরা দেবতার পর্যায়ে নিয়ে এসেছে। সাহিত্যে মানুষ ভগবানের পূজা করে। বৌদ্ধ চর্য্যাপদ থেকে এই বিংশ শতাব্দীর গীতাঞ্জলীর মধ্যেও এ ভাবের ব্যত্যয় দেখি না। ভগবতী মংগল কাব্য বহুদিনের

ভক্তি ও ভালবাসার নিদর্শন। নিশ্চয় পূর্ব প্রচলিত উপদেশ এবং গল্পকে কবি চন্দ কবিতায় রূপান্তরিত ও সংস্কৃত করেন। গোপালন, নীলাবতীর গোপূজা, প্রভৃতিতে কোন ভণিতা নেই; কেবল কোপিলার মর্ত্যে আগমন পর্বেই কবি চন্দের নাম পাওয়া যায়।

গরুর পালন করতে হ'লে কতকগুলি বিধি নিষেধ মেনে চলা অবশ্য কর্তব্য। এ কাব্যে অনেকগুলি বিধি নিষেধ আছে। গরুর তথা গৃহস্থের মংগলের জন্য প্রত্যেক গৃহস্থ এ সব মেনে চলে। অশীতিপর বৃদ্ধারা, এক মুষ্টি ভিক্ষা হাতে বাড়ীর বৌ এবং ছোট বড় মেয়েরা বাড়ীর দরজা ধরে শোনে; উদ্দেশ্যে প্রণাম করে ভগবতীকে।

গরুর পালন

গরুর পালন কর গরু বড় ধন।
যার ঘরে গরু নাই তার বিফল জীবন॥
এস মা বড় বৌ কুলের নন্দন।
তুমা হইতে হবে কিছু গরুর পালন॥
সকাল করে দিবে ছড়া সন্দেকালে বাতি।
তার ঘরে কৃপা করেন লক্ষ্মী ভগবতী॥
অরুদয় কালে যে জন বাসি গোয়াল কাড়ে।
চড়িতে-কোপিলা গাই মা দুঃক্ষ ভাবে মনে॥
শনি মংগলবার দিনে যেজন গোবর বিলায়।
তার বাড়ী ছেড়ে লক্ষ্মী অন্য বাড়ী যায়॥
চালভাজা, কলাই ভাজা গোয়ালে বসে খায়।
তার বাড়ী ছেড়ে লক্ষ্মী অন্য বাড়ী যায়॥
পান খেয়ে পানের চিবা গোয়ালে ফেলায়।
রক্ত বসন্তে তার গরু ধনো যায়॥
রবিবার দিনে যে জন মাছপোড়া খায়।
ধরফরিয়া রোগে তার গরু ধনো যায়॥
বাড়া ভাতের খোড়া লয়ে গোয়ালে যে জন রাখে।
উকুন কেঁউরে তার গরু ধনো ঘুচে॥
ভাদ্র মাসে গোয়ালে যেবা দেয় মাটি।
নব লক্ষ ধেনুর পাল যায় গুটি গুটি॥

ভাদ্র মাসে গোয়ালেতে তাল ভেংগে খায়।
তাল ও বেতাল তালে গরু ধনো যায়॥
সিনান করে এসে গোয়ালে কাপড় শুকায়।
তার বাড়ী ছেড়ে লক্ষ্মী অন্য বাড়ী যায়॥
জুতো পায় দিয়ে যেবা গোয়ালে সিন্ধায়।
চামদল বসন্তে তার গরু ধনো যায়॥
কাঁঠাল খাইয়ে ভোঁতা গোয়ালে ফেলায়।
কাঁঠালে বসন্তে তার গরু ধনো যায়॥
রম্ভা খাইয়ে ভোঁতা গোয়ালে ফেলায়।
ঘুঁটে পিলুয়ে তার গরু ধনো যায়॥
এলোকেশ করে নারী গোয়ালে সিন্ধায়।
তার বাড়ী ছেড়ে লক্ষ্মী অন্য বাড়ি যায়॥

গৃহস্থকে গোজাতি সম্বন্ধে সচেতন করবার জন্য নীলাবতীর 'গোপূজা' নামক উপাখ্যানের পরিকল্পনা। নীলাবতী ছয় বৌ-এর শাশুড়ী। একদিন সমস্ত বৌদের ডেকে গো-সেবার জন্য প্রত্যেকের এক একদিন করে পালি করে দিল। শাশুড়ী বড় বৌকে প্রথম ভার দেয়।

ছয় বৌকে ডাক দিয়ে কয় নীলাবতী॥
কোপিলার সেবা তোমারা কর নিতি নিতি॥
ছয়দিন ছয় বৌয়ের পালি করে দিল।
প্রথম গোয়াল কাড়া বড় বৌয়ের হল॥
হাঁসুলী পাঁজুলী দিল গলাতে মাদুলী।
ছড়া পাঁচ গড়িয়ে দিল সোনার চাঁপকলি॥
রমঝম্ শব্দে বৌ গোয়ালে দিল পা।
গোবর দেখে কাঁদে বৌ কপালে মারে ঘা॥
নিগুরের (?) ঘরে যদি বাপে বিবাহ দিত।
কেন তবে সাধের শয্যায় গোবর লাগিত॥
সোয়ামীর সৌভাগ্য হয়ে বসিতাম খাটে।
এক ধন্দে গোবরে গো মোর প্রাণ ফাটে॥
এই হাতে গো যদি মা আমি গোবর ঠেলিব।
ঘরে গিয়ে অন্ন আমি কেমনে খাইব॥

আর একটী বৌ এলো নামে চন্দকলা।
গোয়াল বাড়িতে যায়গো ঠিক দুপুর বেলা ॥
সেজো বোয়ে মেজো বোয়ে চাল ধুতে যায়।
ইধার উধার চেয়ে বৌরা খাবল পাঁচ ছয় খায় ॥
আর একটি বৌ থাকে উলার ঘরের তুলা।
পাট করিবার সময় হইলে বৌ গায়ে মাখে ধুলা ॥
আর একটি বৌ থাকে চিমরা চামর।
সাত হাঁড়ি পিঠা মুড়ি বৌয়ের একই কামড় ॥
সেজো বোয়ে মেজো বোয়ে শিবপূজা করে।
ফুল তুলতে যেয়ে বৌগো বনবাস করে ॥
ল বৌ থাকে দেখগো ঢিকশালে পড়ে।
গোয়াল কাড়িবার সময় হইলে বৌ যায় কুন্দুলে করে ॥
বড় বৌ বলে গো মা ইত বড় জ্বালা।
আজ বুঝে দেখ গিন্নী ছোট বৌয়ের পালা ॥
ছোট বৌ বলে আমার গায়ে এল জ্বর।
আজ লাড়বো গোয়াল কাড়তে নিকাইব ঘর ॥
আর একটি বৌ এল হরি ঘোষের ঝি।
তাহার গুণের কথা কইব আর কি ॥
ঘুরিয়ে ঝাঁটার মুড়া গরুকে মারিল।
ছয় মাসের গর্ভ গাই খসিয়া পড়িল ॥
অঝোর নয়নে গাই কাঁন্দিতে লাগিল।
দুর দুর করিয়া কোপিলাকে গাল দিল ॥
চড়িবারে গেল পাল ফিরে না আইল।
চালের বাতা ধরে বৌরা নাচিতে লাগিল ॥
ভাল হইল ঘুচে গেল শ্বশুর ঘরের পাল।
সাঝ সলতে গোয়াল কাড়া ঘুচিল জঞ্জাল ॥
দুধ ঘৃত নিয়ে গিন্নী বেচিতে চলিল।
মাঝ পথে ভগবতী দরশন দিল ॥
কোথা যাও মা ভগবতী কোথায় গমন।
কেউ কিছু বলেছে কি ঘরের বৌ'জন ॥

ভগবতী বলে গিন্নীমা কইব আর কি।
তোমার বৌদের জ্বালায় ঘর ছেড়েছি॥
ছয়টি বৌ দেখ তোমার ছয় ঋতু করে।
ঘুরিয়ে ঝাঁটার মুড়া ভেংগেছে পাঁজরে॥
চল মোর ভগবতী চল মোর ঘরে।
সদাই রাখিব আমি হৃদয় মাঝারে॥
এত বিবচন যদি গিন্নী কইলো।
ভক্ত জনার ভগবতী ঘর ফিরে এল॥
ছয় বৌ করেছিল কোপিলার অপমান।
কোপিলার সাক্ষ্যে তাদের কাটিল নাক কান॥
ছয় বৌ-এর আংগুল কেটে বাতি সাজাইল।
হেঁটোর মালুই নয়ে প্রদীপ গড়িল॥
গা কেটে রক্ত নয়ে আলিপনা দিল।
কেশ মুণ্ড কাটিয়ে চামর ঢুলালো॥
ছয় বৌয়ের জিভ কেটে কলা পত্রে দিল।
ময়ুরের পাখাতে মায়ের গোয়াল ছেয়ে দিল॥
গোয়ালী ডাকিয়া মায়ের গোয়াল বান্ধিল॥
ঝাঁটায় করিয়া ঝাঁট দেয় সাত বার।
কোন বার মার্জ্জন করে কেশেতে আপনার॥
ধূপধুনা প্রদীপ জ্বালেন সারি সারি।
একভাবে করেন সেবা চিত্তবতীর নারি॥
কোপিলার মত বল কেবা পূণ্যমান।
গোকুলেতে করেন বাস সিদ্ধ পাদ স্থান॥
অসংখ্য ভগবতী অসংখ্য রাখাল।
বিনোদ রাখাল যত দিব্য পাদা বায়।
বনফুলের চূড়া বান্ধে গিরি মাথে গায়॥
পাঁচুনি ফিরায় সবে করে হৈ হৈ।
সবাই বলে মোররী ঘোষের পাল আসিছে ঐ॥

কোপিলার মর্ত্যে আগমন পর্বে ধরায় জন জীবন রক্ষার্থে ভগবতী দেবীকে

অনুরোধ করা হচ্ছে। পরে তিনি পৃথিবীতে গরুর শত দুঃখের কথা বর্ণনা করছেন।

মন দিয়া শোন সবে কোপিলা-মংগল।
যে জন গাওয়ায় তার সদাই মংগল॥
অবন মণ্ডল যাত্রা কর ঠাকুরাণী।
তোমা বিনে বিফলে বয়ে যায় ধরণী॥
কোপিলা গাই বলে মাগো কি করে যাই ভুবনে।
চার মাসের কাদাজল ছাঁটিব কেমনে॥
বরষায় বিষম দুঃখ পাইব চার মাস।
বাহিরে বাঘের ভয় ঘরে মশা ডাঁস॥
কলিকালের লোক দেখ বড়ই সিয়ান॥
মৃত্তিকার ভাণ্ডে করে দুগ্ধের অনুমান॥
কলুই চক্ষেতে দিবে ঠুলি ঘুরাইবে চক্রে।
কোনরে অপরাধ প্রভু ঠুলি নিব চক্ষে॥
গুরুভার পহার যদি না পারি সহিতে।
গড়িয়া গরু বলিয়া মারিবে চারিভিতে॥
উত্তম ছাগর মোর হইবেক যদি।
নিষ্কামে থুইবে ওগো জনম অবধি॥
অনেক দূরে গেইছে পাল মা আসিবে উছুর।
শক্ত করে খোয়াড়ে মা বান্ধিবে বাছুর॥
অন্য ঘরে বাঁন্ধিবে বাছুর ভিন্ন ঘরে গাই।
সারারাত্রি মায়ে ছায়ে দেখা শুনা নাই॥
অন্যদিন দিতরে গাই এ ভাণ্ড পুরায়ে।
আজ কেন চোরা গাই রেখেছে লুকায়ে॥
চোর গাই বলিয়া মারিবে লাথা মুথা মস্তকেতে কিল।
দারুণ পহারে মারের নাই একতিল॥
পেছুকার পায়েতে মা ছান্দন দড়ি দিবে।
চারিটি বাঁটের দুগ্ধ কাড়িয়া লইবে॥
মা হয়ে পুত্রের কষ্ট দেখিব কেমনে।
একটা বাঁটের দুগ্ধ রাখিব লুকায়ে॥

নিজের নবনী খাইয়ে নিজেই চোর হব।
বাছুরের জন্য আমি কিছু দুগ্ধ থোব ॥

বীরভুম, বর্ধমান প্রভৃতি জিলার নাগা বৈরাগী

এরাও জাত-ভিখারী, তবে গোয়ালীদের থেকে কিছু শিক্ষিত। নিজেরা সত্য-মংগল গান করে বেড়ায়। এই সত্য-মংগল বহুল প্রচারিত সত্যনারায়ণের পাঁচালী থেকে স্বতন্ত্র ধরণের। তবে এতেও নারায়ণের মাহাত্ম্য কীর্তন করা হয়েছে। ঝিঁ ঝিঁ মুখরিত দূর পল্লীর গৃহস্থের দরজায় এক মুষ্টি ভিক্ষার জন্য নাগা বৈরাগী একটানা পয়ার ছন্দে মাহাত্ম্য কীর্তন করে। ভক্তি আনত শিরে শোনে পল্লীবাসী। ধর্মের প্রচার হয়; লোকশিক্ষার প্রসার হয়। এই কাব্যে কোন লেখকের নাম পাওয়া যায় না। বাঙলার পাঁচালী গানের যুগে এই কাব্যের উৎপত্তি; কিন্তু দ্বিজ রামভদ্রের পাঁচলীর মত ইহা জনচিত্ত আকর্ষণ করতে পারেনি। যেমন কৃত্তিবাসী রামায়ণ ছাড়া বাংলা সাহিত্যে আরও অনেক রামায়ণ আছে যদিও, তবুও পূর্বোক্ত গ্রন্থের মত সমাদর লাভ করেনি। নাগা বৈরাগীদের মুখ থেকে শোনা এ গানেরও কোন পুঁথির সন্ধান পাওয়া যায় না।

এক সওদাগরের প্রথমা স্ত্রীর গর্ভের দু'টী সন্তান। একটী ছয় বৎসরের অপরটি বারো বৎসরের। ছেলে দুটি অতি কষ্টে মানুষ হয়। বিমাতা সব সময় তাদের মৃত্যু কামনা করে। পিতা ব্যবসা বাণিজ্য নিয়েই থাকে। ছেলেদের প্রতি তার কোন দৃষ্টি নেই। কিন্তু ছেলে দুটীর সহায় স্বয়ং সত্যনারায়ণ; কারণ এদের মা সত্যনারায়ণের পূজা দিয়ে সুকুমার আর নবকুমারকে লাভ করে।

দিনে দিনে দিন যায়। আরও তিন বৎসর গত হ'ল। সওদাগরের স্ত্রী কংকা কিন্তু সুকুমার ও নবকুমারকে সওদাগরের বিরাগভাজন করবার চেষ্টা করে। খলের ছলের অভাব হয় না। একদিন সে সর্বাংগে ছাই-কাদা মেখে বৈশাখের প্রখর রৌদ্রে আংগিনায় পড়ে আছে। বেশবাস অসংযত। রক্ত-জবার মত চোখ লাল। থর থর ক'রে কাঁপছে সে। সওদাগর বাড়ীতে এসে প্রেয়সীর এই রকম অবস্থাবিপর্যয় দেখে হতবাক। উদ্‌গ্রীব সওদাগর জিজ্ঞেস করলে, "এর কারণ কি? কি হয়েছে প্রিয়তমে?" "তোমার বড় ছেলে আমায় অপমান করে। বলে, আমি তোমায় স্ত্রীর মত পেতে চাই।"—ঘন ঘন কাঁপতে থাকে কংকা। ধনদাস ঝটিতি স্ত্রীকে হাত ধরে তোলে।

প্রতিজ্ঞা করে বলে, "বনবাস দোব।" নিষ্ঠুর খুনীর মত দেখতে লাগে তাকে। কংকার মুখে এক ঝলক আনন্দ খেলে যায়। কথাও যা কাজও তাই।

সওদাগর গভীর বণানীতে ছেলে দুটীকে নির্বাসন দিয়ে এল। নিঃসহায় পড়ে রইল তারা। কিন্তু বনটি এত গভীর যে, রাস্তা পাওয়া কঠিন। কোন জলাশয়েরও চিহ্ন নেই। পিপাসায় ছোট ভাইয়ের প্রাণ ওষ্ঠাগত। সুকুমার জলের অন্বেষণে গেল। কিন্তু পথহারা হয়ে ভাইয়ের কাছ হ'তে অনেক দূরে গিয়ে পড়লো। কতকগুলো লোক সুকুমারকে দেখে আনন্দ করতে লাগলো এবং তাকে ধরে নিয়ে গেল। অত লোকের কাছে বাধাই বা কি করে দেয় সে। এদিকে দাদার পাত্তা নেই দেখে নবকুমার ভয়ে কাঠ হয়ে যায়। এমন সময় এক ব্যাধ শিকার করতে এসে দেখে, মহুয়া গাছের উপর একটি 'হত্তেল' পাখী বসে রয়েছে। পাখীটিকে মারবার জন্য তীর ছুড়লো ব্যাধ। কিন্তু পাখী সে পেল না; তার বদলে দেখলে একটি ছেলে মরার মত পড়ে রয়েছে। ছেলেটিকে নিয়ে এল সে। বলা বাহুল্য, সত্যনারায়ণ "হত্তেলের" রূপ ধরে থেকে নবকুমারের দিকে ব্যাধের দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে নবকুমার আশ্রয় পেল। নবকুমারের দুঃখের কালো রাত গাঢ়তর হয়ে এল। ব্যাধ এক সওদাগরের কাছে তাকে বিক্রয় ক'রে দেয়। সত্যনারায়ণের কৃপাতে কিন্তু এ সওদাগর নবকুমারকে ছেলের মত ভালবাসতে থাকে, এবং বাণিজ্য বিষয়ে শিক্ষা দেয়। পরে নবকুমার বড় হ'লে তাকে এক জাহাজ মাল দিয়ে বাণিজ্য করতে পাঠায়। নদীর উপর ভেসে চলেছে নবকুমার। হঠাৎ সে দেখল যে নদীর তীরে কতকগুলো লোক একটি বিড়ালকে দড়িতে বেঁধে যৎপরো-নাস্তি প্রহার করছে। জীবে দয়াশীল নবকুমার জাহাজ থামিয়ে সেই লোকদের বিড়ালটিকে ছেড়ে দিতে অনুরোধ করলো। কিন্তু তারা বললে যে বিড়ালটি অনেক ক্ষতি করেছে। তখন নবকুমার অনেক টাকা দিয়ে তাদের মনস্তুষ্টি করে তাদের কাছ হতে বিড়ালটিকে নিয়ে আবার জাহাজ ছেড়ে দিলে। রাত্রে ঘুমন্ত নবকুমার স্বপ্ন দেখলে—স্বয়ং সত্যনারায়ণ বলছেন, "আমি বিড়ালরূপে তোমায় ছলনা করলাম। খুব প্রীত হয়েছি আমি। তোমার নৌকা কেবল সোনাতে বোঝাই হয়ে যাবে।" দেববাক্য মিথ্যা হবার নয়। নবকুমার দেশে ফিরে যাবার মানসে এক রাজ্যে জাহাজ নোঙর করলে। কিছুক্ষণ পরে রাজ্যের লোকদের কাছে শুনলে রাজা রাজকন্যার বিয়ে দেবে যে কন্যার সমান সোনা ওজন করে দিতে পারবে তার সংগে। নবকুমারের সত্য-

নারায়ণ প্রদত্ত অনেক সোনা ছিল। সে কন্যার সমান ওজনের সোনা দিয়ে তাকে বিয়ে করলে। পরে নিজের দেশে ফিরে আসবার সময় জাহাজডুবি হ'ল। কোথায় স্ত্রী আর কোথায় নিজে? গৌড়দেশের কতকগুলো লোক নবকুমারকে নদীর কবল হ'তে উদ্ধার করে তারা বোঝা বইবার কাজে তাকে নিয়োগ করলে। নবকুমার একটু আস্তে চললে তারা চাবুক কষে দেয় কোন দ্বিধা না করেই। একদিন নবকুমার বাড়ীর কথা বলতেই তারা তাকে রাজ দরবারে চুরির আসামী বলে বিচার চায়। সে নাকি লোকগুলির গহনা চুরি করেছে।

বিচার আরম্ভ হয়ে গেছে। নবকুমার তার গত জীবনের কুহেলিকা জীবন ইতিহাস বর্ণনা করে বললে, "সেই আমি কি চুরি করতে পারি ধর্মাবতার?"

রাজার চোখ দুটি অশ্রু-আবিল হয়ে ওঠে। পর্দার আড়াল হতে শোনে একটা পাগলিনী। এই পাগলিনীকে নদীর তুফান হতে উদ্ধার করে রাজার এক বন্ধু তাকে উপহার দেয়। কিন্তু সে রাজাকে বলে তার স্বামীর নিরুদ্দেশের কথা। রাজার দয়া হয়। পাগলিনী ছুটে বেরিয়ে এসে নবকুমারকে বলে, "ওগো দেবতা চিনতে পারলে না?" রাজাসন থেকে উঠে এসে রাজা নবকুমারের গলা জড়িয়ে আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করে। "কে দাদা? তুমি—তুমি—।" "হাঁ-আমি। সত্যনারায়ণ তুমিই সত্য। শোন ভাই আমার কথা।

সত্যনারায়ণ স্বপ্নে বলে এ রাজারে।
কন্যা সমর্পন কর বলি এ জনারে॥
বাম হাতে ছয় আংগুল নাসিকা যার সোজা।
তারে আনি সিংহাসনে কর ওহে রাজা॥
রাজার চরেরা তাই মোকে ধরে আনে।
শ্বশুর গত হন জানিবা এইখানে॥

হেন সময়ে এক পাগল আইলা দরবারে।
ওরে আমি তোদের বাপ না খেদারিত (তাড়িওনা) মোরে॥
তখন সবে গলাগলি হুলাহুলি করে।
আনন্দেতে চোখের জল মিশিল সাগরে॥

বীরভূম, সাঁওতাল পরগণা, বর্ধমান প্রভৃতি জিলার পটুয়া

পটুয়াদের মধ্যে বাঙলার নিজস্ব চিত্র অংকন চাতুর্য্য ও সংক্ষিপ্ত ধর্মকাহিনী পদ্য ছন্দে বেঁচে আছে। এরা সমস্ত ধর্মকাহিনীর ছবি এঁকে রেখেছে লম্বা পটের মধ্যে। গৃহস্থের বাড়ীতে গিয়ে সেই পট দেখাবার সময় সুর ক'রে তাদের গান গেয়ে গেয়ে ছবির সাথে পরিচয় করিয়ে চলে। ভক্তিতে গদ্ গদ্ হয়ে বিমুগ্ধ পল্লীবাসী চোখের সামনে সমস্ত লীলা দেখে। চমৎকার লোকশিক্ষা দেবার কৌশল। পটুয়ারা না-হিন্দু না-মুসলমান। এরা নিজেদের চিত্রকর বলে পরিচয় দেয়। মুসলমানের মত কতক আচার ব্যবহার আবার হিন্দুর দেবদেবী নিয়ে কারবার। আরও এক রকমের পটুয়া জাত আছে। এরা নিজেদের হিন্দু বলে পরিচয় দেয়। নিজেরা সাঁওতালদের গুরু গুণিন (মুস্তাজি)। তাদের বোঙাবুঙি দেবতার কথা এরা গান করে। আর ভূত প্রেত প্রভৃতি মানুষের দেহে ভর করলে আভিচারিক মন্ত্র সাহায্যে তাড়িয়ে দেয়। এমনিভাবে সাঁওতালদের কাছে এরা বেশ দু'পয়সা রোজগার করে। বনের মাঝে সাঁওতাল পল্লীতে দু'এক ঘর করে এই পটুয়া জাতির বাস। এদের গান সাঁওতাল ভাষাতে রচিত। কোন উপাখ্যান নেই। বনজংগল, পাখী, ভূত প্রেত প্রভৃতির কথা আছে।

টিকি নারে ঘুঁটো (তিলক) যত বোরেগিগণ
থাকি থাকি হরি হরি বলে ঘনে ঘন ॥
কৃষ্ণ কথা হ'তে—
উনি যশোদা রাণী লাঠি লয়ে হাতে।
ননী চোর কিষ্টেরে যান দেখ তারাতে ॥
জগতের হরি যিনি চিমধুসূদন।
লীলা করে তিনি লয়ে মনুষ্য জনম ॥
এই দেখ মা আগে রাম
(আংগুল দিয়ে রামের ছবিটি দেখিয়ে—)
পিছুতে সীতা জনক নন্দিনী।
আর শির ছত্ত (ছাতা) ধরে যায় লক্ষ্মণ গুণমনি ॥
যমালয়ে বিচার—
এই লোকটি লোকের ঘরে আগুণ দিয়েছিল।
আগুনের মধ্যেতে তারে যমরাজ ঢুকাইল ॥

এই লোকটি বিধবার সম্পত্তি লয়েছিল।
ফুটন্ত তেলেতে যমরাজ সিদ্ধ করে দিল॥

আরও অনেক ধর্মকথা এদের গানে ঠাঁই পেয়েছে। তবে এদের গানের ভাষা সরল হলেও সব পংক্তির শেষে মিল পাওয়া যায় না। কিন্তু সুর অতীব বৈশিষ্ট্যময়।

তখন প্রচারের জন্য কি সুন্দর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এক একটা জাতি ভার নিয়েছিল এ সব কাজের। তখনকার দিনে কদরও ছিল এদের। আঁচল ভরে পেতও তারা প্রয়োজন মত খাদ্য সামগ্রী। কিন্তু আজকাল চাকা ঘুরে গেছে। এই সব লোকশিক্ষার বাহনদের ভুলে গেছে আজকের মানুষ। তাই এই কাব্যগুলি লুপ্ত হ'তে চলেছে। যুবকেরা আর পিতা পিতামহের কাছ হতে মুখস্থ করে নেয় না এই সব গান। কিছু দিনের মধ্যেই লোকশিক্ষার এ ধারা ব্যাহত হয়ে যাবে। নষ্ট হয়ে যাবে বাংলা সাহিত্যের সম্পদ।

গ্রাম্য সাহিত্য ও জীবন

জীবন ও সাহিত্য অংগাংগীভাবে জড়িত। সাহিত্যে জীবনের হাসি কান্না প্রতিফলিত। কত প্রিয়া বিরহের হা-হুতাশে মেঘদূত রচিত হয়। সাহিত্যই জীবনের মরাগাঙে জোয়ার আনে। ভগ্ন হৃদয়ে আনে আশা, আকাঙ্ক্ষা—প্রাণে আনে বল। কত বিক্ষুব্ধ আত্মা পলে পলে গুমরে উঠে সাহিত্যের মাঝে আগ্নেয়স্রোতের মত উৎসারিত হয়। আবার সাহিত্য প্রশস্তিতে মানুষ গেয়ে ওঠে জীবনের জয়গান। গানের আকুলতায় ধুলার ধরণীতে আকাশের চাঁদ যেন গড়াগড়ি যায়। অবরুদ্ধ আত্মার মুক্তির জন্য নদের চাঁদের আকুলতায় গড়ে ওঠে সাহিত্যের ইমারত। মানুষের জন্য মানুষ যে এত কাঁদতে পারে বৈষ্ণব সাহিত্য সম্যক অধিগত না হলে আজিকার পৃথিবীতে কেউ বিশ্বাস করতে পারবে না। মানুষ চায় চিরকাল বেঁচে থাকতে; প্রকৃতির অলংঘ্য নিয়মে যদিও তাকে মরতে হবে অবশ্যম্ভাবী। তাই বাঁচবার নেশা যার মধ্যে উৎকট হয়ে উঠেছে সে তার চিন্তা ভাবনাকে সাহিত্যর মারফতে রেখে যেতে চায়। এমনিভাবে সাহিত্য জীবনকে বয়ে নিয়ে চলে। আর চিরকালের কষ্টি পাথরে সে সৃষ্টির যাচাই হয়। এমনিভাবে প্রকৃতিকে ফাঁকি দিয়ে চলেছে মানুষ অবিরাম। সাহিত্যের মধ্যে কত মানুষের সজল চোখের করুণ চাহনি যেন কার দু'ফোটা চোখের জলের প্রত্যাশা রাখে। কত সমাজ-সভ্যতা চলে গেছে বিলুপ্তির অন্ধকারে; সাহিত্যের মাধ্যমে আজও তার পরিচয় পাওয়া যায়।

বাংলা সাহিত্যে সমাজের কথা, মানুষের সুখদুঃখের কথা, মংগলকাব্যের দিনে বিশেষভাবে মুদ্রিত হয়। প্রায়শঃ ক্ষেত্রে অদৃষ্ট ও পুরুষকারের দ্বন্দ্বে জীবন হয়েছে মহীয়ান। যুদ্ধে যুদ্ধে ক্ষত বিক্ষত মানুষের গানে রচিত হয়েছে 'মংগলকাব্য।' মানুষের হাতে পূজা পাওয়ার জন্য দেবত্ব ম্লান হয়ে গেছে। দেবতা এসে দাঁড়িয়েছে মানুষের দুয়ারে। তাদের কাঙালপনা সত্য ও ন্যায়নিষ্ঠা হ'তে মানুষকে জীবনের গতিভ্রষ্ট করতে পারেনি। অদৃষ্টের রূপে দেবতার জয়-লাভ পরাজয়ের নামান্তর মাত্র। অতিপ্রাকৃতের ধোঁয়াটে আবহাওয়ায় দেবতা ও ঐন্দ্রজালিকে তফাৎ নেই। কিন্তু মানুষ সেখানে দেবতা হয়নি; তার ধৈর্য্যে, ক্ষমায় ও ঔদার্য্যে, পাতিব্রত্যে, নিষ্ঠা ও আদর্শ রক্ষায় মানুষ হয়ে উঠেছে। তা' ছাড়া সাধারণ মানুষের ঘরসংসারের কথা, দৈনন্দিন জীবনযাত্রা প্রভৃতি মংগল-

কাব্যে সবিশেষ অবগত হওয়া যায়। এমনিভাবে তৎকালীন সমাজ-চিত্র এই কাব্যে সুপরিস্ফুট। চণ্ডী-মংগল কাব্যে কবিকংকণ কি নিপুণতার সংগে খুল্লনার রান্নার বিবরণ প্রদান করেছেন তা' প্রনিধানযোগ্য। আহার্য্যের প্রাচুর্য্য সেকালে কবির কল্পনাকে অব্যাহত রেখেছিল—এ কথা অবিসম্বাদিত ভাবে ধরা যায়।

ধর্ম-মংগল কাব্যেও সেদিনের সুন্দর জীবনযাত্রার ছবি ফুটে ওঠে। তাতে অস্পষ্টতার অবলেশ নেই। এমন কি ষষ্ঠী দেবতাও যে মানুষের কতখানি মন জুড়ে ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়। রঞ্জাবতী (রূপরামের ধর্মমংগল) সন্তান কামনায় ষষ্ঠী মায়ের কাছে মানত করে। (১) এমনকি সন্তান হীনাকে সমাজে সকলে পাপী জ্ঞান করতো এই কথাও সাহিত্যে পাওয়া যায়। (২) গহনার মোহ সেকালে সমধিক ছিল। কেন না কবি যেখানে নায়িকা বা অন্য কোন নারীর সাজ-সজ্জার কথা বলতে গেছেন সেইখানেই অলংকারের কথা প্রসংগত এসে পড়েছে আর নানাপ্রকার অলংকারের ফিরিস্তি দিতে তিনি বিরক্ত হন নি এতটুকু।(৩) বিবাহের বর্ণনা করতে গিয়ে রূপরাম সেদিনের সংস্কারের প্রভাবমুক্ত হতে পারেননি। এই সব বর্ণনায় দেখা যায় মানুষের জীবনের প্রতি অনুরক্তি যে কোন সামান্য জিনিষেও সাহিত্যিক দৃষ্টিকোন দিয়ে দেখে তাতে যে আলোক-সম্পাত করেছে তা' সত্যই প্রশংসার্হ।(৪)

(১) ষষ্ঠীকে ছাগল মানে দাণ্ডান জুড়িয়া।
পুত্র হইলে ছাগ দোব দাণ্ডানে বাঁন্ধিয়া॥

(২) পাত্র বলে আটকুড়া যে করে পরশ।
রাম রাম রাজাকে বলায় বার দশ।

(৩) কানে দিল কুণ্ডল কনক পরিচয়।
উপরে বউলি চাকি বসি কথা কয়॥
নাকে নাকমাছি পরে নাপনি করিয়া।
চাঁদের কলংক হইল কিসের লাগিয়া॥
পরিল কুলুপ শংখ সুবর্ণ কংকণে।
করে বাজুবন্ধ ঝাপা মাদুলীর সনে॥
গলা ভরা পলা পড়ে শতনরি হার।

(৪) সাত আয়্য পাঠাইল কুমারের বাড়ী।
মাথায় বহিয়া আনে সুমংগল হাড়ি॥
আনিল গোমুণ্ড হাঁড়ি কাপাস বাড়ী হৈতে।
চাবি আয়্য জড় হয়্যা আংগিনাতে পোঁতে॥

বৈষ্ণব সাহিত্যের ইতিহাসেও বিশেষ ক'রে চরিতাখ্যান রচনার দিনে জীবনের সামান্য জিনিষের বর্ণনাও কবি কত দরদ দিয়ে করে গেছেন। করচায় দৈনন্দিন রান্নার যে বিবরণ দিয়েছেন, তাতে লেখকের পুঙ্খানুপুঙ্খ দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। পারিপার্শ্বিকের পরিমণ্ডলে মানুষকে নিয়েই জীবন। এই পরিবেশকে বাদ দিয়ে জীবন সম্বন্ধে আলোচনা করতে যাওয়া বাতুলতা। তাই এমনিভাবে তখনকার জীবনযাত্রা আলোচনা করলে সর্বদিক হ'তে জীবন সম্বন্ধে বিশেষ পরিচয়ের আশা করা যায়। চৈতন্য চরিতামৃত মধ্যলীলা তৃতীয় পরিচ্ছেদে কৃষ্ণ দাস কবিরাজ গোস্বামী রান্নার যে বর্ণনা দিয়েছেন তা' থেকে সেদিনের স্বাচ্ছন্দ্যের কথা চিন্তা করা অন্যায় নয়।(৫)

গ্রাম্য সাহিত্যেও সামান্যতার দিক দিয়ে এখানে জীবন সম্বন্ধে পরিচয় পাবার চেষ্টা করলে দেখা যায়, শান্ত, অনাবিল জীবনধারা আনন্দের উজান বইয়ে দিতো। তা'ছাড়া জীবনের মূল সুর সম্বন্ধে আলোচনা করলে জানা যায়, দৈবের প্রভাবে মনুষ্য জীবন ছক-কাটা পথে নির্বিবাদে চলতে থাকে। এর অন্যথায় ঝঞ্ঝার অন্ধকারে পথের প্রান্ত নিশ্চিহ্ন হয়ে গতি ব্যাহত হয়। দেবতা মানুষের উপর যতই কৃপা পরবশ হন না কেন সামান্য সেবাপরাধে দেবতার কোপদৃষ্টিতে আবার সব ভস্মীভূত হয়ে যায়। ছয় বৌ আর শাশুড়ীর সংসারে কোপিলার সেবাপরাধে লক্ষ্মী ঘর ছেড়ে যান। গো-লক্ষ্মীকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করতে শাশুড়ী বৌদের রক্তে প্রদীপ জ্বালায়। "হেঁটোর মালুই নয়ে" প্রদীপের কাজ করে। আবার গা কেটে রক্ত নয়ে "আলিপনা" দেয়। গো-মাতার সেবাপরাধে গৃহকর্ত্রী "কোপিলার সাক্ষ্যে তাদের কাটিল নাক কান।" দেবতার নিকট অপরাধে যে পাপ হয় তার স্খলনের জন্য এ কি বিহিত বিধান। এর থেকে জানা যায় সেদিনের জনসাধারণের দেবতার প্রতি কি নিষ্ঠা ছিল। কি অনুপ্রেরণায় যে এই উপাখ্যান রচিত হয় তা' বর্ণনাতীত।

(৫) সাত্রক বাস্তুক শাক বিবিধ প্রকার।
পটল কুষ্মাণ্ড বড়ি মানকচু আর॥
রাই মরিচ সুক্তা দিয়া সব ফলমূলে।
অমৃত নিন্দক পঞ্চবিধ তিক্ত ঝালে॥
কোমল নিম্বপত্র সহ ভাজা বার্ত্তাকী।
পটল ফুলবড়ি ভাজা কুষ্মাণ্ড মান চা ক
নারিকেল শস্য ছেনা শর্করা মধুর॥

তারপর দেবতার কৃপাদৃষ্টি না থাকলে জীবনে কোন পথ নেই এ বিশ্বাস গ্রাম্য সাধারণের মধ্যে যথেষ্ট ছিল। নবকুমারের সংগে কে না বিরোধিতা করেছে। বিমাতার প্ররোচনায় পিতা তাকে বনবাস দিয়েছে। কত শত্রু তাকে হত্যা করতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু জীবনের শত জটিলতার পাক খুলে সে রাজার আসনে বসেছে। তার কারণ সত্যনারায়ণের প্রসাদে তার জন্ম। দেবতা থেকেছে পাশে পাশে বিপদে, রোগে, শোকে। আর এক পুত্র তার নারায়ণ বিরোধী। পিতার নিকট পূর্ণিমা রাত্রে সত্যনারায়ণ পূজা করা জীবনের শ্রেয় কাজ বলে বসবাসের পথে পা দেয়। সাধ্বী স্ত্রী অনুগামিনী হয়। তারপর অন্তঃস্বত্বা স্ত্রীর বনেই সন্তান হয়। কিন্তু অদৃষ্টের নির্মমতায় বনের মাঝে স্বামীকে হারায়। তারপর একদিন তাদের দুঃখের নিশা কুহেলিকামুক্ত সূর্য্যের হাসিতে ঝলমল প্রভাতের নিশান ওড়ায়।

গ্রাম্য-জীবনে ধর্মের ভিত্তির আলোচনা ব্যতিরেকে পারিপার্শ্বিক প্রভাবিত দৈনন্দিন জীবনযাত্রাকে মুখ্য ক'রে আলোচনা করলে অনেক নতুনত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। গ্রাম্যজীবনের তুলসীতলা, চণ্ডীমণ্ডপের পাশেই নিঃসন্দেহে ঢেঁকিকে স্থান দেওয়া যায়। এই ঢেঁকিকে কেন্দ্র ক'রেও সাহিত্য রচিত হয়েছে। আজও তা লোক-মুখে শোনা যায়। কালের প্রকোপে একদিন হয়তো এই ঢেঁকি-প্রশস্তি মূক হয়ে যাবে। বাড়ীর গরুটী, ঘরের খোকাটি আর ঢেঁকিটি যে এক পর্য্যায়ে ছিল মানুষের কাছে তা' শুনে লোকে বিশ্বাস করতে চাইবে না। কতখানি দরদ থাকলে তবে মানুষ কাঠের ঢেঁকি আর নিজের ছেলেকে এক ক'রে দেখতে পারে। ছেলের জন্য গ্রাম্য ছড়ায় পল্লীর হাট বাট মুখরিত আর ঢেঁকির জন্যও গান রচিত হয়েছে। কাঠের জড় ঢেঁকি ব্যক্তিত্ব আরোপে ধন্য হয়ে গেছে।

ঢেঁকি দ্বারা ধান হ'তে চাল তৈয়ারী করা মহাপুণ্যের কাজ জ্ঞানেই পল্লী-কবি কৃষ্ণলীলার অবলম্বন গোপিনীদেরও চাল তৈরী করিয়ে ছেড়েছে :

ধান ভানরে মুরলী বসনী
বৃন্দাবনে ধান ভানে ষোলশ' গোপিনী ॥

কবি আবার ঢেঁকির মুখ দিয়েই তার নিজের পরিচয় প্রদান করছে :

ঢেঁকিটা বলেরে ভাই আমি নারদের হাতি।
সব ঠাঁই থাকতে আমার পাছায় মারে লাথি ॥

ঢেঁকি যে কাঠের উপর থাকে সেই কাঠ দু'টোও কথা কয়ে বলে :

* * * আমরা জোরের ভাই।
দু' সখিতে ধান ভানে আমরা কৃষ্ণ গুন গাই॥

পল্লী সাধারণ চাল তৈরী করতে গিয়ে ঢেকির শব্দে কৃষ্ণ কথা শোনে। দেবতার দরবারে নিজেকে বিকিয়ে দিলে এমনিভাবে গাছে পাতায় হরি গুনগান শোনা যায়। ঢেকির চাল তৈরী করবার লোহা বাঁধানো মুখটা বলে,—

মুখ সলাই বলে আমার লোহায় বাঁধা ঠুঁট।
আমার এঁটো খেয়ে লোকের চাঁদপারা মুখ॥

কুলো, চালুন (বাঁশ বাখারির পাত্র বিশেষ), উঠান আর চাল রাখবার বড় হাঁড়ি সকলেই কথা কয়ে ওঠে।

কুলোটা বলেরে ভাই আমি বাঁশের চাংগারী॥
যত কিছু ধান চাল আমিই পাছুরী॥
চালুনটা বলেরে ভাই আমি সহস্রধারা।
যত কিছু ধান চাল আমি করি সরা ভরা॥
আঙনেটা বলেরে ভাই আমায় করে হেলা।
যত কিছু ধান চাল আমিই করি মেলা॥
হাঁড়িটা বলেরে ভাই আমার নাম হরে।
যত কিছু ধান চাল আমিই রাখি ভ'রে॥

এই ছড়ার ভেতরে ধান হ'তে চাল তৈরী করে বাড়ীতে রাখার সমস্ত বিবরণই সুন্দরভাবে পাওয়া যায়। 'ধান ভানতে মহীপালের গীত' বলে আমাদের দেশে একটা কথা আছে। হয়তো ধান ভানতে পাল রাজ বংশের কোন মহীপালের সুখ্যাতি হ'ত কিন্তু ঢেঁকির গান ঢেঁকিতে চড়ে কুলবালা, কুলবধুরা যে গাইতো তার নজীরও অপ্রতুল নয়।

পল্লী-কবির কল্পনা অকৃপণভাবে সকল জিনিষের সাহায্যে কবিতা রচনা করেছে। সামান্য শাককে উপজীব্য ক'রে লিখিত ছড়ার মধ্যে পল্লী জীবনের চমৎকার ছবি পাওয়া যায়।

লালতের শাক বলেরে ভাই আমার বড় লাল।
আমার মর্য্যাদা জানে বুড়ো বুড়ীর গাল॥

দন্তবিহীন বৃদ্ধ বৃদ্ধার কাছে চিবিয়ে খাওয়া আর গিলে খাওয়ার তারতম্য কবি লালতের শাকের যে বর্ণনা দিয়েছে তা' মুখে বলা যায় না :

থমলটে শাক বলেরে আমার গায়ে লেগেছে খড়ি।
আমার মর্য্যাদা জানে পুস্ত আর বড়ি॥
পোনকা শাক বলে আমার গায়ে লেগেছে পোকা।
গেঁক শিয়ালী থ্যাক করলে ফেলিয়া এলাম টোকা॥
নটের শাক বলে আমার গায়ে লেগেছে গিরি।
আমি লোকের ভাত খাওয়ার জুড়ি॥
ঢেরো শাক বলে আমার চিরিচিরি পাতা।
আমার মর্যাদা জানে ভাই সাহেবের খাতা॥
শুশনীর শাক বলে আমার তেফেরেংগা পাতা।
আমার শাক তুলতে বৌরা কয়রে মনের কথা॥

এই দু'টি মাত্র পংক্তিতে পল্লী-কবি গ্রাম্যজীবনের যে ছবি অংকন করেছে 'তা' অনির্বচনীয়। শুশনী শাক জলা মাঠে বা পুকুরে জন্মায়। বাড়ীর বৌরা এ বাড়ী সে বাড়ী হ'তে এক বয়সী সংগী বৌদের সাথে সকলে মিলে শাক তুলতে যায়। এ বিষয়ে তাদের স্বাধীনতা আছে। কিন্তু এই তো অবসর। এই সুযোগে তারা পরস্পর নিরালায় আপন আপন মনের কথা অপরের কাছে ব্যক্ত করে মনকে হালকা করে। শাকনে শাক বারো মাস পাওয়া যায়, তাই তার কদর কম। এরজন্য যেন মানুষের মতই এ শাক ব্যথা পায়। অন্য শাকের অভাবের সময় আবার শাকনে শাকের স্মরণ নিতে হয় সকলকে।

শাকনে শাক বলেরে ভাই আমাকে করে হেলা॥
আমি লোককে রাখি টানাটানির বেলা।

এ সব ব্যতিরেকে পল্লী বধুর জীবনের ছোট একটি ছবি ছড়া মারফৎ যা' পাওয়া যায় তার থেকে কুলবধুর আর এক দিকের পরিচয় দেবার প্রয়াস:

চার গাছা মল ঝমক ক'রে।
পিছন-পেড়ে কাপড় পরে॥
যাচ্ছিলাম রে পুকুর পাড়ে।
মুখপোড়ারা ঠাট্টা করে॥
বলবো আমি গিয়ে ঘরে।
দেখি সে কি বিচার করে॥
নাতো চলে যাবো দেশান্তরে॥

মল আর পিছন-পাড় কাপড়ে সজ্জিত বৌয়ের পুকুরে যাওয়ার দৃশ্য আজও

পল্লীর পুকুরের পথে কলসী হাতে বা এমনি দেখা যায়। পল্লী বধূর ঘাটে যাওয়ার কথা নিয়ে অনেক কবি অনেক লিখেছেন কিন্তু গ্রাম্য কবির 'চার গাছা মল ঝমক ক'রে' যাওয়া বধূর কথায় যে অনুরণন জাগায় তা' বিশেষ করে উপভোগ্য।

বিশেষ অভিমানিনীর দেশান্তরে যাওয়ার কথায় স্বামীর বিচারের প্রত্যাশা করে যেন সকলে। পল্লীর ঘাটে বাটে 'মুখপোড়া'দের একটু ঠাট্টা রসিকতা না থাকলে এই বৌদের দেখা পাওয়া যেত না। বাঁশ বাখারির বেড়া দিয়ে ঘেরা সংসার জীবনের তেজস্বিনীর দেখা পাওয়া যায় আজও।

ননদ বৌ মিলে যে সংসার জীবন সে জীবনকে কেন্দ্র করেও অনেক কবিতা আছে। এই সাহিত্য আলোচনা করলে গ্রামজীবন সম্বন্ধে জানতে পারা যায়।

দাদাভাই চালভাজা খায় ময়না মাছের গুড়ি।
একশ' টাকার বৌ কিনেছি ছুঁচোমুখো ছুঁড়ি॥
ছুঁচো হোক আর হোক তাও আমরা পারি।
খাবার সময় মুখ বেঁকালে ঐ জ্বালাতে মরি॥
কালো হোক খাঁদা হোক তাকে আমরা পারি।
নাক সিট্‌কে কথা কয় ঐ জ্বালাতে মরি॥

পল্লীজীবনে স্বভাবে লক্ষ্মী বৌয়ের প্রয়োজন, রূপের প্রয়োজন তত নয়।

বৌয়ের জীবন সম্বন্ধে যে ছড়া পাওয়া যায় তাতে সামান্য কথায় বধূর বিষাদান্ত জীবনের ছবি সুপরিস্ফুট হয়।

গিন্নী ভাংগলে জার(১)
কর প্রাচীর পার।
বিটি ভাংগলে কাঁসি(২)
পড়ে গেল হাসি।
বৌ ভাংগলে সরা(৩)
গিন্নী বেড়ায় পাড়া পাড়া॥

বৃদ্ধ বরে বিবাহ কুমারীদের কাছে আতংকের বিষয়। তাই রসিকতার ছলে বৃদ্ধের সাথে বিবাহ দেওয়ার কথা ছড়ার ছন্দে দিকে দিকে প্রচারিত।

উলু উলু মান্দারের ফুল।
বর আসছে কত দূর॥

(১) বড় পাত্র বিশেষ (২) কাঁসার পাত্র বিশেষ (৩) মাটির ছোট পাত্র

বরের মাথায় চাঁপার ফুল।
কনের মাথায় টোকা।
হেন বরকে বিয়ে দোব তার গোঁফদাড়িটা পাকা॥

নারী পুরুষের ভালোবাসার জীবনে এ-সাহিত্যে পুরুষকে প্রাধান্য দেওয়া হয়নি। প্রায় ক্ষেত্রেই পুরুষকে ছোট করা হয়েছে।

কাঁদির বাড়ীর মুরকি মুড়ি।
বর্দ্ধমানের ছাঁচি পান।
তুমি করেছ অভিমান।
মান করেছ বেশ করেছ পয়সা রাখ বাকসাতে।
তোমার পানা ভালবাসা ফিরছে আমার রাস্তাতে।

বিধবার হাতে শাঁখা থাকা পল্লীর জনাসাধারণের কল্পনার অতীত। ধর্মভাব এদের মজ্জাগত। ধর্মের অনুশাসনের সাথে শাঁখা ব্যবহারের সম্বন্ধ তাই। মজার কথা হিসাবে পল্লী-সাহিত্যে শাঁখাপরা বিধবার অস্তিত্ব কল্পনা করা হয়:

আম ধরে থোবা থোবা তেঁতুল ধরে পংখা।
পুব দেশে দেখে এলাম
রাড়ীর (বিধবার) হাতে শংখা।

এ কথায় বেশ চমকের সৃষ্টি হয়।

অবিবাহিত কুমারীরা শিবের কাছে শিবের মত বর চায় সব সমাজে। গ্রাম্য সাহিত্যে সন্তানহীনার কার্তিকের কাছে কার্তিকের মত সন্তান কামনার আকুলতা পল্লী-কবিকে বিচলিত করে। সাদা কথায় দেবতার কাছে মনের কামনা নিবেদন করে নারী ; মাতৃত্বের কামনায় জীবনের পূর্ণতা উপভোগ করবার জন্য অনলংকিত ভাষায় এই প্রার্থনা যেন দেবতার হৃদয়কে কাঁদিয়ে দেয় ; পরন্তু গ্রাম্য-সাহিত্যের ভাণ্ডার পূর্ণ হয়।

নব ঘন কার্তিক আমাকে ছেলে দাও একটী চাঁদ পারা।
দিও না কানা দিও না কুজো দিও না যেন দাঁত কারা॥
বছর বছর করবো পূজো দিও না যেন কানা কুজো।
দুই হাতে দুই দিব মণ্ডা।
ছেলে ক'রে দিও যেন ঠাণ্ডা॥

এমনি ধারা গ্রাম্য-জীবনের নানাদিক সম্বন্ধে বহু কবিতা পাওয়া যায়। এই সাহিত্যে গ্রাম্য-জীবনের এক এক দিকের আস্তরণ তুলে দেশের বৃহত্তর জন-

সমাজের সত্যিকার জীবনের সাথে পরিচিত হ'তে সহায়তা করে। পূর্ব আলোচিত প্রবন্ধ সমূহে জানা যায়, গ্রাম্য সাহিত্য সাধারণতঃ কোন পূজাকে অবলম্বন করে বা কোন জাতির জীবিকার্জনের সহায়তা করে অস্তিত্ব বজায় রাখে। তেমনি এই গানগুলিও ঘেঁটু পূজার আমোদ-প্রমোদের জোগান দিতে অস্তিত্ব বজায় রেখে এসেছে। এই ঘেঁটু পূজা পংশ্চিমবংগে অনেক জেলায় অনুষ্ঠিত হয়, তবে অর্থনৈতিক সংঘাতে ধ্বসে পড়া পল্লী-জীবনের সংস্কৃতি বানচাল হয়ে গেছে। লোক দেবতার পূজা এককালে এ সাহিত্যকে বাঁচিয়ে রাখতো কিন্তু এখন বিশ্বাসের মূল শিথিল হয়ে গেছে। লোক দেবতার উৎপাত তাই কমে এসেছে। সেইজন্য গ্রাম্য সাহিত্য ভাঙনের মুখে।

জাতির নিজস্ব ধারা ধরণ সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকলে তা' নিয়ে গৌরব করতে না পারলে সে জাতির মংগল নেই। জাতীয় ভাব-ভাবনা, আচার-ব্যবহার, প্রত্যেকের কাছে প্রিয়। এমনি ক'রে এই সাহিত্যের মাধ্যমে এক বৃহত্তর জন-সাধারণের সাথে পরিচয় অনায়াসলভ্য হয়ে ওঠে এবং পূর্ণ পরিচিতিই সকলকে আপনার ক'রে দরদ দিয়ে দেখবার প্রেরণা জোগায়। মানুষ মানুষের আত্মীয় হয়ে ওঠে ; দেশ যায় শ্রীবৃদ্ধির পথে।

সেদিনের সাহিত্যে সৃষ্টিতত্ত্ব

প্রশ্ন করা মানুষের আদিম নেশা। সুমীমাংসিত সদুত্তর না পাওয়া পর্য্যন্ত মানুষ পাগল হয়ে যায় আত্মপ্রসাদ পাওয়ার উদগ্র আকুলতায়। সৃষ্টির আদি হ'তে জ্ঞান-পিপাসাই মানুষকে প্রশ্ন করবার জন্য তাগিদ দিয়ে আসছে। নিজেকে দেখে মানুষের মনে প্রশ্ন জেগেছে; এসেছে জীবন-জিজ্ঞাসা। সুন্দরী পৃথিবীকে দেখে প্রশ্ন জাগে সৃষ্টিবৃত্তান্ত অবগত হবার জন্য। তাই সেদিন থেকে অনেক কথাই ভেবে আসছে একান্ত কৌতুহলী মানুষ। পুরাকালীক সাহিত্যে তা' সুপ্রকট।

বাংলা সাহিত্যের মধ্যেও কি যেন আত্ম-জিজ্ঞাসা জেগেছিল—বাঙালী সিদ্ধাচার্য্যের দোঁহাগুলিই তার প্রমাণ। সৃষ্টিতত্ত্ব জানবার আগ্রহও হয়েছে তেমনি একদিন। পৃথিবী কি করে সৃষ্ট হ'ল। কি ক'রে মানুষ জন্মেছে? এসব প্রশ্নের সদুত্তর খুঁজতে গিয়ে যে সাহিত্য সৃষ্ট করেছে সাহিত্যিকেরা, তার পরিমাণ কম নয়। কিন্তু তখন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগীর বিকাশ লাভ করেনি, ধর্মপ্রবণতার জোয়ারে মানুষের নিজস্ব বিচার বুদ্ধি বানচাল হ'য়ে গিয়েছিল, তাই এ সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে মানুষ যখন নিজেকে অসহায় ভেবেছে তখনই ধর্মকে করেছে একমাত্র আশ্রয়। তাই দেখা যায়, নানা ঐশ্বরিক লীলার মধ্যে পৃথিবীর জন্ম। সৃষ্টিরহস্য উদ্ঘাটন করবার জন্য মানুষ বহু গান উপাখ্যান আখ্যায়িকার সৃষ্টি করেছে ধর্মের পরিপ্রেক্ষিতে। এতে সৃষ্টিতত্ত্ব জানা যায়নি সত্য কিন্তু কথঞ্চিৎ আত্মতৃপ্তি যে পেয়েছিল মানুষ—এ-কথা অসত্য কি করে বলা যায়?

তাই দেখা যায় সৃষ্টিরহস্য ভেদ করবার আগ্রহ সাহিত্য সম্ভাবনা সূচিত করেছিল। বাংলা সাহিত্যের এ ধারা একদিন কাণায় কাণায় ভরে ওঠে। তন্মধ্যে কখন হ'তে মাটির বুকে হল চালনা ক'রে আহার্য্য সংস্থান করতে সুরু করে মানুষ—তাও সাহিত্যিকদের উদ্বেলিত করেছিল। সেইজন্য এ প্রশ্নকে কেন্দ্র করেও বহু প্রকার উপাখ্যানের সৃষ্টি হয়। গোয়ালী জাতির মুখ থেকে এমনি এক উপাখ্যান শোনা যায়। ব্রতকথার মত সুর ক'রে পল্লীবাসীদের দুয়ারে গেয়ে যেত তারা। এখন কচিৎ তাদের দেখা পাওয়া ভার। কালের ধ্রুব বিধানে এ সব রীতি আজ লুপ্ত প্রায়।

এই উপাখ্যানে কোন কবির ভণিতা পাওয়া যায় না। কখন রচিত হয়েছে তা'ও বিস্মৃতি দিয়ে ঢাকা। তবে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করলে জানা যায়, সেদিনের সাহিত্যে এ ধারার বান ডেকেছিল। বিশেষ করে শিবায়ণ কাব্যই তার নজীর। মংগল কাব্যে বর্ণিত বিষয়বস্তু সাধারণতঃ দেব-দেবীর মাহাত্ম্য জ্ঞাপক। ধর্ম-মংগল কাব্য নিয়েই আলোচনা হলে দেখা যায় যে এ কাব্যেও উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়নি। ধর্ম ঠাকুরের ভক্ত লাউ সেনের ভক্তি ও বীরত্ব কাহিনীকে অবলম্বন করেই বহু কাব্য রচিত হয়। কিন্তু এই ধর্ম-মংগলে আশাবাড়ি হাতে শুভ্র-দর্শন ধর্ম ঠাকুরের কথা ছাড়া বহু প্রকারের সৃষ্টতত্ত্বের বর্ণনা আমাদের দৃষ্টি যদিও আকর্ষণ করে না, তবুও, এগুলি সাহিত্যের সম্পদ। বাংলা সাহিত্যে এ ধারার সত্ত্বা সপ্রমাণ করতে ধর্ম-মংগলের সৃষ্টতত্ত্ব প্রকৃষ্ট প্রমাণ; পরন্তু ধর্ম-মংগলের দিনে এ সাহিত্যের চরম অভ্যুদয়—এ কথা অস্বীকার করবার ও উপায় নেই। তখন এ সাহিত্য এত প্রভাব বিস্তার করেছিল যে, ধর্ম-মংগলের সময়ের কবিগণ—যাঁরা ভিন্ন বিষয়বস্তু নিয়ে কাব্য রচনা করতে মনোনিবেশ করেছিলেন—তাঁরা টিকতে পারেননি। খ্রীষ্টিয় ১৬০০ শতাব্দীর প্রারম্ভে দুইখানি বিখ্যাত ধর্ম্ম মংগল কাব্য রচিত হয়।*

বস্তুত ইহাই সৃষ্টতত্ত্ব রচনার যুগ বললে অত্যুক্তি হবে না। সাহিত্যে ঐ সময়কে ধর্ম-মংগল কাব্যের দিন বলেও নির্দেশ করা যায়।

এই উপাখ্যানের ভাষা খুব সরল। বোধ হয় লোকমুখে আপন সত্ত্বা বাঁচিয়ে রেখেছিল বলেই এ পরিবর্তন। তা' ছাড়া শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের চণ্ডীদাস ও পদাবলীর চণ্ডীদাস যদি একজন হয়, তবে মুখে মুখে ভাষার পরিবর্তন যে কত শীঘ্র সম্ভব তা' কারো চিন্তার অবকাশ রাখে না। আর এই উপাখ্যানের সূচনা সাধারণ ধর্ম-কথার মতই। কৈলাসে শিব সাথে শিব-সিমন্তিনী বসে আছেন। ঈশানী জিজ্ঞেস করলেন, আর কতদিন শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ বনে বনে কাঁচা মাংস খেয়ে বেড়াবে? এবার তাদের লক্ষ্মীমন্ত কর।

তারপর শিবের শক্তিতে গিরিজায়ার গর্ভে লক্ষ্মীর জন্ম হল। শশীকলার মত দিনের দিন বাড়তে থাকে লক্ষ্মী। তুহিনে ঢাকা কৈলাস গিরি তার সবুজ প্রাণের সাড়া পেয়ে মুখর হয়ে ওঠে।

সোণার নিছনি যেন অংগেরই গড়ন।
দিনে দিনে বাড়ে লক্ষ্মী চন্দেরই মতন॥

* মাণিক গাংগুলির ও ঘনরামের ধর্মমংগল

আহা কিবা মনোহারী অতি চমৎকার।
মরি কি সুন্দর দেবী জগতের সার ॥

এবার ভবানী স্বর্গ হ'তে মহাবলী ভীমকে কৈলাসে নিয়ে এলেন এবং পৃথিবীতে ধান্য উৎপাদনের প্রথম ভার দিলেন তার হাতে। ভীম মহাবলশালী এবং দক্ষ; তাই পল্লী-কবি মহাবলশালী ভীমের কল্পনা না করে পারেনি। যদিও এই উপাখ্যানের লীলাকাল মহাভারত পূর্ব দিনের। শিবায়ণ কাব্যেও এমনি দেখা যায়। তা' ছাড়া খ্রীষ্টিয় ১৭০০ শতাব্দীর মাঝামাঝি, যখন কাশীরাম দাসের মহাভারতের বাংলা অনুবাদ হয়েছে এবং যা' প্রথম দিন হ'তেই বাংলা সা[illegible]ত্য জগতে আলোড়ন তুলেছিল। তার প্রভাব এড়াতে পারেনি পল্লী-কবিগণ। চিরদিনের সাহিত্য রামায়ণ মহাভারতের আওতায় পরিপুষ্টি লাভ করেছে, এ কথা অনস্বীকার্য্য।

ভীমেরে ডাক দিয়া বলেন মাতাঠাকুরাণী।
চাষ করিতে যাও বাছা তোমারে বাখানি ॥
শিবের এঁড়ে আর লাও বলাই এর হাল।
কোপিলার সাথে লাও কানাই রাখাল ॥
লক্ষ্মীর গায়ের ময়লা করিবে বপন।
তাহাতেই ধান্য হবে দশ বারো পণ ॥
বীজ বলি ঘোষিবেক সেই সব ধান্য।
মাথায় করিয়া সবে করিবেক মান্য ॥
হাসি হাসি ঢলাঢলি গড়াগড়ি করি।
নর নারী উভয়ে করিবে বেড়াবেড়ী ॥
স্তনে মুখে বসন সাংগুটি লবে নারী।
পুরুষে পরিবে বস্তর আঁট সাঁট করি ॥
সোয়ামীর সাথে নারী ঘর করিবেক সুখে।
লক্ষ্মীর মহিমা কথা ফিরিবে মুখে মুখে ॥
সকালেতে দিবে ছড়া সন্ধেয় দিবে বাতি।
দুয়ারেতে বান্ধ্যা থাকবে লাখো টাকার হাতি ॥
চঞ্চলা লক্ষ্মী না বসিবে কোন ঘরে।
লক্ষ্মীর পিঁড়ে নিয়ে যত সাধিবেক নরে ॥

এই সব বলে ভবানী ভীমকে চাষ করতে যাবার জন্য বিদায় দিলেন। ভীম এসে মর্তে প্রথম চাষ করবার প্রথা প্রবর্তন করল।

বর্ধমানের উত্তরে ভীম চাষ করেছিল।
পৃথিমীর ধান কেটে ভীমের আড়াই হাল হ'ল ॥

সেই ধান ভীম জগতের লোকদের দিয়ে চলে এল কৈলাসে। এদিকে পৃথিবীর লোক সব ধান নিয়ে কাড়াকাড়ি মারামারি করতে লাগল। পরস্পর পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ হয়ে ধানে আগুন লাগিয়ে দিলে তারা। ক্রোধ পরবশ হ'য়ে দেবী তাদের অভিসম্পাত করলেন :

কাটা গাছ বাড়ে তবু হিংসা গাছ না বাড়ে।
হিংসার জন্যে তোদের লক্ষ্মী যাবে ছেড়ে ॥
আপোড়া মিত্তিকে রাখলি না কোন খানে।
আপোড়া মিত্তিকের লেগে ঢুঁড়বি সন্ধানে ॥
আপোড়া মিত্তিকে বিনে ষা' হবে পেটের মাড়ি।
পেট ভরবে না তাতে করবি কাড়াকাড়ি ॥

ভবানীর অভিশাপ মানুষকে হাড়ে হাড়ে ভোগ করতে হয়। এ দুর্ব্বাসার হাত হ'তে পরিত্রাণ পাবার কোন উপায় আজ তক মানুষ বার করতে পারেনি।

দেবীর এত ক্রোধ কিন্তু ভীমকে দেখে জল হ'য়ে গেল। তিনি ভীমকে পরিতোষ সহকারে ভোজন করাতে লাগলেন। ভীম কৈলাসে আসবার সময় আঠারো গণ্ডা মরাই সংগে নিয়ে এসেছে।

আঠারো গণ্ডা মরাই ভীম গামছাতে বান্ধিল।
আশী মণ লোহার গদা বগলে দাবিল ॥

* * * *

তিরিশ চালা চাল সিজা খাওয়াইলেন ঠাকুরাণী।
চাল ভাজা ভীম খায় ছালা দশ।
চণক (?) চিবায়ে খায় মুখে হাতে রস ॥
বায় কোটী চালের অন্ন ষাট নাদা ডাল।
অন্ন ভেংগে ভীম দিল চারিদিকে আল ॥
বারো কাহন পিঠা খায় ভীম তেরো নাদা গুড়।
ভীমের পেটের গর্জ্জন যেন করে গো হুড় হুড় ॥
বায় বড়ি সুপারী খায় ভীম তেরো হাজার পান।

এক কলসী চূণ খেয়ে ভীম করে অনুমান ॥
পেতাম যদি বাণ দশ গো খেতাম আমানি।

দৃঢ় ভিত্তি ইমারতের মতই এক একটি ক'রে এই সব উপাখ্যান, ব্রত কথা, ছড়া প্রভৃতি বাংলা সাহিত্যের যে সুমহান ঐতিহ্য গড়ে তুলেছে তা' আজ অবহেলিত। বিস্ময়কর বাংলা সাহিত্য ধারায় ধারায় উৎসারিত হয়েছিল। কিন্তু কত ধারাই রুদ্ধ হ'তে চলেছে কে তার খোঁজ রাখে? আবার ভক্তির প্লাবন বইয়ে দিতে, লোকশিক্ষা প্রচার করতে; সাহিত্যের সম্পদ বাড়াতে—এই সব উপাখ্যান ঘরে ঘরে গীত হওয়া উচিত।

গ্রাম্য-সাহিত্যে পৌষ পার্বণ

পল্লীবাংলার কুটির জীবনে মাসের পর মাস আসে নতুন নতুন আনন্দের হুল্লোড় তুলে। একের পর একটা ক'রে কত পূজা-পার্বণ আসে প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে। ঢাক ঢোলে চারিদিক মুখরিত হয়ে ওঠে। সন্ধ্যায় বারোয়ারী পূজা মণ্ডপে লোক জমায়েত হয়। কবির আসর বসে। পাঁচালী গান হয়। আবার দেবদেবী মাহাত্ম্য প্রচারমূলক উপাখ্যান গীত হয়ে থাকে। কথকঠাকুর ধর্মকথা বিস্তার ক'রে থাকেন। গানে গানে মাতোয়ারা হয়ে ওঠে দশদিক। গান গেয়ে সমস্ত দেশকে বাঙালী পাগল ক'রে দিতে পারে ইতিহাসে তার সাক্ষ্য আছে। গান ক'রে এরা দেবতা পূজা করে। শব-যাত্রার সাথে সাথে কীর্তন হয় এই পল্লীর লোকদের মধ্যে। গান ক'রে এদেশের লোক ভিক্ষা করে। এমন কি এদেশে কান্নারও একটা সুর আছে একথা অত্যুক্তি নয়।

যে দেশে কাঞ্চন-বরণী কন্যার মেঘবরণ কেশের আলুলায়িতায় আকুল রাজপুত্র পংখীরাজ ঘোড়ায় চড়ে অভিযান করে তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে, বেংগমা বেংগমীর দেশের উপর দিয়ে কত শত গল্প কাহিনীতে সেদেশে কথা গাথা গানের উপাখ্যানের অভাব ছিল না কোনদিন। হাজার সমস্যাকীর্ণ গীত-উজানীও পল্লী বাংলার এই আর এক রূপ। এখানে ব্রাহ্মণ শূদ্র ভেদাভেদ নেই। সকলেই এই গানের আসরে সম অংশভাগী। আনন্দের কোন জাত নেই। সব জাতের মাঝে রচিত হয়ে এই সকল সংগীত মুখে মুখে বিস্তারিত হয়। লোক প্রচলিত কাহিনী গানে, ছড়ায়, হাস্য কৌতুকে বিবৃত হয়। মেহনতী কৃষাণ সমাজের এই গানের আসরে আসার জমকায় গ্রামের অভিজাত সম্প্রদায়। আবার ভাদু, ভাঁজো প্রভৃতি ছোট ছোট গানের দল গৃহস্থ বাড়ীর আংগিনায় গিয়ে বলে,

মুখুজ্জ্যে মশাই, মুখুজ্জ্যে মশাই
তোমার বড় নাম শুনি।
আমার ভাদুর নাইকো মিনি
মিনির দামটা দাও তুমি॥

মুখুজ্জ্যে বাড়ীর বড় কর্তা হাসেন। মিনির (নাকের অলংকার) দাম না দিলেও ব্রাহ্মণ ঠাকুর যা' দেন তাতে গানের দল সন্তুষ্ট হয়ে অন্য বাড়ীর ভিতরে সেই বাড়ীর বড় কর্তার নামে আবার গান ধরে।

এ সব গানের উপজীব্য ব্যাপারে এ-সাহিত্যে কোন জাত বিচার নেই। যে

কোন কথা, যে কোন পূজা, যে কোন ব্যাপার নিয়ে এদেশে গানের উৎস মুখ খুলে গেছে। এরা কথায় কথায় গান গাইবার প্রেরণা পায়, যেখানে মানুষ সেখানে সব কিছুতেই আনন্দের উজান বয়ে যায়। দিন, মাস, বর্ষ মাহাত্ম্যকে অবলম্বন ক'রেও গান রচিত হয়েছে। সমস্ত বৎসরের মাহাত্ম্য-কীর্তনমূলক উপাখ্যান বা গুণ ব্যাখ্যানকে ধরে বহু গান শোনা যায়। কোন কোন গানে আবার স্মরণীয় কোন দিনের মধুমাখা স্মৃতিকে অবিরল উৎসারিত রেখে আনন্দের উজান বয়ে চলেছে। বৈষ্ণব সাহিত্যে বারমাস্যা গানের খুবই প্রচলন হয়। নায়িকার বারো মাসের দুঃখ পর্য্যায়ক্রমে বর্ণিত হয়েছে। এমনিভাবে মাসকে নিয়েও বাহু গান রচিত হয়েছে। লোকসাহিত্যের প্রচলিত ছড়ায় বারো মাসে তেরো পার্বণের হিসাবও পাওয়া যায়।

অঘ্রাণ মাসে নবান্ন হয় সরু ধান্য কেটে।
পৌষ মাসে বাউরী বাঁধা ঘরে ঘরে পিঠে॥

এই পৌষমাস পল্লীবাংলায় লক্ষ্মীমাস বলে কথিত। পশ্চিমবংগের দূর পল্লীতে আজিও লক্ষ্মী মাস বলে তা' শোনা যায়। এই মাসে মাঠের সমস্ত সোণার ফসল খামারে উপ্‌ছে পড়ে। মা লক্ষ্মী যেন হেসে ওঠে দশদিকে। সমস্ত বৎসরের খাবার আর সমস্ত বৎসরের মাঠে পরিশ্রমের ফল চাষী চার চোখে দেখে। চোখ ফিরাতে ইচ্ছা করে না। আনন্দের আতিশয্যে গানের ধারা ঝর্‌ ঝর্‌ ঝরে পড়ে। মা লক্ষ্মী যেন আসন পেতে বসে থাকেন।

তাই চাষী পৌষ মাসকে যেতে দিতে চায় না। কালের অমোঘ নিয়মে তা' চলে যাবে।

মানুষের বিরহ যেমন মানুষকে ব্যথিত করে; বিরহের গাথা-গানে ফেটে পড়ে তেমনি আকুলতা। পৌষ মাস চলে যাওয়ার বিরহ ব্যথায় কৃষাণ পত্নী ব্যাকুল হয়ে ওঠে। পৌষের শেষ দিনের ভোরে কৃষান পত্নী মাঘের উষার উদয়ের পূর্বে শুদ্ধচারিণী হয়ে কন্যা সন্তানদের সাথে নিয়ে খামারে যায়; আতপ চালের গুড়ার বেড়া দেয় পৌষমাসের গতিরোধ করতে। এই প্রাচীর তৈয়ার করতে করতে বলে :

এস পৌষ যেয়ো না
জন্ম জন্ম ছেড়ো না।
যদিবা ছাড়িবে তুমি
চরণে ধরিব আমি।

কি ব্যাকুলতা! নিজের জনের আসন্ন বিরহ রোধ করতে প্রিয়জনের ব্যাকুলতা এই ছড়ার সুরে। মানুষ মানুষের জন্য কাঁদে। মানুষ পশু পক্ষী কীট পতংগের জন্য কাঁদে; আবার পল্লী বাংলাব লোকে পৌষ মাসকে ধরে রাখবার জন্যও কাঁদে। তবুও বিরহী বিরহনীর শত ব্যাকুলতা সত্বেও প্রিয়জন যেমন চলে যায়, তেমনি মাঘ মাস আসে। প্রতি বর্ষে বর্ষে পৌষ মাসকে ধরে রাখতে মানুষের ব্যাকুলতা শত কণ্ঠে ধ্বনিত হয়।

কৃষাণ বধু কত মিনতি করে। পৌষ যেন মানুষের মতই চলে যাচ্ছে মনে হয়। সেইজন্য সে বলে ঃ

পৌষ পৌষ পৌষ
বড় ঘরের চালের টুইয়েই বোস ॥

বড় ঘরের ছাউনীর শীর্ষ স্থানে পৌষকে রেখে দেবার কথা পল্লীর হাজার নারী কণ্ঠে সেদিন ধ্বনিত হয়। পৌষ মাস থাকলে লক্ষ্মীও থেকে যাবে। এমনি খামার ভরা ধান উপছে পড়বে তা'হলে—এই মনোবাঞ্ছা।

এই পৌষের গানেও ছোট ছোট পল্লীচিত্র সুন্দর পরিস্ফুট হয়েছে। শাশুড়ী বৌয়ের সংসারে যেন তাদেরই অপরাধের জন্য, তাদের মানসিক অবনতির জন্য, তাদের অপ্রকৃতিস্থতার জন্য পৌষ বিরস হয়ে চলে যায়।

মাঘ মণ্ডল কানে কুণ্ডল
ভুঁই বরাবর কুচা।
আপনে খায় খৈ মুরকি
বৌকে বলে ছুঁচা ॥

বস্ত্র বিলাসিনী শাশুড়ীর বধুকে ফাঁকি দিয়ে খাওয়া ও তাকে লোভী বলার বিষাদ করুণ চিত্র। পৌষকে থাকতে বলার এই গানে—মিনতি-করুণ বৌয়ের লজ্জা-মাখা মুখ দেখে হয়ত পৌষের মায়া হবে ছেড়ে যেতে। বৌয়ের মনে যে গোপন কথা ছিল লুকানো, তা' পৌষের মত আপন জনের বিরহ আশংকায় মিনতি জানাবার কালে তার অজান্তেই প্রকাশ হয়ে যায়। যে কথা সখীরা বের করতে পারেনি, মা পায়নি শুনতে কন্যার মুখ থেকে, নিজের গুরু জনের নিন্দার কথা হবে বলে, তাই কয়ে দেয় সংগোপনে পৌষ মাসকে, তাকে রাখবার জন্য। শুধু মিনতি সে যেন থাকে।

পৌষ চলে যাচ্ছে; তাই আতংকিত বধু কত অনুরোধ করে। যদিও পৌষ থাকবে না সে জানে তবুও সে বিশ্বাস করতে চায় না। রাধা জানে শ্যাম

শুধু গোকুলের নয়, দ্বারকারও। এই দুই জীবনের পরিপূর্ণতায় কৃষ্ণ চরিত্র। তবুও সে জানতে চায় না। যেতে চায় না দ্বারকা। শ্যামকে বেঁধে রাখতে চায় গোকুলে, গোকুলবিহারী বলে। গ্রামের বধূ পৌষকে নিজের ক'রে রাখতে চায়। পৌষ থাকলে লক্ষ্মী থাকবে আর লক্ষ্মী থাকলে থাকবে গোলাভরা ধান গোয়ালভরা গরু, পুকুরভরা মাছ। বধূর এই পৌষকে রাখার ব্যাকুলতায় স্বচ্ছলতাপূর্ণ সংসারের কামনা প্রকট হয়ে ওঠে। কি ঐকান্তিকতা তাতে!

বাংলা দেশ এক বিচিত্র স্থান। ধান-ধনের প্রাচুর্য্য ত্যাগ করে এদেশের সন্তান নতুন ধর্মসাধনার পথ গ্রহণ করেছে। ধান-ধনের পরিপূর্ণতায় বাণিজ্যিক সভ্যতায় সর্বাগ্রগণ্য ছিল এককালে এই দেশ। আবার দুটী ভাতের জন্য লাখে লাখে মৃত্যু বরণ করেছে এই দেশেরই লোক। একদিন গ্রামীন বাংলার মধ্যে মানুষ সুখে বেঁচে থাকার অর্থ পেট পুরে ভাত খেতে পাওয়া বুঝতো। দু'মুঠো ভাত খেয়ে সেদিনের বাঙালী স্বচ্ছন্দে জীবনাতিপাত করেছে। গ্রামীন সংস্কৃতির ভাংগনের সূচনায় ও অন্ত্য বাংলার যুগসন্ধিক্ষণে ভারতচন্দ্র জন্মেছিলেন। তাঁর সাহিত্যে তাই সেদিনের বাঙালীর কথা সুপরিস্ফুট। ভবানী ঈশ্বরী পাটনীকে বর প্রদান করতে চাইলে পাটনী সা[illegible] রাজার ধন চায়নি। চায়নি কারো উপর প্রভুত্ব করতে। বলেছিল, "আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।" সেদিনের বাঙালীর দুধে ভাতে থাকাটাই ছিল চরমতম স্বচ্ছন্দ্যের নিদর্শন। পৌষ পার্বণের ছড়ায় কত মিনতি ক'রে কৃষাণ পত্নী পৌষকে থাকতে বলছে।

থাক পৌষ থাক তুমি ঘরেতে বসিয়ে।
ছেলে পুলে ভাত খাবে উদর পুরিয়ে॥

কৃষাণ বধূ আর কিছু চায় না। সন্তান সন্ততি পেট পুরে ভাত খেতে পাবে বলে সে পৌষ মাসকে থাকতে মিনতি করছে। ধনীর স্ত্রী হ'তে চায়নি। কামনা করেনি রাজার রাণী হবার জন্য। সত্যই দুধে ভাতে বাঙালী একদিন দিক্‌বিজয় করেছিল। সাহিত্যে বিরাট কীর্তি রেখেছিল। ভাস্কর্যে রেখে গেছে অবিস্মরণীয় প্রতিভার পরিচয়। দেশ জয়ে রেখেছে অতুল কীর্তি।

পৌষকে থাকবার মিনতির মাঝে সেদিনের বংগ জীবনের আকাংখ্যা কৃষক পত্নীর ছড়ায় ধ্বনিত হয়ে ওঠে। যে বাংলায় প্রচুর পেটের ভাত ছিল, মানুষ হয়ে শুধু বেঁচে থাকার খাবারের অভাবে লোকে পথের কুকুর বেড়ালের

মত মৃত্যু বরণ করতে বাধ্য হ'ত না, যে দেশে প্রতি বৎসর পৌষ মাসের শেষে লক্ষ্মীকে হারবার জন্য আকুলতা জেগে উঠ্‌ত বংগ জননীর কণ্ঠে, তার সন্তান সন্ততিকে সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য আজ সেখানে হাহাকার।

পৌষ আসে চলে যায়। যাবেও আবার চলে কিন্তু সুখের দিনকে মানুষ আপন জনের মত কল্পনা ক'রে তাকে থাকবার জন্য মিনতি করে তার নজীর এই গ্রাম-বাংলার মা বোনেরা। বিবর্তনের পথে বাংলার জন-জীবনে আসে দুর্ভিক্ষ, কাতারে কাতারে লোক মরে প্রতিকারহীন অবস্থায়। তাই এই পরিস্থিতিতে সুখের দিনের আকুলতায় গ্রাম-বাংলায় পৌষের ডাক, ক্ষেত খামারের গান প্রাণকে আকুল করে।

গ্রাম্য-সাহিত্যে বিবাহ

গ্রাম্য-জীবনের আলোচনায় দেখা যায় যে, এক একটা জাতি এক ধারার সাহিত্যকে মুখে মুখে বংশের পুরুষ-পরম্পরায় বাঁচিয়ে রেখেছে ও সেই-সাহিত্যই তাদের জীবিকার্জনের সহায়তা ক'রে চলেছে। বিধ্বস্ত পল্লীজীবন আজিও এ সাহিত্য হ'তে রস সঞ্চয় ক'রে সেদিনের অনাবিল আনন্দধারার ক্ষীণ স্রোতরেখা সঞ্চারিত রাখতে অবিরত চেষ্টা করে চলেছে। তাই মনের দিক হ'তে পল্লীবাংলা একেবারে মরে যায়নি। এমনি ধারার সাহিত্যের সন্ধান করা যায় গ্রাম্য নাপিত জাতির মুখ থেকে। সাধারণতঃ এই সাহিত্যগুলি ওদের মুখে মুখে প্রচলিত, তবে কীট দষ্ট পুঁথির সন্ধানও পাওয়া গেছে। পর্যায়-বদ্ধ উপাখ্যানের সন্ধান না পাওয়া গেলেও যত কবিতা মেলে তা' কম নয়। বিবাহ ব্যাপারকে কেন্দ্র ক'রে এই গ্রাম্য-সাহিত্য রচিত। মাংগলিক কাজে নাপিতের প্রয়োজন একান্ত এবং বিবাহ সভায় তার উপস্থিতি বাঞ্ছনীয়। বর-কনেকে ভাবী জীবন সম্পর্কে অবহিত করতে, সর্ব-সাধারণ্যে বিবাহের মূল কথা প্রচার করতে এবং বিবাহ সভায় এক ঝলক হাসি ছিটিয়ে দিতে নাপিতের মুখে ছড়ার ফুল-ঝুরি ছোটে। এই ছড়া বলবার অবকাশ দেওয়ার সময় ঠিক ক'রে দেওয়া আছে। পৃথক, পৃথক সময়ে বলবার আলাদা আলাদা ছড়াও আছে। বর কনের উভয় পক্ষের নাপিতের কবিতাযুদ্ধও বেশ উপভোগ্য হয়ে ওঠে সকলের। এমনি ক'রেই সাহিত্য ওতঃপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছে জীবনের সাথে।

এই সাহিত্যের উপজীব্য বিশেষতঃ রামসীতা ও হরগৌরীর বিবাহ। তবে হরগৌরীর বিবাহ ব্যাপারকে নিয়েই বেশী ছড়া লিখিত। হরের সংসারে বড় টানাটানি; দিনে রাতে স্ত্রীর মুখ-ঝামটা খেতে খেতে সে বেচারা হদ্দ হয়ে গেছে। তা' ছাড়া তাদের মনে মিলও যত গরমিলও তত। কচ্‌কচি করতে করতে গৌরী ত দিনে তিনবার ক'রে বাপের বাড়ী পালাবার হুমকী দেয়; তখন শিব হাত কচলাতে কচলাতে আন্‌ কথায় স্ত্রীর মন ভুলাতে চেষ্টা করে। দাম্পত্য জীবনের সংগে গ্রামীণ ঘর সংসারের কোথায় যেন একটা তার এক সুরে বেজে ওঠে। তাই গ্রাম্য-কবির কাছে শিব দুর্গার কথাই বেশী মুখরোচক হয়ে থাকে। তা' ছাড়া ত্যাগের দিকেই আমাদের ধর্ম আহ্বান করে থাকে। শিব ত্যাগের মূর্ত প্রতীক; গার্হস্থ্য ধর্মে তাই শিবকে আমরা আদর্শ ক'রে নেই এবং বাহ্যিক

ঐশ্বর্য কোনদিন আমাদের কাছে লোভনীয় নয়—মনের ঐশ্বর্যই কাম্য। ঐ কামনা গ্রাম্য-কবির রচনায় আকুল হয়ে জাগে। ধর্মের বাগ-বিতণ্ডা থেকে দূরে এমনি ক'রেই ভারতীয় আদর্শের প্রতি এই সব ছড়াগুলি অবলীলাক্রমে সাধারণকে আকৃষ্ট ও অবহিত করে। এ দ্বারা লোকশিক্ষার প্রসার ও ধর্ম কথা প্রচার হয়। প্রত্যেক ছড়াতে বর-কন্যাকে হর-গৌরীর সাথে তুলনা ক'রে গ্রাম্য কবি বিবাহ রাতেই তাদের গার্হস্থ্য জীবনের গুরুত্ব সম্বন্ধে সচেতন করে। রাম-সীতার সংগেও বর-কন্যার তুলনা করা হয়েছে; তাতে মনে হয় জানকীর ধৈর্য্য আর রামের শৌর্য্য আত্মসাৎ করবার প্রেরণা জোগায় এই ছবিগুলি।

এই সব কবিতাগুলি কখন লেখা হয়েছে তা' অনবধারিতই থেকে যাবে, কারণ এই ছড়া শুধু লোকের মুখে মুখেই শুনতে পাওয়া যায়। পুঁথিতে সাল তারিখ পাওয়া গেলে ধারণা করা যেত এই সাহিত্য রচনার উজ্জ্বল দিনের কথা। কোন কোন ছড়ায় অবশ্য পল্লী-কবির নাম পাওয়া যায়, তবে সেই কবির লেখা কোন কাব্যের সন্ধান পাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। কারণ শুধুমাত্র এই ছড়াগুলিতেই যাদের প্রয়োজন ছিল—তাদের কেউ বিখ্যাত কবি ছিল না। তা' না হলে ছড়ায় বহু কবির কাব্যের সম্ভাবনা বা অস্তিত্ব সম্বন্ধে জানতে পারা যেত বলেই মনে হয়। এদের অনেকেরই মধ্যেই যে কবিত্ব শক্তি অবরুদ্ধ হয়ে গুমরে মরেছে তা' অনুমিত হয়।

শুধুমাত্র প্রতিকূল জীবন ধারায় তারা প্রকাশ করতে পারেনি নিজেকে। বিবাহ সভায় বক্‌সিসের আশায় এই সাহিত্য রচিত হ'ত বলে অনেকেই এই সাহিত্যের সাহায্য করেছে। ভাণ্ডার পূর্ণ করতে এই রচনাগুলি কোন প্রতিভার বিদ্যুৎদীপ্তি চোখ ঝলসে দেয় না। তবে এই সাহিত্য পল্লী-মানুষের জীবন-ধারা ও সাহিত্য সম্বন্ধে খবর বহন করে—সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

এই বিবাহ অনুষ্ঠানে নিয়ম আছে, বর বাসরে যেতে চাইলে পরিচয় জিজ্ঞাসা করা হয়। কন্যা পক্ষের নাপিত প্রশ্ন করে:

কোথা হ'তে আসিলে ভাই অন্ধকার রাতি।
পরিচয় দিয়ে কহ তুমি কাহার নাতি॥
পুতি কাহার কহয়ে কাহার নন্দন।
পরিচয় দিয়া শান্ত কর মোর মন॥

তখন বরের বদলে বরপক্ষীয় নাপিত উত্তর দেয়:

বিধির স্বজনে উত্তম দুয়ার ঘর।

দুয়ার ছাড়গো আমি ভূজিব বাসর ॥
ত্রিভুবন মধ্যে থাকি আমি কৈলাসবাসী।
হর আমার নাম হেথা গৌরী পেয়সী ॥
* * * হর-গৌরী আরাধিয়ে থেকো চিরজীবি হয়ে।
বলরাম দাস কয় এ কবিতা মিথ্যা নয় ॥

এই পরিচয় দিয়ে বর নিজেকে মহাদেব হ'তে অভিন্ন ভাববার উপদেশ লাভ করে। তারপর বিবাহ সভায় নাপিত শুভদৃষ্টির সময় বলে :

ভবানীর ভয়ে ভব মোহিত হইয়া।
যোগী সনে যোগ সাধনা বিরলে বসিয়া ॥
বিধি বিষ্ণু দুই জনা ভাবেন অন্তরে।
হরের তপোভংগ হবে কি প্রকারে ॥
নারদ পাঠাইয়া দিলেন শুভ লগ্ন স্থির করিতে।
সম্বন্ধের নির্ণয় বসিয়া বিশ্বভারতে।
হরের গমন দক্ষপুর বাজাইয়া গাল। * * *

এই কবিতাগুলি গতানুগতিকতায় ভরা। তাই আমরা উদ্ধৃত করতে বিরত থাকছি।

রাম-সীতার বিবাহের কথা বলেও গ্রাম্য নাপিত সুর ক'রে বলে—

শুনুন শুনুন মহাশয় করি নিবেদন।
রাম-সীতার বিবাহ কথা করুন শ্রবণ ॥
প্রজাপতি নির্বন্ধ কহেন সর্বলোকে।
কন্যাদান মহাফল সর্ব শাস্ত্রে লেখে ॥
নবম বৎসরের কন্যা পিতা যদি দান করে।
সকলে আনন্দিত হয় শুনিলে অন্তরে ॥
শ্রীরামের বিবাহের কালে শুনেছিলেম যখন।
হরের ধনু ভাংগিলেন শ্রীরঘুনন্দন ॥
জনক প্রভৃতি আর মিথিলা নিবাসী।
সভা ক'রে বসে আছেন যত বিপ্রবাসী ॥
অগ্রেতে বসিলেন যত দেবগণ।
পশ্চাতে বসিয়াছে মিথিলার প্রজাগণ ॥
আজ্ঞা করে নৃপবর শুনুন মহাশয়।

শীঘ্র করি কন্যা আন বিলম্ব না সয় ॥
আজ্ঞা পেয়ে নৃপবর গেলেন অন্তঃপুরে।
কন্যা আনিলেন তখন মারিচ (?) মন্দিরে ॥
সপ্তপাক প্রদক্ষিণ করেন যখন।
স্বর্গ হতে পুষ্প বৃষ্টি করে দেবগণ ॥
কি আনন্দ হয়েছে আজ মিথিলা ভবন।
গাল বাজায় নৃত্য করে যত দেবগণ ॥
প্রফুল্লার ডাল (?) যখন নাড়ে নরসুন্দর* ভাই।
রাম সীতার বিবাহ আজ দেখুন সবাই।
দোঁহে দোঁহে মুখ হেরে নয়ন মেলিয়া।
আগে চন্দনের টিকা উভয়ে পরিয়া ॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া রাজা কন্যা করেন দান।
যৌতুক আনিয়া [illegible] জামাতা সম্মান ॥
হস্তি দান ঘোড়া দান দান কাঞ্চন থাল।
মিথিলাপুরের ঘোড়া দান কাশীপুরের শাল ॥
বাঁশবেড়ার বাটা দান খুড়া দেওয়া বাটী।
মংগল কোটের গাড়ু দান কামার পাড়ার ঘটি ॥
আংগুলে অংগুরি দান গলে সোনার মালা।
কাঁচা পাটের জোর দান হাতে দান বালা ॥
তৎপরে দেন কিছু দানের পরিমিত।
নম স্বস্তি বলে গ্রহণ করেন রঘুনাথ ॥
এইরূপে দান করিলেন মিথিলার রায়।
অন্তপুরে নারীগণ বাসর সাজায় ॥
বাসর শয্যার কথা বলতে অধিক রাত্রি হয়।
এ অধিনের প্রতি দয়া করুণ মহাশয় ॥

রাজা জনকের দেওয়া দান সামগ্রী কবির বাসস্থানের পার্শ্ববর্তী বিখ্যাত শিল্প তৈরীর স্থানের নাম আর খুড়া দেওয়া বাটী প্রভৃতির বর্ণনার দ্বারা কবির রচনার আন্তরিকতা সম্বন্ধে চমৎকার ধারণা জন্মে।

*নরসুন্দর—নাপিত।

শেষে নাপিত কবি নিজের কথা বলছে ; বলছে নিজের পাওনার কথা—

গোটা পাঁচ ছয় টাকা দেন আর অধিক কি চাই।
শান্তিপুরের ধুতি চাদর মাথায় বেঁধে যাই ॥
ভাবিয়ে ভবানী পদ হরষিত মনে।
অসংখ্য প্রণাম জানাই ব্রাহ্মণ চরণে ॥
তৎপরে করি প্রণাম যত সভাজনে।
আনন্দেতে উলুধ্বনি করুন বদনে ॥
বর কন্যার মাথায় সোনার মৌর।
নরসুন্দর বলেন গৌর গৌর ॥

এ ছাড়া কৌতুককর ছড়াও অনেক পাওয়া যায়। এই ছড়াগুলি সংখ্যায় কম নয়। এই গুলি পূর্বে বিবাহ সভায় আনন্দের উজান বইয়ে দিত। উচ্ছল হাসিতে ভেসে উঠতো লজ্জারুণা নব পরিণীতা। বরের মুখেও হাসি ফুটে ওঠে।

কে হে তুমি আছ দ্বারে রুধিয়া আমায়।
সবিনয় দ্বার ছাড় প্রবেশি' আলয় ॥
বিনয় করিলাম না শুনিলে কানে।
তবে কিছু কহি আমি রাগ করো না মনে ॥
যামিনী হয় গত তবুও এখানে।
তব গৃহে কি হইল শুনতো শ্রবণে ॥
যখন তো আইলে ছাড়ি তোমার রমণী।
চোর পতি লুকাইয়া রেখে দিলো ধনি ॥
অগ্রসর হইয়া যাও তুমি গৃহ হৈতে।
তারে লয়ে কেলী করে গৃহের মধ্যেতে ॥
দেখিয়া আইলাম আমি তোমার নিকটে।
দ্বার ছাড়ি চলে যাও তাহার তরেতে ॥
ধিক ধিক দ্বারী তবে তোমাকে বাখানি।
ঘরে কেন রাখিয়াছ কুলটা রমণী ॥
তব পরাক্রম দ্বারী বুঝিয়াছি আমি।
তবে কেন মিছা দ্বন্দ্ব করিতেছ তুমি ॥
নিজ পত্নী নাহি পার রাখিতে সামলে।
কলংক না ঘুচিবে দড়ি নিলে গলে ॥

বল বুদ্ধি সব তব বুঝা গেলো দ্বারী ॥
ছাড় ছাড় গৃহে গিয়া গৌরী পূজা করি ॥

এইরূপ বহু ছড়া পাওয়া যায় তবে ক্রমশঃ বেশ অশ্লীলতার ছড়াছড়ি। অন্য দুয়ার ভাংগানী ছড়াও পাওয়া যায় :

দুয়ার ভাংগানী ছড়া শুন সর্বজনে।
দুয়ার আবদ্ধ করি আছ কে এখানে ॥

কোথায় নিবাস তোর কি নাম ধরি।
স্বরূপেতে বল তুমি পুরুষ কিংবা নারী ॥

দুয়ার ছাড়ো কেলাস্ত বসে আছে দশজনে।
ভাবী শ্বশুর কষ্ট পায় বসে সভাস্থানে ॥

আর কেন মিছা দ্বন্দ্ব এবার তুমি সরো।
গৌরী পূজি পরিচয় দিয়া দ্বার ছাড়ো ॥

যদি তুমি হও ওহে ধনীর নন্দন।
ক্ষীর সর নবনীত করহে ভক্ষণ ॥

বসন ভূষণ হবে বিভূত সুন্দর।
সকলের কাছে পাবে সদাই আদর ॥

কিন্তু জেনো এই কথা সার।
নারী হয় এ সংসারে সর্ব অলংকার ॥

এই দুয়ার ভাংগানী বীরভূমের পল্লীতে বিবাহের সময় এখনও অনুষ্ঠিত হয় অনেক বিবাহ আসরে। আর কোথাও হয় কি না সন্ধান সাপেক্ষ। এই ছড়াগুলি বীরভূমের পল্লীতে পল্লীতে সন্ধান করলে পাওয়া যায়। এই ছড়াগুলির সাহিত্যিক মূল্য ব্যতিরেকে গ্রাম্য-জীবনের সংগে পরিচিত হতে গেলে অপরিহার্য।

এখন আর এই সব ছড়াগুলি কেউ বংশের পিতা পিতামহের নিকট হ'তে মুখস্থ করে নেয় না। যে দেশে বিবাহ একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে সে দেশে আবার বিবাহে আনন্দ! তাই এক এক ক'রে এই সব অনুষ্ঠান বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। "শান্তিপুরের ধুতি চাদর মাথায় বেঁধে" যাওয়ার কল্পনা করতে পারে না এখন গ্রাম্য

নাপিত। ক্ষয়িষ্ণু পল্লীর এইদিককার ভাংগন সত্যই মর্মান্তিক। আবালবৃদ্ধ-বণিতা শুনতো, জানতো যে, বরবধুর কর্তব্য রামসীতা বা হরগৌরীর পূত লীলাময় জীবন হ'তে সংগ্রহ করতে হয়। তাই তখনকার সংসারে যেমন রাম বা শিবের মত স্বামী হওয়ার আদর্শ ছিল, তেমনি সীতা বা গৌরীর দুঃখ কথা ঝঞ্ঝাসংকুল জীবন পথে নারীকে সহিষ্ণু করে তুলতো। লক্ষ্মণের মত দেবরের আদর্শও ছিল এ কথা আজিকার ধ্বংসোন্মুখ যৌথ পরিবারের যুগে অবিশ্বাস্য হয়ে উঠেছে। সকলের জন্য সকলেই ত্যাগ করতো; সকলেই থাকতো সুখী।

ছড়ায় ও গানে একটি বছর

বারো মাসে তেরো পার্বণের বাংলায় আনন্দের অভাব ছিল না কোনদিন। আজ মানুষ কোন পূজা পার্বণকে খরচের পাল্লায় পড়ে হাবুডুবু খাবার ভয়ে এড়িয়ে যেতে চায়; কারণ যেখানে সাধারণ মানুষের দু' মুঠো খাবার পাওয়া মহা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে সেখানে বিশেষভাবে খাওয়াপরার ব্যবস্থায় আনন্দ করা এই সব পাল-পার্বণ, ব্রত-অনুষ্ঠান বাঙালীর জীবন যাত্রায় আজিকার দিনে অপ্রয়োজনীয় বোধ জাগিয়ে তুলেছে সাধারণের মনে। কিন্তু এই পূজা অনুষ্ঠানগুলিই বাঙলার প্রাণ ধর্মকে চির-সবুজ করে রেখেছে। তাই এই জাতির ইতিহাসে নানা ঝড়ঝঞ্ঝা কোনদিনই ভিত্তিচ্যুত করতে পারেনি। তাইতো বাঙলার গ্রামে গ্রামে ঝোপে ঝোপে, শ্যাওড়া তলায়, নদীর বাঁকে, কুঁজো বটগাছের নীচে দেবতার আশ্রয়। আর সমষ্টিগত মানুষের পূজায় ও গীত অনুষ্ঠানে এই সব পূজার সার্থকতা।

এমনি ধাবা পূজা উৎসব ছাড়া ঋতু-উৎসবও বাঙলায় বিশেষ প্রাণ-চাঞ্চল্য জাগিয়ে তোলে। অবশ্য ঋতু-উৎসব ভারতে বহুকাল হতেই অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে কিন্তু পল্লী বাংলার মাসে মাসে প্রচলিত সংগীত অনুষ্ঠান তৎকালীন আনন্দ-বর্ধনের বিশেষ সহায়ক হয়ে ওঠে। বাংলার মংগলকাব্যগুলি আপামর সাধারণের মধ্যে বিশেষ প্রচলিত ছিল। সেইজন্য ঐ কাব্যের প্রভাবে মানুষ পথ চলতে গান করতে গেলেও ঐ কালকেতু ব্যাধের কথা, চণ্ডীর কথা, লজ্জাবতী রাণীর কথা বা বেহুলার সতীপণার ব্যাখ্যাই চলে আসতো। তাই এই কাব্যের একটানা আধিপত্যের মাঝেও এমন সব টুকরো উপাখ্যান ও গান অনেক উৎসব অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে প্রচলিত ছিল, যা' সত্যিকারের বৈচিত্র্য এনে দিতো বেশ। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "আজ পর্যন্ত আমাদের সাহিত্যে যদি কবিকঙ্কণ চণ্ডী, ধর্ম মংগল, অন্নদামংগল, মনসার ভাসানের পুনরাবৃত্তি নিয়ত চলতে থাকতো তা' হলে কি হ'ত। পনেরো আনা লোক সাহিত্য পড়া ছেড়েই দিত। বাংলার সকল গল্পই যদি বাসবদত্তা কাদম্বরীর ছাঁচে ঢালা হত' তা' হলে জাতে ঠেলার ভয় সে গল্প পড়াতে হত। কবিকঙ্কণ চণ্ডী, কাদম্বরীর আমি নিন্দা করছি নে। সাহিত্যের শোভাযাত্রার মধ্যে চিরকালই তাদের একটা স্থান আছে; কিন্তু যাত্রা-পথের সমস্তটা জুড়ে তারাই যদি আড্ডা ক'রে বসে, তা' হলে সে পথটাই মাটি, আর তাদের আসরে কেবল তাকিয়া পড়ে থাকবে, মানুষ থাকবে না।" (বিচিত্র

প্রবন্ধ, ১১০ পৃষ্ঠা) প্রাচীন সাহিত্যের আসরের নতুনত্বে তাই বার বার রবীন্দ্র-নাথের এই কথা মনে পড়ে যায়।

বাঙলার পূজা অনুষ্ঠানের মধ্যে সেইজন্যই অনেক সময় দেবতার লীলা বর্ণনা স্তিমিত হয়ে গেছে; গ্রাম্য নায়ক-নায়িকার দুঃখ-আর্তি মানুষের মনকে ভরিয়ে রেখেছে পুরোপুরি ভাবেই। আবার কখনও বর্ষোৎসবে গ্রাম্য জনসাধারণ আগামী দিনের আনন্দ উৎসবের কথা ছড়ায় গানে স্মরণ করে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে। আবার কখনও কখনও আনন্দ-অনুষ্ঠানে দেবতাকে একেবারে আমলই দেওয়া হয়নি।

তাই গাজনের সাথে কোথাও কোথাও সমবেত সকলে গান গায় নতুন বর্ষ-প্রশস্তি করে। কত আশা উদ্দীপনা জেগে ওঠে প্রাণে।

আশ্বিনে অম্বিকা পূজা মেষ মহিষের ঘটা।
কার্তিক মাসে কালীপূজা ভাইদ্বিতীয়ার ফোঁটা॥
অগ্রাণ মাসে নবান্ন হয় সরু ধান্য কেটে।
পৌষ মাসে বাঁউরী বাঁধা ঘরে ঘরে পিঠে॥
মাঘ মাসে মাকরী সপ্তমী ছেলের হাতে খড়ি।
ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা ফাগ ছড়াছড়ি॥
চৈত্র মাসে শিব পূজা গাজন হয় ভারি।
বৈশাখ মাসে ধরমপূজা ঢাকের হুড়াহুড়ি॥
জৈষ্ঠী মাসে ষষ্ঠী পূজা ছেলের গলায় দড়ি।
আষাঢ় মাসে রথযাত্রা লোকের ছড়াছড়ি॥
শাওন মাসে শাওডালি পূজা তাও নয় ভারি।
ভাদ্র মাসে নন্দোৎসব কাদায় গড়াগড়ি॥

বারো পংক্তিতে বাংলার তেরো পার্বণের কথা, কত আনন্দের, কত আশা আহ্লাদের। মানুষ কত আনন্দিত হলে তবে এমনিভাবে বৎসরের প্রথম দিন হ'তে পার্বণের সময় গুণতে থাকে। এই আনন্দ উৎসবের আগমন পালন করে সংগীত অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়ে। এমনি আনন্দের মধ্যে বর্ষ আরম্ভ হয়।

তারপর আসে বর্ষা। বাংলার বর্ষার রূপ নদী, খাল, বিল আর মাঠে মাঠে উপছে পড়ে। তন্বংগী সুকেশার মত যেন সে মাতিয়ে তোলে মাঠের চাষীকে, বিলের জেলেকে। ধান্য রোপণের দিন এগিয়ে আসে বাংলার প্রতিটি গ্রামে গ্রামে। প্রথম ধান্য রোপণ উৎসব প্রতিপালিত হয় মাঠের মাঝে মাঝে।

আলপথে কৃষক গান করে ; ধানের চারা হাতে কৃষাণী গান ধরে। বর্ষার রিম্‌ঝিম্ বাজনার তালে এ গানের সুর চমৎকার মানিয়ে যায় ॥

আগুণ বাড়ি খুঁজলাম।
বেগুণ বাড়ি খুঁজলাম ॥
খুঁজলাম ওর বাবাকে মহল।
কোথা গেলো পাত্‌ওয়ালী[১]

নায়কের দুঃখ এখানে পুঞ্জীভূত মেঘের ঝরে পড়ার মতো গানের সুরে গলে পড়ে। কোন মন-চুরি-করা অলংকারিতার জন্য নায়ক তন্নতন্ন ক'রে খুঁজে বেড়ায়। বর্ষার সত্যই কি একটা দুর্বার আকর্ষণ আছে। কালিদাস সত্যই বলেছেন, মেঘালোকে ভবতি সুখিনোঽপ্যন্যথাবৃত্তিচেতঃ কণ্ঠাশ্লেষ প্রণয়িণীজনে কিং পুনর্দূর স্থংস্থে। মেঘলা দিনে প্রণয়িণী কণ্ঠাশ্লিষ্ট থাকলেও বিরহ উপস্থিত হয়। তাইতো নায়ক বলছে—

সরকে[২] ঘরকে দরবার বাড়ালি।
বহুত হয়রাণ করালি ॥

নায়কের প্রাণের তাগিদে সে চুপ থাকতে পারে না। তাই শারীরিক কষ্ট তার কাছে প্রশ্রয় পায় না। কখনও বা অতি শ্রান্তিতে নায়ক মহুয়া নির্য্যাস পান ক'রে ক্লান্তি অপনোদন করে।

মহুয়া মাধুরী রাখে প্রাণ।
কি কহিবরে জান ॥
তরকী[৩] বিরাজে দুনো কান ॥

নায়কের চোখে কানের গহনাপরা নায়িকার মুখখানা এই রিম্‌ঝিম্ বর্ষার দিনে ভেসে ওঠে। এই নায়ক নায়িকা রাধাকৃষ্ণ নয়। যে দেশে যে কোন নায়ক নায়িকা রাধাকৃষ্ণের ছাঁচে ঢালা সেখানেও রাধাকৃষ্ণের প্রেমবিরহ লীলার ক্ষুণ্নপ্রভাবে সামান্য গানে ছোট্ট ছবি ভেসে ওঠে তা' গ্রাম্য নরনারীর প্রেম-বিরহেরই প্রতীক।

এই ধান্য রোপণ উৎসবের গানের বিশেষ তাৎপর্য এই যে, সামান্য কয়েক পংক্তির পর পর বিষয়ান্তরে চলে গেছে গানের কথা।

কবি যে কত অসহিষ্ণু তাই সে প্রাণের সব কথা বলতে চায় সামান্য গানের মধ্যেই। সেইজন্যই একটা বিষয় শেষ করতে না করতেই আর একটা বিষয় এসে ঠেলা মারে।

১, গহনা বিশেষ ; ২, রাস্তায় ; ৩, কানের গহনা বিশেষ

যার ঘরে নাই কোঠা ধান।
তার মনুয়া হল আন্॥
কাঁদিছে বসে কৃষাণীকৃষাণ॥

যার কোঠাবাড়ীতে ধান নেই সেই কৃষাণ বড় অভাগ্য। এই ধান্য রোপণ উৎসবে তাকে কবি ভুলতে পারেনি। ভুলতে পারেনি কৃষাণ-কৃষাণীর কান্নার স্মৃতিকে। গ্রাম্য জীবনে অতি বড় অভিশপ্তের জন্য কার না হৃদয় বিগলিত হয়।

পৌষ উৎসবে আনন্দ বর্ধনের জন্যও অনেক ছড়া আবৃত্তি করা হয় বাংলার পল্লীতে পল্লীতে। গানের ছন্দে বেজে ওঠে দশদিক।

আসে বসন্ত কাল। প্রাচীন রাজাদের আমল হ'তে ভারতবর্ষে বসন্তকাল প্রচলিত কিন্তু পল্লীবাংলার কোকিল-ডাকা বসন্ত-দুপুরে মাঠে, ঘাটে, বাটে যে সংগীতের সুর ধ্বনিত হয় তা' বাংলার নিজস্ব। মধুমাস যেন দিকে দিকে গানের ছন্দে বেজে ওঠে। এই গানের মাঝে নায়িকার দুঃখ সুপ্রকট হয়। বসন্তের দিনে লতা পুষ্প পল্লবের অন্ত নেই। দিকে দিকে প্রকৃতির সমারোহ। প্রকৃতির সাথে মানুষের একটা আত্মিক যোগ রয়েছে। তাই এমন আনন্দের দিনে নায়কের সাথে মিলে নায়িকা নিজেকে প্রস্ফুরিত করতে চায়, তাই না পাওয়াকে পাওয়ার আকাংখায় বসন্তের দিনে আজিও পল্লীবাংলার আকাশ বিরহের বাতাসে ঝড়ের পূর্বাভাস রচনা করে। কিন্তু আজ নাগরিক সভ্যতায় মানুষ ক্রমশঃ প্রকৃতির নিকট হ'তে দিন দিন দূরে সরে যাচ্ছে—তাই গানে গানে নায়িকার হাহাকার বিরহের কথা মানুষের হাসির খোরাক জোগাতেও পারে।

দিকে দিকে জাগলো দেখ বসন্তের বা।
ওলো সই দেখলো কেমন করছে গা॥

বসন্তের বাতাসে নায়িকার মন উৎফুল্ল হচ্ছে। অন্তরের কথা বলতে বান্ধবীকে আহ্বান করছে সে। আবার এমন দিনে প্রবাসী স্বামীর জন্য আর স্থির থাকতে পারে না সে। কি এক অব্যক্ত অস্বস্তিতে তার অন্তর ভরে থাকে।

ঠাকুর বাড়ীর কালো তুলসীপাত ঢলমল করে।
নিজের পুরুষ বিদেশ গেলে পরাণ কেমন করে॥
পরতে নারি ফিরিং[১] কাপড় বাঁধতে নারি কেশ।
ভেবে গুণে চেয়ে দেখো নবীনা বয়েস॥

১, পাতলা

নবীন বয়সা নায়িকার উৎকণ্ঠিত হওয়া অহেতুকী নয়। সত্যই এমন দিনে প্রবাসী স্বামীর জন্য প্রাণ তার ব্যাকুল হয়ে ওঠে। তাই তো নায়িকার দুঃখ কথা গানে গানে মুখে মুখে ফেরে। তার বিরহ শত জনের কণ্ঠে, এই একলা কণ্ঠের ডাক যেন শত মানুষের মুখে ধ্বনিত হয়ে ওঠে।

সমস্ত বৎসরের কোন না কোন দিনকে কেন্দ্র ক'রে এমন টুকরো ছবি বহু গানের মধ্যে স্পষ্টই ভেসে ওঠে। এই সব সংগীত একটানা ধর্মকথার ভিতর যেন মিষ্টিমুখে নোন্‌তা খাবার। এখানে একটি বিরহী নায়ক ও একটি বিরহিনী নায়িকার দুঃখ কথা রাধাকৃষ্ণের বিরহ থেকে কোন অংশেই কম নয়। কিন্তু মজার কথা এই যে, তাদের কেউই রাধাও নয়, কৃষ্ণও নয় আর ভ্রম-ক্রমেও তাদের রাধাকৃষ্ণ বুঝাবে না। তাই বহুদিন হ'তেই এই গানগুলি মানুষকে আনন্দ দিয়ে আসছে বিশেষভাবে আর এইজন্যই এই ছড়া গানের সাহিত্যিক সার্টিফিকেট দিলে হাঁ হাঁ করে মারতে আসবে না কেউ।

অন্ত্যজ-সাহিত্য ও ধর্মজগৎ

অন্ত্যজ-সাহিত্যর নাম শুনে হয়তো বা অনেকে বিস্ময়ে হতবাক্ কিংবা সমালোচনায় শতবাক্ হ'য়ে উঠবেন। আবর্জনা জঞ্জালের মাঝে জন্ম বলে কি চিরদিন এগুলো অনাদৃত, অবহেলিত হয়েই থাকবে? পাঁকে-ফোটা পদ্ম দেবতার পায়ে ঠাঁই পায়; তেমনি এ সাহিত্য সংকীর্ণ গণ্ডীর বাইরে এসে, ব্যষ্টির থেকে উন্নীত হ'য়ে জনগণের প্রাণের দেবতার আনন্দ বিধান করে, এটা কি সুধী সমাজের মনঃপূত নয়? এই সাহিত্য-ধারা বাস্তবিক প্রণিধানযোগ্য। তা'হলে যুগপৎ বংগ-সাহিত্যের সম্পদবৃদ্ধি এবং একটা অবহেলিত জনসমাজের সংগে মানুষের প্রাণের যোগসূত্রতা স্থাপিত হয়। বর্তমান যুগ-পরিস্থিতিতে যা একান্তই বাঞ্ছনীয়।

এই অন্ত্যজ-সাহিত্য বলতে প্রতিলোম বিবাহের সাক্ষী হ'য়ে জন্ম নেয় যে বর্ণসংকর জাতি, তাদের সাহিত্য নয়। তবে আংশিকভাবে তাদের দানও এতে রয়েছে। বংগ-সাহিত্যের কর্ণধার এবং ভবিষ্যত সংগঠনকারী অভিজাত সাহিত্যিকদের বাদ দিলেও রয়েছে নীচ, ঘৃণ্য, হেয় একটা জনসমাজ যাদের প্রত্যেকেই নিরক্ষর—বিচার-বুদ্ধি-বিবেক-শূন্য ব'লে কুখ্যাত—তাদেরও সাহিত্য আছে। যদিও এটি তাদের নিজেদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, অভিজাত সমাজের সংগে ঘনিষ্ঠতা কম ব'লে আর কতকটা অবহেলার জন্য নিরক্ষর বাগ্দি, ডোম, মুচি, হাড়ি, বাউরী, লোহার, কাহার, ধাঙড়, রাণা, চণ্ডাল প্রভৃতি জাতের বেড়া টপকে পরিসর ক্ষেত্রে বেরিয়ে আসতে পারে নাই। তা' ছাড়া তাদের সাহিত্য জগত চিরদিনই আদিম যুগের ঘানির পাকে ঘুরছে। কারণ মুখে মুখেই প্রচারিত হয় এবং সমৃদ্ধি লাভ করে। পল্লীর হাটে, মাঠে, বাটে চণ্ডীদাসের প্রেমগীতি, চৈতন্যলীলার সুললিত বৈষ্ণব পদাবলী, রামপ্রসাদের উদাত্ত মাতৃ-সংগীত, দাশুরায়ের পাঁচালী ও কবিগান প্রভৃতি এই সাহিত্যের অনুপ্রেরণা যুগিয়ে চলে। একদিন এই সাহিত্য ধারার প্রভাবও এই সব সাহিত্যও পরিপূর্ণতা লাভ করে। সেইজন্য মনে হয় ষোড়শ শতাব্দী এর চরম বিকাশের যুগ। এখন আংশিকভাবে সৃষ্টি ও ধ্বংস হ'য়ে চলে।

তবে এই সাহিত্য বহুলাংশে সৃষ্টি হয় ও অস্তিত্ব বজায় রাখে প্রয়োজনের তাগিদে। আনন্দ ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না। এই সব তথাকথিত

ছোট জাত পূজা উৎসবকে আনন্দমুখর করবার জন্য সংগীতকে অপরিহার্য্য হিসেবে ধরে নিয়েছে। তাই তৃষ্ণিত জনগণের আনন্দ-পিপাসা মিটাতে, দুঃখকে ভুলাতে, যুগ-স্রষ্ট সাহিত্যিক যুগ যুগ ধরে মানুষেরই গান গেয়ে চলেছে। তা'ছাড়া প্রতিটি মানুষের পুঞ্জীভূত ব্যথা-বেদনা সংগীতে মূর্ত হ'য়ে ওঠে। এই সংগীতে যেন নিদাঘের শ্রান্তি অপনোদনের জন্য বৃক্ষতলে প্রখর রৌদ্রের দিকে উদাস-দৃষ্টি রাখাল ছেলের বাঁশের বাঁশীর কাতর মূর্চ্ছনা! আধুনিকভাবে উন্নত সুসমৃদ্ধ না হ'লে তা'তেই বা কি আসে যায়? তাদের কৃষ্টি, শিক্ষা, দীক্ষা, সংস্কৃতি, অন্ত্যজ-সাহিত্য সৃষ্টি ব্যাহত হ'তে দেয় নাই। পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনী খাঁটি অন্ত্যজ-সাহিত্য সৃষ্টি করে যেমন মাটীর ঘরের ছাউনী তৈরী করবার কালে সময়োপযোগী ভাব ছন্দের সোপান বেয়ে ভাষার মাঝে নেমে আসে।

ঐকান্তিক নিষ্ঠা, দরদী কবির দৃষ্টিভংগী এবং অনুভূতি এই সাহিত্যের প্রাণ। মানুষের চোখে নীচ, ঘৃণ্য, হেয় হ'লেও তাদের হৃদয়টা কিন্তু মানুষের; গান করে সত্যের। বরং আধুনিক সভ্যতার মধ্যে, আপন সর্বস্বতার যুগে জড়জগতের ভোগ-লালসাদৃপ্ত কর্মপংগু মানুষের আবিলতাই প্রধান, অনুভূতির একান্তই অভাব। প্রাণের কথা বড় একটা কেউ বলতে পারে না। কিন্তু এই সাহিত্য অযথা সম্মানের আশায় সৃষ্ট হয় না। ভাবানুভূতির স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ। আর অধিকাংশই দেবতার নামেই সৃষ্ট করা হয় তাই বিরাট শ্রদ্ধা ও সাধনা ওতঃপ্রোতভাবে মিশিয়ে রয়েছে রচনামাধুর্য্যে ও ব্যঞ্জনায়।

সেইজন্য ইহার ধর্মবিভাগের মধ্যে সবই গীতি-সাহিত্য। এই ধর্মসম্বন্ধীয় গীতি-সাহিত্য আবার বহু 'পালাবন্দী' অবস্থায় থাকে। যেমন এক ধারার ধর্মসংগীত একটা দেব বা দেবীর উদ্দেশ্যে প্রায়শঃ ক্ষেত্রে অজ্ঞাতনামা সাহিত্যিকদের দ্বারা রচিত হয় ও সেই দেব বা দেবী পূজার সময় প্রধানতঃ গীত হয়। এরূপ বিভাগের মধ্যে আলকাটা কাপ. গাজনের ভক্তা নাচা ছড়া, সাত ভাইদের গান, দেবী বিসর্জনের গান, ঝাঁপান বা সাঁকি, ভাদু বা ভদ্রেশ্বরীর গান, ডাক নাম ইত্যাদি। এছাড়াও বহু সংগীত আছে। প্রত্যেক প্রকার সংগীতের নিজস্ব সুর ও বৈশিষ্ট্য বর্তমান। ভগবতী-মংগল কাব্যকেও অন্ত্যজ-ধর্ম-সাহিত্যের পর্য্যায়ে ধরা যায়। কারণ এই দেবী স্বরূপা গোজাতির প্রতি ভক্তি উদ্রেক করবার প্রচেষ্টা এতে রয়েছে আর অখ্যাতনামা রচয়িতাদের

অন্ত্যজ-সমাজের মধ্যে অনুমানিকভাবে না ধরলেও এই সাহিত্যকে রক্ষা করছে অশিক্ষিত, ভিক্ষাজীবি অন্ত্যজ-সম্প্রদায়।

পাপ প্রবণতার পোকা যাদের মধ্যে কিলবিল করছে, তাদের ধর্মজগতের অস্তিত্ব ও সংস্কৃতি জানবার জন্য অনবদমনীয় কৌতূহল স্বভাবতই জাগে।

যে কোন ধর্ম সংগীত রচনার পূর্বে গণেশ, সর্বসিদ্ধির জন্য এদের মধ্যে প্রথমেই গণেশ বন্দনার প্রথা আছে।

গণপতি ওহে গজানন।
গজেন্দ্র পুরুষ তুমি বিঘ্নবিনাশন॥
তুমি ওহে গণপতি মুষিক বাহন গতি
পিতা তোমার পশুপতি দেব পঞ্চানন॥
পিতা তোমার মহাকাল নীলকণ্ঠ করতাল
গলে দোলে হাড়মাল, অতি সুশোভন॥
আমরা অতি মূঢ়মতি না জানি ভজন স্তুতি,
উন্ত্যজ অভিলাষের উক্তি শোন বন্ধুজন॥

অন্ত্যজ-সমাজের মধ্যে নেশা করার নগ্নচিত্র সকলেরই চোখে পড়ে॥ তাই অন্ত্যজ-কবির নেশাকে যথাযথ মর্যাদা দেবার ও নেশাখোরকে শাশ্বত নেশায় পাগল করবার সুন্দর উদ্দীপনাময়ী সংগীত:

নেশা ছাড়া জগতে কিছু নাই, ভেবে দেখলাম তাই।
কারু নেশা হরিনামে, কারু নেশা গান বাজনায়॥

কারু নেশা চাষবাস, কারু নেশা চাকরীর আশ।
কারু নেশা মাছের আশে, পায় না পায় যাওয়া চায়॥
কারো নেশা হয় যুবতী, কারো নেশা দস্যুবৃত্তি।
কারু নেশা ধর্মে মতি, কীর্তি কিসে রাখা যায়।
অধীন বলে কুনেশাতে দিন গেলরে ভাবতে ভাবতে।
হরিনামের নেশা কর হিসাব দিবে চাইলেই ভাই॥

ঈশ্বর উপাসনার অন্তরায় রিপুগণের মধ্যে কাম আর ক্রোধই বেশী মারাত্মক। এদের দ্বারা মানুষের মধ্যে প্রাণবন্ত ভজন সাধনার যে ক্ষতি হয় তা' বুঝাবার জন্য কি সুন্দর উপমা এই অন্ত্যজ-সাহিত্যের মধ্যে—

শরীরের শত্রু কাশ রোগ জীর্ণ করে বপু।
ভজনের শত্রু কাম আর ক্রোধ যেমন রিপু॥

পৃথক পৃথক ধর্মে আবার ঈশ্বরের পৃথক পৃথক নাম। তারই জন্য ধর্ম জগতে হানাহানি, রেষারেষি, অজ্ঞাতনামা অন্ত্যজ-কবির মনে যে বেদনা জাগায় তার সুন্দর নজীর—

পোস্তরা লাগিয়া ভাবরে মন দোনিয়া ছাড়ি হবে যেতে।
নূরের বাতি দিবারাতি জ্বলবে বাতি কন্দরেতে॥
কাঁদিবে ফুপু, কাঁদিবে মালা,
কাঁদিবে তোমার লড়কা বালা,
এলহিল্লা রসুল বলিবে তখন মুখেতে॥
মিছে দেখ দোনিয়া দ্বারী,
মিছে দেখ দ্বরজা বাড়ী,
পড়িয়া রবে তলাইকে গাড়ী পড়িয়া রবে ঘরেতে॥
যিনি হরি তিনিই আল্লা,
নামটি তাঁহার জগতাল্লা,
হরি খোদার উপর খোদা বলে পীরের দোয়াতে॥

এই অন্ত্যজ-সমাজের অদৃষ্টের উপর চরম বিশ্বাস। দূরদৃষ্ট মানুষকে মর্মন্তুদ যাতনা দেয়, তার প্রমাণ স্বরূপ কবিগণ গানের মধ্যে চমৎকারভাবে শাস্ত্রবাক্য তুলে দেখাতে পশ্চাৎপদ হন না। শাস্ত্রের উপর তাদের কত বিশ্বাস তা' দেখা যায়।

হায়রে হায় যার যখন কপাল ভেংগে যায়।
ব্যাঙে এসে মারে লাথি হাতির মাথায়॥
দুগ্ধ হীন হয় গাভী সকল, ধেনু বৎস হয়গো দুর্বল।
তার সুফলেতে ধরে কুফল বলিয়া জানাই॥
পুত্র থাকতে মরে নাতি, বলিয়া জানায় সম্প্রতি।
এমনি আছে রীতিনীতি নয়নে দেখতে পাই॥
যার কপালে লাগে আগুন দালানের ছুটে টালী চূণ।
লোহার কড়িতে ধরে ঘুণ ; দালান ভেংগে পড়ে যায়॥
অধীন পিয়োনাথে বলে; ছিল চিবৎস রাজার ছেলে।
তার পোড়া মচ্ছো যায়গো জলে শাস্ত্রেতে শুনিতে পাই॥

শত সহস্রবার শাস্ত্রপাঠ এবং চর্চা ক'রেও শাস্ত্রের অর্থ হৃদয়ংগম করা যায় না; আপন করা যায় না। কিন্তু অন্ত্যজ-সমাজের নিরক্ষর কবিগণ কতকটা নিজের অনুভূতি দিয়ে, বেদ-উপনিষদকে গানের মধ্যে বেঁধে রাখে—

এই রথেতে আছেন ভগবান—
তিনি বামনরূপে অদিষ্টান।
আছেন ক্ষুদ্র রথে, ক্ষুদ্র রূপে গো
আবার তাঁরে কেউ না দেখতে পান॥
আত্মা হয় ভাই রথের রথী,
বুদ্ধি রথের হয় সারথী;
(জানাই সম্প্রতি)
আবার ইন্দ্রিয় হয় রথের ঘোড়া গো
রথ দিবারাত্রি করে বহন॥
অধীন কালিদাসে ভণে
শুন শুন বন্ধু জনে
একে একে বলে জানাই এই সভাস্থানে—
মন লাগামে লাগাম ধরি গো
কেবল সদাই রথে দিইছে টান॥

এই গানটির সংগে আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেবচ।………এই সব শ্লোকের হুবহু ভাব ধরা পড়ে। গ্রন্থকীট এবং শিক্ষিত লোকদের থেকে এদের তফাৎ কথায়? "Mysterious eye of the soul" কথাটার যথার্থ সার্থকতা পাওয়া যায়।

রাধাকৃষ্ণের অব্যক্ত প্রেমলীলার স্বরূপ প্রকাশ করবার প্রয়াসের ফলেই বৈষ্ণব-সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছে। এই মহাভাব উপলব্ধির জন্য অন্ত্যজ-কবিদের হৃদয়েও কি চাঞ্চল্য তা' রাধাকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় সংগীত থেকে অনুমান করা কঠিন হবে না। ফলকথা এই নিরক্ষরদের মধ্যে কঠিনতম ধর্মতত্ত্ব শিক্ষিত মানুষের থেকে শূন্য না কি তা বিচার করা চলে।

আমি ব্রজের রাই কিশোরী শুনহে বংশীধারী।
আমি হলাম বংশীধারী তুমি হলে রাই কিশোরী॥

আমি হলাম নন্দের দুলাল তুমি হলে গোপনারী।
কিশুরী বাগ্দীর বোল, সবে মিলে হরিবোল॥
তবে আসবে ভবের কাণ্ডারী॥

ব্রহ্মময়ী শ্রীরাধিকা নিজের মধ্যে কৃষ্ণকে আবার কৃষ্ণের মধ্যে নিজেকে অনুভব করে যেন ভাবতন্দগতচিত্তা। উচ্চ মার্গের কবি না হ'লে সামান্য কথায় এ ভাবের কবিতা লেখা সহজ নয়।

বধূ সে আমার এক কলেবর
দুহুঁ সে একই প্রাণ—চণ্ডীদাস

ভক্ত ভগবানকে রাধিকা থেকে ছোট ক'রে আনন্দলাভ করে। তার সর্বোৎকৃষ্ট নজীর গীত গোবিন্দের দেহি পদপল্লবমুদারম্। এখানে এই গানটির নিজস্ব ভাব শ্রীকৃষ্ণের পরাজয় ঘোষণা করছে।

রাই হ'তে কি আপনি বড় মনে তাই ভেবেছ হরি।
আগে লিখে শ্রীরাধার নাম পরে লিখে নাম তোমারি॥
রাই হ'তে কি তোমায় মানে, বুঝা গেইছে দুর্জ্জয় মানে।
পিতাম্বরী গলে লয়ে ছিলে রাধার চরণ ধরি॥
আবার দেখ করি মনে, পিরীতি নিকুঞ্জ বনে,
ধরে রাধার শ্রীচরণে সাধিলেন গিরিধারী॥
নরের যখন বিপদ পড়ে তোমার নাম সকলে করে।
তোমার বিপদ পড়লে পরে রাধা নামে বাজাও বাঁশরী॥

আবার :—

*　　　*　　　*　　　*

ওহে কৃষ্ণ কংসারি　　　হয়েছ তুমি সংসারী,
কর উচিত ক্রিয়া বিধিমত।
দৈব কর্ম্ম নাহিক ঘরে　　　দোষে হে লোকে তোমারে,
লোকে বলে দৈবকী নন্দন ক্রিয়া হত॥
হরিহে তোমার অবিচারে লোকের মনে দুঃখ।
যার ডোবাতে জল থাকে সরোবর শুষ্ক।
রামশাল চালের অন্ন ঘটে শালপাত্র।
সাকারা কন্যার ভাগ্যে নাকারা পাত্র॥
বিধিমতে হরি আমি করি তব নিন্দা।

ভানারীর সাত বেটা রাজার রাণী বন্ধ্যা ॥
আপনার অবিচারে তুমি হে শ্রীকান্তে।
সার করলে চিরকাল মেয়েরই চিন্তে ॥

কালার বিরহে রাধিকা শ্রীকৃষ্ণের দোষ দিচ্ছে না, অদৃষ্টের ক্রুর কটাক্ষ বলে মেনে নিচ্ছে। তার কারণ দয়িতের দোষ বললে অনুতাপ আসতে পারে। রাগে, দুঃখে, ক্ষোভে মরণ কামনা করতে পারে কিন্তু তা' হ'লে তো আর কৃষ্ণদর্শন হয় না। তাই বিরাট প্রতীক্ষা আর বিরহ সহ্য করবার কারণ থাকে না। বৈষ্ণব সাহিত্যের অনেক পদে কিন্তু মৃত্যু কামনা করা দেখতে পাওয়া যায়।

"এ দুঃখ হেরি কামনা করি বিদরে যদি বসুমতী,
তবহু হাম পৈঠী তছু মাঝে ॥"
সখি নয়নেরই জল আমার কে মুছাবে বল।
না দেখিলে থাকতে নারি সদাই মন চঞ্চল ॥
নয়নেতে বারিধারা ব'য়ে যায় কেবল।
এই কি বিধি লিখেছিলো অদৃষ্টেরই ফল ॥

ভগবৎ প্রেমে মাতোয়ারা হওয়া যে প্রধান গর্বের বিষয় তা' প্রাণে-প্রাণে আঘাত দিয়ে কি সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিবে।

রাজা গরব করে ধনেপুতে, চাকর গরব করে ভাতে।
'খল গরব করে চড়চাপড়ে, কলা গরব করে পাতে ॥
কলা বলে ভাই আমি কিসের গরব করি।
আমি এক বিয়নেই (প্রসবেই) মরি ॥
গরব করুক গংগা যমুনা যার তিনদিক বয় ধারা।
গংগা যমুনা বলে গরব কিসের করি তিনদিক উজানী ॥
একদিকে বইলো না, একদিকে নিম্নগামী ॥
গরব করুকগো পরেশ পাথর যাথে—
পরেশ পাথর বলে ভাই আমি কিসের গরব করি।
কুঁচের সাথে ওজন হয়ে বিকেয় রতি রতি।
গরব করুকগো পঞ্চপাণ্ডব যাদের গোবিন্দ সারথী ॥
পঞ্চপাণ্ডব বলে ভাই আমরা কিসের গরব করি।
আমাদের শোক ভাবটা শেল গরব করুকগো রাইধনি ॥

(যার কেষ্ট বেটা কিনা)

রাইধনি বলে আমি কিসের গরব করি।
আমি রাই মধুর ভাবের পাত্র।
গরব করুকগো মহাপ্রভু যার,
নদীয়া, আর জগতই উন্মত্ত ॥
মহাপ্রভু বলে আমি কিসের গরব করি।
আমি রাই প্রেমে মাতোয়ারা।
গরব করুকগো কিষ্ট-প্রেমিক ভক্তবিন্দো যাহারা ॥

ভালবাসার নদীতে বান ডেকেছে। মাঝ দরিয়ায় রাধিকা ভব-কর্ণধারা সেই শ্রীকৃষ্ণকেই ডাকছে।

উজান টানে আজ রাধার তরী ভেসে যায়।
শন্ শন্ শন্ হাওয়া ছোটে তরী নাহি লাগে ঘাটে।
তরীতে কেউ না উঠে পাছে ডুবে যায় ॥
পুরুষ ছাড়া যেমন নারী, ইঞ্জিন ছাড়া কলের গাড়ী
বন্ধু বিনে প্রেমতরী বল কে খেওয়ায় ॥

কৃষ্ণকে কাছে পেয়ে আবার সেই রাধিকা আসতে বারণ করতে চায়। অবিশ্বাস করে। এ কি প্রেমের পরাকাষ্ঠা নয় ?

আর তো আমি ভুলবো না শ্যাম ভুলবো না শ্যাম
শুন বাঁকা বংশীধারী।
মনে করি হেরব না পোড়া আঁখি মানে না।
প্রাণেতে পাই যন্ত্রণা আমরা যত গোপনারী ॥
চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে ছিলে লোক জানাইতে কেন এলে
মনের কথা বল খুলে বল বল গিরিধারী ॥
যেখানে ছিলে সারানিশি
সেখানে যাও কালশশী
এখন কর মিছে হাসাহাসি ক'র না ভূয়ো জারী।

আবার সেই রাধিকা তার প্রেমাস্পদকে বলছে :—

শুন শুন আমার ও বংশীধারী।
তোমার লাগি ব্রজে নাম হ'ল কলংকিণী ॥
আমার পিছে পিছে ফিরে বেড়ায় কুটিলা ননদিণী ॥

আমি ঐ জ্বালাতে মরি।
কৃষ্ণ আশ্বাস দেয়, বলে—
ভেব না ভেব না আমার রাই ও কিশোরী।
তোমার কলংক ঘুচাবার লাগি আমি এই ব্রজপুরে
নন্দের বোঝা মাথায় নয়ে ফিরি এই বন মাঝারে।
আমি বনে বনে বনে ফিরি॥

* * * *

যমুনা নীপকুঞ্জে পাতার মুকুট পরা রাখাল রাজা কর্তব্যের আহ্বানে প্রেমময়ী রাধিকাকে ছেড়ে মথুরায় যেতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু ব্রজের দূতীর মুখ থেকে গোকুলের অবস্থা শুনে কার না প্রাণে ব্যথা লাগে ?

ব্রজের কুশল শুন সম্প্রতি তুমি হে নব ভূপতি।
শ্যাম তোমা বিনা বৃন্দাবনে শয্যাগতা শ্রীমতি॥
তোমার মা যশোদা, পিতা নন্দ, কেঁদে কেঁদে হ'ল অন্ধ।
কান্দে ব্রজের উপানন্দ আর কাঁন্দে যশোমতি॥
যমুনা পার হ'য়ে এলাম রাই হারা রব শুনতে পেলাম।
রাই হা রাই, রাই হারা বলে কাঁন্দে যত যুবতী॥
কোকিল কান্দে তমাল ডালে, ভ্রমর কান্দে শতদলে।
শ্রীগোবিন্দ দাসে বলে সুখের হাটে ডাকাতি॥

ব্রজদূতী নতুন রাজাকে র্ভৎসনা করতেও ছাড়ে না :—

মথুরাতে তুমি এসেছ হে নতুন রাজা হয়েছ।
বাঁকাই বাঁকাই মিলেছে হে বামে কুব্জা পেয়েছ॥
ভুলে গেছ গরু চড়া, পরেছ হে জামাজোড়া
ত্যজ্য ক'রে মোহন চূড়া মাথায় পাগড়ী বেন্ধেছ॥

তবুও তো ব্রজের রাখাল এল না। এদিকে শতাব্দীকাল গত হ'ল। প্রভাস-যজ্ঞ-দ্বারে গোপকুল ললনার দল দ্বারীকে কাতর অনুনয়, কৃষ্ণ প্রেমের গভীরতা প্রমাণ করে।

এলাম রথে প্রভাসেতে দেখিতে হরি।
আমরা ব্রজের কাঙালী নাম আমাদের রাধা প্যারী॥
শতবর্ষ গতান্তরে এসেছি প্রভাস তীরে।
তাইতে বলি ওহে দ্বারী দ্বার ছেড়ে দে, বিনয় করি॥

কাল বলে এসেছে কালা মজাইয়া কুলবালা।
আমরা যত গোপবালা নন্দলালার আশা করি ॥
দুঃখের কথা বলব কত দুঃখ হইয়াছে সমুদ্রের মত।
দুঃখে দুঃখে অনুগত আর কত বলব দ্বারী ॥
'জীবন' বিনে মীনে যেমন বলরে দ্বারী রয় কতক্ষণ
জীবনতারা যায় যতক্ষণ জীবন ধনে আশা করি ॥

ভক্তের চিরন্তন আশা কি অন্ত্যজ-সাহিত্যে বিকাশ লাভ করতে পারে না ?

সংসার সমুদ্র কি তরবি।
বেহুসিয়ারী নামিতে গেলে জলে ডুবে মরবি ॥
যে জন গুরু পদ ভাবে তার কি পারের অভাব রবে।
কর মননিষ্ঠা সেই ব্রজভাবে রাধারমণ দেখতে পাবি ॥
তোর একে জীর্ণ তরী তাতে মনমাঝি আনাড়ি।
দেখতে পেলে ঘুরনচাকি (আবর্ত) ঘুরে ঘুরে মরবি ॥
অনুরাগ পেরেক রাখ মেরে নিষ্ঠা সাংগা ধরে।
ভক্তি মাগ গো মধুর করে প্রেম তরংগে নামবি ॥
যখন নদীর জোয়ার আসে, ডাংগা ডহর যায় ভেসে।
সেই নদী পারের আশে হৃশিকেশে ধরবি ॥
আগে কর নিষ্ঠা রতি হেরিবি যুগল মূরতি।
রাধাকৃষ্ণের অংগের জ্যোতি হৃদ-মাঝারে হেরবি ॥
অধীন দাস গোপাল ভনে কবে যাবি বিন্দাবনে
দীন হীন সেই কাঙাল সেজে ব্রজের ধূলা মাখবি ॥

এই অতি অল্প সংখ্যক গানগুলি দ্বারা তাদের ধর্মজগত ও ধর্মপ্রবণতা সম্বন্ধে কিঞ্চিত ধারণা করা যায়। ইদানিং অন্ত্যজ-সমাজকে জানবার দারুণ হিড়িক পড়েছে। সাহিত্য যদি সমাজ মনের প্রতিফলন হয়, তবে অন্ত্যজ শোক-দুঃখ-আশা-আকাংখা ব্যথা-বেদনাভরা হৃদয়ের কথা জানতে হ'লে, অন্ত্যজ-সাহিত্য আলোচনার একান্ত প্রয়োজন। তা'হলে দেশের অশিক্ষিত নিরক্ষর মানুষের খাঁটি মর্য্যাদা দান করা হয়। বহুদিন সঞ্চিত ঘৃণা অবহেলার হাত হ'তে তারা অব্যাহতি পায়।

সাত ভাইদের গান

দেবতার যেমন ভালো করবার শক্তি অসীম; অপদেবতার তেমনি মন্দ করবার শক্তি পর্য্যাপ্ত। তাই মানুষ দেবতা পূজা প্রচলন করবার সাথে সাথে অপদেবতার কথাও ভুলে যায়নি। দূর পল্লীর শ্যাওড়াতলায়, থমথমে নিশুতি রাতে এলোকেশে উলংগ ছেলের মা সন্তানের রোগ উপশমের জন্য গোঁসাই বাবার কাছে ধরনা দেয়। কেউ বা ব্রহ্মদৈত্য তলার মাটি এনে রুগ্ন ছেলের মুখে দেয় তুলসী মৃত্তিকার মতই ভক্তিভরে; মানত্ করে ডাইনে বামে কালো পাঁঠা আর জোড়া ঢাক। ভূত, দানব, দৈত্যের প্রভাব আজও এড়িয়ে যেতে পারেনি মানুষ। অব্যাহত প্রভাবে এরা সকলের হৃদয়ে স্থান ক'রে নিয়েছে। বৎসরে অনেকবার, বিশেষ ক'রে অন্ত্যজ-জগতের লোকেরা ভূতের পূজা ক'রে থাকে। ধর্মের উত্থান-পতনের যেমন ইতিহাস আছে, তেমনি বিশেষ কোন পূজা প্রচারের উৎস আলোচনা সাপেক্ষ।

পাল যুগের বিশেষ কোন নিদর্শন বাংলা সাহিত্যে পাওয়া যায় না। ছড়া বা গীতিতে যা' আছে তা'ও অকিঞ্চিতকর এবং অজিও তা' অনাবিষ্কৃত। তারপর বাংলায় বৌদ্ধ রাষ্ট্রীক প্রাধান্য ব্রাহ্মণ্যবাদীদের রোষদৃষ্টিতে ধ্বংস হয়ে যায়। রাঢ় দেশের শূর ও পূর্ববংগের বর্মণ এবং সেনেরা বাংলার ভাগ্যাকাশে কালো মেঘের সঞ্চার ক'রে বলেই প্লাবনের মত কাতারে কাতারে সৈন্যের বাংলা আক্রমণ ও বাংলা বিজয় সম্ভব ক'রে দেয় মুসলমান তুর্কীদের। এই যুগে সাহিত্যে ধর্ম-মংগলের অভ্যুদয়—ধর্মঠাকুরের ভক্ত লাউসেনের যুদ্ধ বিবরণী ও অন্ত্যজ-সমাজের প্রাধান্যের কথা এই কাব্যে বিশদভাবে জানতে পারা যায়। আজিকার অধঃপতিত 'ছোট'জাত পূর্বে শাসক শ্রেণীর ও উচ্চ বর্ণের ছিল। এই সামাজিক পরিবর্তন অন্ত্যজ-সমাজকে পথভ্রান্ত ক'রে দেয়। ধর্মজগতেও বহু পরিবর্তন ঘটে। উচ্চশ্রেণীর শৈব ধর্মের সাথে গণশ্রেণীর ধর্মের সংঘর্ষ এই সময় সুপরিস্ফুট হয়ে ওঠে। শৈবধর্মাবলম্বী চাঁদ সদাগর তাই অনমোনীয় অনটল প্রতিজ্ঞায় শাক্ত দেবীর পূজা থেকে বিরত থাকে।

এই সব নানা কারণে হীনযানী, সহজযানী নীচ জনসাধারণ দেবতার চেয়ে অপদেবতার প্রতি আকৃষ্ট বেশী মনে হয়। ভাগ্য পরিবর্তনও কতকটা দুর্বল ক'রে দেয়; তাই দিন দুপুরে ভূতের উৎপাত না হওয়াই আশ্চর্য্যের কথা। আতিচারিক

মন্ত্র-সিদ্ধের আজগুবি গল্প রাষ্ট্র হয় বেশী আর সহজেই অশিক্ষিত লোকের বিশ্বাস হয়ে যায়। তারপর শব-সাধনা ও তাল-বেতাল সিদ্ধি, শব মৈথুন প্রভৃতির নিঃসন্দেহ ফললাভ ও প্রেতলোকে বিশ্বাস ভূতদের অর্ঘ্য পাওয়ার পথ প্রশস্ত করে। বাঘের দেবতা দক্ষিণ রায়, সাপের দেবতা মনসা ও নানা রকম গাছ প্রভৃতি পূজার সাথে প্রত্যক্ষভাবে ভূত পূজা অনুষ্ঠিত হ'তে থাকে। বিবর্তিত সমাজ-চক্রের এ ধারা আজও অন্তঃশীলার মত বয়ে চলেছে।

অনেক প্রকার ভূত পূজার মধ্যে সাতভাই পূজা অন্যতম—রামসীতা বিগ্রহের অন্তরালে যেমন রামায়ণ, শ্রীকৃষ্ণের বাঁকা মূর্তি এবং অলৌকিকত্ব যেমন ব্যাসদেবের কল্পনায় প্রথম রূপান্বিত হয়, তারপব মুমুক্ষু জনসাধারণের দ্বারা লীলার প্রকাশ হয় বাস্তবে তেমনি সাত ভাইদের গান এ পূজা প্রচলন করে। সংক্ষিপ্ত হলেও এর সভ্যতা মানুষের প্রাণকে আকর্ষণ করেছিল। সাত ভাইদের স্মৃতিরক্ষাকল্পে, ও নিজেদের মংগল কামনায় ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রের উপরি-উক্ত নানাপ্রকার দ্বন্দ্ব, অন্ধ বিশ্বাস, নীচতা গ্লানির জন্য নীচশ্রেণীর মন যখন ভূত পূজা করবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছিল, হয়তো তখন বা তারও পরে বাণসিং, বাদলসিং, তিলোরায় সিং প্রমুখ সাতভাই সুসম্বদ্ধভাবে রাজ্য পরিচালনা করতেন। কোথায় তাঁদের রাজ্য ছিল জানা না গেলেও এ যৌথ রাজ্য শাসন যে রাম রাজত্বের সূচনা করেছিল তা' ধারণা করা যায় এক শ্রেণীর মানুষের আকুলতায়। কিন্তু বিধি বাম হলেন। মামুদ মিঞা নামে জনৈক দস্যু তাঁর ষোলজন স্যাকরেদ নিয়ে তাঁদের রাজ্য আক্রমণ করল। সাত ভাইদের গানে তখনকার যুদ্ধের রুদ্ররূপ আন্দাজ করা যায়।

ঝাঁই বাজে ঝংকর বাজে বাজে করতাল।
আশি কোশের বাজনা বাজে মরে পালে পাল॥

দু'পক্ষের তুমুল যুদ্ধ চলেছে। মামুদ মিঞা প্রথম প্রথম পালিয়ে আত্মরক্ষা করবার প্রয়াস পাচ্ছে।

যখন মিঞা হরহরায়।
তখন সিংরা করকরায়॥
মারো মারো বাদল সিং তোমার ঘাটে মিঞা পালায়॥

কিন্তু বিধির কুটিল ভ্রূক্ষেপে ইতিহাসের ধারা যায় পাল্টে। সাতভাইরা নিহত হন। তারপর ভেলুয়া সোয়ারী নামে এক শক্তিমান সিংদের সম্পর্কীয় দাদা

মামুদ মিঞাকে পরাভূত করে লুটে নেওয়া বহু নারী, জিনিষ পত্র এবং রাজ্য উদ্ধার করেন।

নিলেরে মহিলা পাটের সারি সারি।
নিলে রাজা ভেলুয়া সোয়ারী ॥
উত্তর দক্ষিণ নিলে ঘোড়া ছুটোয়া।
খোল খুট করলা ময়দান ॥

*　　*　　*

পর্বতের ধারে ধারে পাকিল পিয়াল।
মামুদ মিঞার শানকিটি ভাংগিল শিয়াল ॥

যুদ্ধের অবশ্যম্ভাবী কুফলে দেশে দুর্ভিক্ষ হ'ল। সাত ভাইদের সাত স্ত্রীর মধ্যে দু'জনের নাম এবং দুরবস্থার কথা জানতে পারা যায়! খাবার অভাবে তাঁরা বনে বনে ঘুরে বেড়ান ॥

সামরুলা, জামরুলা গাছা বিরিক্ষি তলায়
আর সব কুথাকে গেল হায়রে ॥
আয় শ্যামলা বন যায়।
ওল মাকড় তুলে খায় ॥
নিওড়া দখিণ দহের পানি খায়রে ॥

শেষকালে রাণী দু'জন ভেলুয়া ভাসুরের বাড়ী যাবার জন্য বলছেন:

ছোট ছোট ছেলেরা লোটা লোটা কান।
চল যাবে ছেলেরা ভেলুয়া বাথান ॥
ও ভেলুয়া ভাসুর তুর বাথান ও যে দুর ॥

এর পর আর রাণীদের কোন কথা পাওয়া যায় না। মনে হয় এই গানেই এঁদের জীবন নাট্যের যবনিকা, নয় আজিও অনাবিষ্কৃত।

দেবতার মতই সাত ভাই মানুষের পরম উপকারী ছিলেন। তাঁরা অপমৃত্যুতে ম'রে অপদেবতারূপে বনে বাস করতে লাগলেন। তাঁদের এ অবস্থার জন্য অন্ত্যজ-কবি সিতাল, জগু প্রভৃতি অপর পক্ষীয় লোকদিগকে ধিক্কার দিচ্ছে। অনেক পংক্তির অর্থবোধ হয় না।

ছুট ছুট কোঁড়ী দুহু হাঁহুলী।
বা বনে সব বাণ সিংরা ॥
সিতাল, জগু মিঞারে তোর কঠিন হিয়া।

সাত ভাইরা বেগুণ জালির বনে এবং জিয়ল বনে খেলা ক'রে বেড়ান। পুণ্যবান লোকেরা নাকি কালে ভদ্রে তাঁদের দেখা পায়।

সাত ভাইরা বাণ সিং সতেরো শয়তান হরে।
বেগুণ জালির বনে সাত ভাই খেলে জিয়ল সাত ॥
ছুট মুট জিয়ল কাঠি ভূমে লুটে যায়।
তাহারই তলে সাত ভাই ঠাকুর খেলে
সাত ভাই খেলে জিয়ল সাত ॥

এখানে আরও নানান ভূত এসে জুটেছে। ঠেংগুয়া বেংগুয়া আরও কত কি। তাদের নিশান মারামারি চলে। হাসি কান্নার হর্‌রা ছোটে। ভূত কাঁদে ভূতের দুঃখে। অন্ত্যজ-কবির কল্পনা শক্তির প্রখরতা বিচার করবার পক্ষে ভূতদের এ সব ব্যবহার যথেষ্ট।

ওরে ঠেংগুয়ারে রন্তা চলিত তরি গাগরি।
ঠেংগুয়ার ভরে'রে চলিল মোশান।
বেংগুয়া ভূতেরে মারিল নিশান ॥

এখানে দাঁতিনী পেত্নী দাঁত কড়মড় করে যখন তিলেরায়ের সাথে মন কষাকষি সুরু ক'রে দেয় দানা বাণ সিংয়ের তুফানের পরিমাণ আড় চোখে দেখে। একটা মানুষের সমস্ত রক্ত বেংগুয়া ভাগ না দিয়ে খেয়ে নেয়।

কাঁহাকার দাঁতিনী দন্ত করমর করে।
দানা বাণ সিংয়ের তুফানে আড় চোখ ঠারে ॥

সাত ভাইরা ইহলোকে যেমন অর্থ, শক্তি, সামর্থ্য দিয়ে মানুষের উপকার করতেন; মৃত্যুর পর প্রেতলোক হ'তেও নানা রকম ঔষধ দিয়ে এখনও সাহায্য করে চলেছেন। তা' ছাড়া দানব, দৈত্য, ঠেংগুয়া, বেংগুয়া সাত ভাইদের অতিরিক্ত ভয় করে। তারা নাকি মানুষকে জব্দ করে কালো পাঁঠা, তুফান গাঁজা বাগিয়ে খেতে চায়। আঁধার রাতে একলা গেলে গলা চেপে ধরে। বোঁ বোঁ করে গোঙান করায়। নিখুঁত পোয়াতীর পায়ে পায়ে ঘর ঢুকে তার ছেলে হয়ে জন্ম নেয়; ইহ জগতের মধ্যে গায়ের জ্বালাতে দিন রাত কাঁদতে থাকে শেষে স্ত্রীলোকের কষ্টের শেষ করে মারা যায়। আত্মীয় স্বজনের মত গলার স্বর করে দুপুর রাতে ঘর থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে ভুল পথে ছেড়ে দেয়। মাঝে মাঝে ঘরে ঢুকে ভালো খাবার খেয়ে ফেলে।

কাঠ কুড়াতে গেলে নাগর দোলার মত সমস্ত বন ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ায়। জাল হ'তে মাছ ছাড়িয়ে দেয়। রাতের বেলায় চুরি করা মাছ আনতে আনতে হাত হ'তে উধাও হয়ে যায়। কিন্তু সাত ভাইদের পূজা দিয়ে সন্তুষ্ট রাখলে ওঁরা এদের জব্দ করে রাখেন।

তাই গ্রাম্য জনসাধারণ রাধা অষ্টমীর দিন সন্ধ্যা হ'তে সারা রাত আড়ম্বরে এঁদের পূজা করে। আলোনা মুড়ি, কলাই, ভাজার ভোগ এবং চিমটে উপহার দেয়। ধুপ ধুনা ও ঢাকের বাজনা শুনে বহু লোকের ভর হয়। কাঁপতে কাঁপতে তাঁরা পরিচয় দেন: আমি বাণ সিং, আমি বাদল সিং, আমি ঠেংগুয়া ইত্যাদি। এই সময় এঁরা অনেক রোগী দেখেন। ধুপবান কাউকে বা চিমটের ঘা মেরে তেড়ে দেন। পরে রোগের কারণ ও রোগ মুক্তির হদিস দেন। তারপর দিন অনেক বেলায় পাঁঠার রক্ত খেয়ে সব ভুতেরা চলে যায়। ভরের সময় সব ভুতেরা নাচতে থাকে আর এ গান গাওয়া হয়। সাত ভাইদের গানের সুর বৈশিষ্ট্যময়। অন্ত্যজ-সমাজের মধ্যে প্রচলিত গানের প্রথম লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে সুর—এ কথা পূর্বেও বলা হয়েছে।

অন্ত্যজ-গীতি-সাহিত্যে সাত ভাইদের গান খুব বেশী পাওয়া যায় না। কোন স্মরণাতীত অতীতে ওদের রাজাদের প্রতি দরদের জন্য এ গানের সৃষ্টি হয়। আজ সে সব মানুষ নেই কিন্তু সাত ভাইদের উপাখ্যান লোক মুখে আজিও বেঁচে আছে। অন্ত্যজ-সমাজের লোকের ভালবাসা সত্যই অমর করে রেখেছে তাঁদের।

অন্ত্যজ-সাহিত্যে রামায়ণের প্রভাব

সে কোন কাল হ'তে ধ্যান-মৌন হিমালয়ের কন্দরে কন্দরে প্রতিধ্বনি জাগিয়ে ভারতের বুকে নেমে আসছে গংগা এবং ব্রহ্মপুত্র; আর তখন হতেই অবিরত জল-সিঞ্চনে ভারত ভূমিকে উর্বর ক'রে জনগণের খাদ্য উৎপাদনোপযোগী ক'রে রেখেছে। তেমনি অতীতের সে কোন্ বিস্মৃত অধ্যায় হ'তে সুরু ক'রে রামায়ণ এবং মহাভারত ভারতবর্ষের মানসক্ষেত্রে উৎকর্ষ বিধান ক'রে আসছে—অবিরল প্রবাহিনী স্রোতস্বতীর মতই, তাতে কোন ছেদ নেই।

এখন আমরা শুধু রামায়ণের কথাই ধরি। কবি স্রষ্টা, তাই ধ্বংসের মাঝে—বল্মীক স্তূপ হ'তে—আদি কবি রামায়ণকারের জন্ম। আর রাম জন্মাবার আগেই রামায়ণ রচিত হয়েছে, এই প্রবাদ বচন থেকে আমরা দেখতে পাই আদি কবির কৃতিত্ব। এখানেই কবির চরম সার্থকতা। কারণ বিজন তপোবনে বল্কলধারী অর্দ্ধনগ্ন সন্ন্যাসীর লেখনী নিঃসৃত মহাকাব্য বাস্তবে রূপ পেয়েছিল। বাল্মিকীকে এত মর্য্যাদা দেওয়ার এবং তাঁর জীবনকে অলৌকিক এবং অসাধারণ ক'রে তোলার মূলে রয়েছে জনগণের উপর রামায়ণের প্রভাব।

সত্যই রামায়ণের অক্ষুণ্ণ প্রভাব এড়িয়ে যাবার উপায় নেই। জন্মের পর হতেই রাম নামের সংগে সম্বন্ধ। ঘৃণা প্রকাশ, দুঃখ প্রকাশ এবং আনন্দ প্রকাশ করবার সময় অলক্ষ্যে মুখ দিয়ে রাম নাম উচ্চারিত হয়। অশীতিপর বৃদ্ধ পরপারে পাড়ি দেবার সময় পূর্বে সব কিছু ত্যাগ করে, ত্যাগ করে না শুধু রাম নাম। আজও সরযূ নদীর দিকে তাকালে মনে হয়, এই নদীতে সত্যব্রতধারী, বীতস্পৃহ রামচন্দ্র জীবন বিসর্জন করেছেন। দুঃখিনী স্ত্রীলোকদের দুঃখে সহানুভূতিসম্পন্ন প্রাচীনেরা আবৃত্তি করেন—জনম দুঃখিনী সীতা, নাইকো সীতার মাতা পিতা। সাহিত্যেও দেখতে পাই রামায়ণের প্রভাবে কালিদাসের রঘুবংশম, ভবভূতির উত্তর রামচরিত, তুলসীদাসের রামায়ণ, আর বাঙলায় মধুসূদনের মেঘনাদ বধ কাব্য প্রভৃতি। রামায়ণের অস্থিমজ্জাগত প্রভাবের জন্যই ভারতের চিত্রকূট পর্বত হ'তে রামেশ্বর পর্য্যন্ত যে দিকে তাকাই না কেন, দেখব রামলীলা প্রকট। সেই অযোধ্যা, সেতুবন্ধ, চিত্রকূট পর্বতের কুটীর, লংকা দ্বীপ আর সেই বনানীর পথে অগ্রে রাম, মধ্যে সীতা, পশ্চাতে লক্ষণ।

জগত জুড়ে রামায়ণের প্রভাব আমরা অস্বীকার করতে পারি না। তথাকথিত অন্ত্যজ-সমাজের মধ্যে রামায়ণের কোন প্রভাব আছে কি না তা' জানতে হ'লে, অন্ত্যজ-সাহিত্য আলোচনা করলেই দেখা যায়, তাদের মধ্যেও রামায়ণের যথেষ্ট প্রভাব। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'লোক-সাহিত্য' নামক পুস্তকে লিখেছেন, "বাঙলায় গ্রাম্য ছড়ায় হরগৌরী এবং রাধাকৃষ্ণের কথা ছাড়া সীতারাম ও রামরাবণের কথাও পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা তুলনায় স্বল্প। এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে, পশ্চিমে, যেখানে রামায়ণ কথাই সাধারণের মধ্যে বহুল পরিমাণে প্রচারিত সেখানে বাংলা অপেক্ষা পৌরুষের চর্চা অধিক।" পশ্চিমবাসীর পক্ষে পৌরুষেরা চর্চা অধিক হ'তে পারে—কিন্তু অন্ত্যজ-সাহিত্য সংগ্রহ কর'লে দেখা যায় এদের মধ্যেও রামায়ণ কথা বহুল পরিমাণে প্রচারিত। কিন্তু তখন লোক-সাহিত্যের উপর সাহিত্যিকদের দৃষ্টি ছিল। তথাকথিত জাতির নিজস্ব সাহিত্য তখন সাধারণের অগোচর, দেশের কেউ খোঁজ রাখতো না।

আমরা এ সাহিত্য জগতকে কিছুতেই অস্বীকার করতে পারি না। শুধু যে সামান্য কয়েকটা প্রচলিত গানের জন্য তাদের সাহিত্য জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করছি তা' নয়; অনেক ক্ষেত্রে এই সাহিত্য জীবিকার্জনের পথ হয়ে দাঁড়ায়। তা' ছাড়া প্রত্যেক ধারার গানের নিজস্ব বিভাগ আছে। আমরা পূর্বে কতকগুলি বিভাগের উল্লেখ করেছি।

রবীন্দ্রনাথ একস্থানে লিখেছেন যে, আধুনিককালে লোক-সাহিত্যের সন্ধান পাওয়া কঠিন। কারণ পল্লীর মধ্যেও পুস্তকের শিক্ষা ও আকর্ষণ সুরু হয়েছে, তাই গ্রাম্য ছড়ায় পল্লীবাসীর মন লাগে না। সামান্য কয়েকজন প্রাচীনার মধ্যে যদিও বা কিছু কিছু ছড়া পাওয়া যায় তাও ক্রমশঃ ধ্বংস হয়ে চলেছে। কিন্তু আজ অন্ত্যজ-সাহিত্যের পূর্ণ রূপই আমরা দেখতে পাই। জাগতিক বিপর্যয় ও শিক্ষার প্রসার এদের সাহিত্যে পরিবর্তন এনেছে কিন্তু ধ্বংস করতে পারেনি। অন্ত্যজ-সাহিত্যে রামায়ণের প্রভাবযুক্ত বহু সংগীতের সন্ধান পাওয়া যায় যদিও, তবুও, তা' সংগ্রহ করা ব্যয় সাপেক্ষ এবং কষ্টসাধ্য। রবীন্দ্রনাথ যদি অন্ত্যজ-সাহিত্যের দিকে দৃষ্টি দিতেন তা' হলে দেখতেন এর মধ্যে লোক-সাহিত্যের মত ধ্বংস প্রায় সীতারাম ও রামরাবণের কথা নয়, সমগ্র রামায়ণটাই সংগীতে বাঁধা। কেবল সীতার পাতাল প্রবেশ সম্বন্ধে কোন সংগীত আমি শত চেষ্টা করেও পাইনি। পটুয়াদের গানে অবিশ্যি সীতার অগ্নি-পরীক্ষা পর্য্যন্ত পাওয়া যায়।

সীতার পাতাল প্রবেশ সম্বন্ধীয় সংগীত না পাওয়ার কারণ এরা সতীত্বের মহা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়েও রাম কর্তৃক সীতার অবমাননা বিশ্বাস করতে চায় না কিংবা এদের বুকে শেল বাজে। জনম দুঃখিনী সীতার চরম দুঃখের পরম শান্তি মাটি মায়ের কোলে—এটা বড় কথা নয়; এরা দেখতে চায় রামের বহু-পাশ বন্ধনে সীতাকে। এরূপ অভিলাষ করা ভুল নয়। কারণ সীতার জীবন রামের সংগে অংগাংগীভাবে জড়িত। রাম কর্তৃক সীতার আনন্দ বর্ধনই সকলের কাম্য। কিন্তু আমরা দেখি দুঃখিনী সীতার মাকে ডাকবার সময় দুঃখের অভিব্যক্তি। লাঞ্ছিতা সীতার প্রজার কাছে বার বার পরীক্ষা দেওয়া বরদাস্ত করতে পারেনি পল্লীবাসীরা। তাছাড়া তাদের সমাজে একজন যুবতী চার পাঁচ জন স্বামীর ঘর করে কিন্তু সীতা লাঞ্ছনা সহ্য করেও রামকে ভোলেনি। ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বর, দাসদাসীর প্রলোভন, রাণী হওয়ার সাধ রামের স্মৃতিকে ভুলাতে পারেনি এতেই অন্ত্যজ-সমাজ অবাক হয়ে যায়। এই সব জাতির কাছে সতীত্বের সংজ্ঞা অন্যরূপ। বাড় বাড়ন্তির সময়ে সকলেই একটু আধটু আমোদ স্ফূর্তি করে; তাতে আর দোষ কি? যতদিন স্বামীর ঘর করে ততদিন মন পাতিয়ে থাকলেই এদের কাছে সতীত্বের পরাকাষ্ঠা দেখান হয়। সতীত্বের পরীক্ষার জন্য বার বার উত্যক্ত হয়ে পাতাল প্রবেশ করা এদের ভাল লাগেনি। বলাবাহুল্য এ কথা বিশ্বাস করতে চায় না বলেই সীতার পাতাল প্রবেশ সম্বন্ধীয় কোন সংগীত রচনায় প্রেরণা জাগেনি।

সাপুড়িয়া জাত ও রামসার জাতের মধ্যেই বহুল পরিমাণে রামায়ণের কথা পাওয়া যায়। সাপুড়িয়া জাত বেদে—সাপুড়িয়াদের মধ্যেই অস্তিত্ব বজায় রাখে। তারা সাপ নাচাবার সময় এই গান করে। এখানেও আমরা দেখতে পাই সাপুড়িয়াদের জীবিকার্জনে অন্ত্যজ-সাহিত্যের সহায়তা। তাই এ সাহিত্য বেঁচে থাকে জনগণের স্বার্থ সিদ্ধি করবার জন্য। রামসার জাত, ডোম প্রভৃতি জাতির মধ্যে বেশী শুনতে পাওয়া যায়। এই সব জাতির বাড়ীতে মনসা, শীতলা প্রভৃতি উৎকট রোগ ও সর্পের দেবতার পূজা প্রচলিত আছে। তাই পূর্বের ডোমাচার্য্যদের হারিতি দেবীর কথাই মনে হয়। এই সব পূজা সাধারণতঃ রাধাঅষ্টমীর দিন অনুষ্ঠিত হয়। সিন্দুর-লিপ্ত মায়ের সামনে বিষম ঢাকি নিয়ে এরা জাত গান করে। এই গানের সুরের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বর্তমান। অন্ত্যজ-গীতি-সাহিত্যে সুর লক্ষ্য করবার বিষয়। যেমন যেমন প্রতিবেশ, এদের সংগীতের সুরের ব্যঞ্জনা তেমনি ভাবদ্যোতক। তাই কি অনির্বচনীয় আনন্দের

অধিকারী এরা। এই জাতের মধ্যে বাপ তার ছেলেকে গান শিখিয়ে যায়, ছেলে আবার তার ছেলেকে। এমনি করে কুলদেবতা পূজার সাথে স'থে পুরুষানুক্রমিকভাবে অন্ত্যজ-সাহিত্যের একটী ধারা অস্তিত্ব বজায় রাখে।

রাজা দশরথ অপুত্রক থাকলে আর রামায়ণ মহাকাব্যের অভ্যুদয় হতো না। তাই অন্ত্যজ-সাহিত্যে অন্ধ মুনির পুত্র বধ হ'তেই রামায়ণের আরম্ভ। কারণ, রাজা দশরথকে অন্ধ মুনি পুত্র হেতু শোক পাবে এই অভিশাপ দেওয়ার পর ঋষি বাক্য অযথা হবার নয় তাই রাম লক্ষণের জন্ম। অন্ধ মুনির পুত্র বধ করার আগের কথা আর পাওয়া যায় না। শুধু ভগবান স্বর্গে রাম জন্মাবার পূর্বে চার, অংশে প্রক'শ হয়ে আছেন একথা পাওয়া যায়। লক্ষ্মী সীতা দেবী হয়েছেন। বামে লক্ষণ ছত্রধারী। চামর ব্যজন করছেন ভরত ও শত্রুঘ্ন, জোড় হস্তে তপ করছেন পবন নন্দন হনুমান। কি সুন্দর প্রস্তাবনা। রাম যে স্বয়ং নারায়ণ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

নিত্যপাঠ সিংহাসন উপরেতে তুলি।
তথায় বসে আছেন দেখ বনমালি ॥
কিছু পরে প্রভুর হইল অভিলাষ।
এক অংশে চারি অংশ হইব প্রকাশ ॥
লক্ষ্মী আজ সীতা হয়ে বসেছেন বামে।
স্বর্ণ ছত্র ধরে আছেন লক্ষণ ও যে বামে ॥
চামর ঢুলায় তারে ভরত শত্রুঘ্ন।
আর জোড় হস্তে তপ করেন পবন নন্দন ॥

কিন্তু রামচন্দ্র মাটির পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়ে মানুষেরই অধীন হয়ে গেলেন তা' আমরা অন্ত্যজ-সাহিত্য আলোচনা করলে জানতে পারি। এতে অন্ত্যজ-সমাজের মহত্ত্বেরই পরিচয় পাওয়া যায়। কারণ জনগণ নিশ্চয় রামচন্দ্রকে ঘরের মানুষের থেকেও অসহায় ভাবে। তা'নাহলে অন্ত্যজ-কবি রামকে মানুষ করবার প্রেরণা কোথায় পেল? ঈশ্বরের ঐশী শক্তির বিকাশ কোন অলৌকিক লীলার কথা শুনে আমরা তাঁর এবং আমাদের মাঝে অনেকখানি ব্যবধানের সৃষ্টি করি। কিন্তু যদি তাঁর লীলায় আমাদেরই মত ক্ষুধা, তৃষ্ণা, জরা, মরণের গণ্ডীর মাঝে তাঁকে বেঁধে ফেলি, তবে আপন ভাবতে কষ্ট কল্পনার প্রয়োজন হবে না। তা'হলে ভগবানকে অন্ত্যজ-সমাজ কত আপন ভাবে তা' আঁমরা রামকে দেখলেই বুঝতে পারি। কিন্তু বাল্মিকীর রাম দেবতা নন যদিও, তবুও দেবোপম।

মানুষীশক্তি, মজ্জা ও বলবত্তার প্রাবল্যে তাঁকে দেবতা বলেই মনে হয়; আর কৃত্তিবাসের রাম পূজা উপভোগকারী দেবতা। তিনি পলকেই সৃষ্টি, স্থিতি সংহার করতে পারেন আবার ভক্তের চোখে জল দেখলেও নিজেই কেঁদে ফেলেন। এখন আমাদের কাছে কোন রাম সমধিক আপন? আমাদেরই ঘরের মানুষের থেকে অধীন রামকে দেখলে দয়া আসে ইহা কি মানুষের কাছে উপভোগ্য নয়? ভক্তের সনাতন কামনা কি মানুষের দেবতাকে আপন করতে চায়নি?

অন্ত্যজ-সাহিত্যে রামায়ণ কথা সম্বন্ধীয় গানের মধ্যে প্রথমে দুই পংক্তি ধুয়া থাকে। তারপর ভাব যোগ ক'রে ক'রে ধুয়ার সংগে সমন্বয় রেখে সংগীতের শেষ হয়।

বাপ সিন্ধুক যাওরে জলে।
শিগ্‌গ করে আনগা জল
নইলে প্রাণ যাবেরে চলে॥
জল আনিতে যায় দেখ মুনি পুতু আজ।
জল ভরিতে বক বক হাঁড়ির আওয়াজ॥
হরিণে জল খেছে ওগো তাই মনে করি।
রাজা দশরথ ধেনুকেতে দিলেক বাণ জুড়ি॥
হায় হায় মরে গেল সাধুর নন্দন।
পুতু অর্থে এমনি জলিস সাধুর বচন॥
ও শাপ দিল, দিল মুনিরে—

ঋষির বাক্য ব্যর্থ হবার নয় এ কথা অন্ত্যজ-সমাজ মন প্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করে, তাই আর দশরথের পুত্রের জন্য যত্ন করা এবং রাণীদের চরু ভক্ষণ করার কোন প্রয়োজন অনুভব করে না অন্ত্যজ-কবিগণ। সেইজন্য যজ্ঞ সম্বন্ধে কোন সংগীত পাওয়া যায় না। রামের জন্ম হ'ল। দেবতারা স্বর্গে দুন্দুভি বাজাতে থাকুক আর রাবণের মুকুট খসে পড়ুক; অন্ত্যজ-কবির কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। তাদের রাম পিতৃপিণ্ডের অধিকারী পুত্র।

কৌশল্যা রাণী গর্ভে জন্মিল রঘুমণি।
শোন মোর বাণী দশরথ হে—
বটে পিতৃ পিণ্ডের অধিকারী তিনি॥

সীতার জন্মকথা অন্ত্যজ-সাহিত্যে অনুরূপ পাওয়া যায়। কৃত্তিবাসী রামায়ণের সংগে এ জন্ম বৃত্তান্তের কোন মিল নেই। আমরা আরও দুই একটী

হস্তলিখিত রামায়ণের (পুঁথির) অনুসন্ধান করেছি কিন্তু কোন পুস্তকেই এ কথা পাওয়া যায় না। রাবণের রাজ্য সীমার মধ্যে কতকগুলি তাপস তপস্যায় রত ছিলেন। একদিন রাবণ সন্ন্যাসীদের কাছে কর আদায়ের জন্য সিপাই শাস্ত্রী পাঠিয়ে দিল। কিন্তু সন্ন্যাসীগণ প্রত্যেকেই বললেন,

ফলমূল আহারী মুঁই অর্থ বিত্ত নাই।
ঘর নাই দুয়ার নাই বিক্ষ তলে ঠাঁই॥
শুধু মাত্র সংগে আছে গাছের বাকল।
মোরে শাসাইলে ওগো বল কিবা ফল॥

সৈন্য-সামন্তগণের নিকট সমস্ত কথা শুনে রাবণ তাদের দেহের রক্ত কর স্বরূপ গ্রহণ করবার জন্য স্বয়ং এসে উপস্থিত হ'ল। নির্বিকার চিত্ত মুনিগণ বিনা-বাক্যব্যয়ে আপন আপন শরীর কেটে রক্ত দিলেন। রাবণ সেই রক্ত নিয়ে এসে রাজপুরীতে রাখবার সময় মন্দোদরী জিজ্ঞেস করলে, পাত্রে ওটা কি ? রাবণ বললে, হলাহল।

তারপর অনেক বৎসর গত হ'ল। রাবণ ত্রিভূবন বিজয় করতে গেছে, এখনও ফেরেনি। কিন্তু মন্দোদরী—

গর্ভবতী ভাবে নিজে চাহে ঘনে ঘন।
দুগ্ধের উপরে যেন ভেলাই গড়ন॥
উঠি বসি করে আর মুখে ওঠে জল।
গর্ভের সকল লক্ষণ দেখে সে কেবল॥

এই লজ্জাকর অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য মন্দোদরী আত্মহত্যা করবার মানসে বিষ জেনে সে ঋষিদের সঞ্চিত রক্ত পান করলে। কিন্তু মৃত্যু হওয়া ত দূরের কথা দিন দিন উদর বর্ধিত হ'তে লাগল। শেষে দশমাস দশ দিনে মন্দোদরী প্রসব করলে একটী কন্যা।

নারীর এ দাগ যে জীবনে মুছা দায়।
হেঁট মুণ্ডু হয়ে গেনু কলংক পসরায়॥
জলজ্যান্ত স্বামী থাকতে এ কিবা রীতি।
হাসবে সকলে শুনে গোপন পিরীতি॥
শুওটা বিধি জানছে কিন্তু আমার মন।
তবে কেনে মোর কপালে হল এ লিখন॥
এই রেতে সমুদ্রেতে আমি ভাসিন দিব।
বিধির ছলনা আমি নিমূল করিব॥

রাতের অন্ধকারে গোপনে সে কন্যাটিকে পাত্রস্থ ক'রে সমুদ্রের জলে ভাসিয়ে দিয়ে এল। কিন্তু বিধির ছলনা কি এড়াতে পারা যায়। বিধির হাত হ'তে পরিত্রাণ পাচ্ছি ভাবলে মন্দোদরী ; কিন্তু এইখানেই এই বিসর্জনের বেলা হতেই আরম্ভ হ'ল রাহুর কোপদৃষ্টি। রাবণ আর স্বর্ণ লংকা ধ্বংসের সীতা যে মূল কারণ সে সীতার জন্ম হল রাবণেরই প্রিয়তমা মহিষীর গর্ভে ঋষিদের রক্তে। রাবণ নিজ হাতে শত্রুর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করল।*

ভোর হয়ে এল। সমুদ্রের ভিতর হ'তে রাঙা রবি মাথা তুলে দাঁড়াল। এই দিনই রাবণ ফিরে আসবে। স্বস্তীর নিশ্বাস ফেলে বাঁচল মন্দোদরী। কি বাঁচবে কি করে তারা ? ঋষিদের রক্ত বুঝি রাবণের রক্ত চায় ; তাই মূর্তি পরিগ্রহ ক'রে অলক্ষ্যে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হ'তে লাগলো জনক রাজার ঘরে। জনক রাজা তাঁর জমির ধারে তাকে কুড়িয়ে পেলেন। এই কন্যাই সীতা। বেলা তৃতীয় প্রহরে জনক রাজা সীতাকে রাজপুরীতে নিয়ে এলেন। রাজ্যে আনন্দের জোয়ার সুরু হল। এদিকে ঠিক সেই সময়ে রাবণ লংকাতে এসে গেল। রাজ্যে আনন্দের সীমা নেই। লোক-লস্কর, হাতী-ঘোড়া, অপ্সরী-কিন্নরী ও বন্দী দেবতাগণকে নিয়ে প্রথম দুয়ার পার হবার সময় চৌকাঠে ধাক্কা লাগলো রাজার কপালে। প্রজাদের মাঝে গুঞ্জন সুরু হল। শাঁখের শব্দ এবং হুলুধ্বনি বন্ধ হয়ে গেল। সকলেই ভীত, এস্ত। বহুদিন অনুপস্থিতির পর প্রথম বাড়ী ঢুকবার সময় চৌকাঠে বাধা অমংগলের ইংগিত করে। রাণী কেঁদে এসে পড়লো। কিন্তু রাবণ উচ্চহাস্য করে উঠল। ত্রিভুবন শংকিত যার ভয়ে সে কি ভয় পায়। অন্ত্যজ-কবি সুষ্ঠু কল্পনা দিয়ে এখানে রাম-রাবণের যুদ্ধ ও রাবণের নির্বংশ হওয়ার ইংগিত করছে। কারণ সীতার জন্ম হল। কৃত্তিবাসী রামায়ণে কিন্তু রামের জন্মকালে রাবণের বিপদানুভবের কথা শুনতে পাওয়া যায়। "অযোধ্যায় জন্ম যদি লইলা শ্রীপতি। লংকায় আতংক দেখে সদা লংকাপতি ॥"

সীতার জন্মবৃত্তান্ত সমস্ত একজনের মুখ হ'তে পাওয়া যায় না। কারো কাছে চার পংক্তি আবার কারো কাছে দশ পংক্তি এমনিভাবে পাওয়া যায়।

এর পর বানরগণের জন্ম, রাম লক্ষণাদির বাল্য ক্রীড়া, রামের শাস্ত্র ও শস্ত্র বিদ্যা শিক্ষা, সীতার পণার্থে হরের ধনু প্রদান, জনক রাজার ধনুর্ভংগ পণ, গুহকের

* এই প্রবন্ধ ১৩৫৪ সাল পৌষ সংখ্যা সংহতি মাসিক পত্রে প্রকাশিত হয়। তার পর কুড়ি বৎসর পরে জানা যায় তেলেগু লোক কথায়ও অনুরূপ সীতার জন্মবৃত্তান্ত আছে। কিছু তফাৎ মাত্র।

সংগে শ্রীরামচন্দ্রের মিতালী সম্বন্ধীয় পৃথক পৃথক সংগীত পাওয়া যায় না। রাক্ষসের দৌরাত্মে যজ্ঞ করতে না পেরে মুনিগণ তাদের দমন করবার জন্য রামচন্দ্রকে আনয়ন করতে মনস্থ করলেন। বিশ্বামিত্র অযোধ্যায় গেলেন। রামকে আনয়ন সম্বন্ধে অনেক গান প্রচলিত আছে। আর এই গানের মধ্যেই জনক রাজার ধনুর্ভংগ ও গুহকের সাথে মিতালীর কথা পাওয়া যায়। কোন রকমে সামঞ্জস্য থেকে যায়। একটার পর একটা গান সংগ্রহ করলে সংক্ষেপে সমস্ত রামায়ণ কথা এদের রামায়ণে পাওয়া যায়।

মুনি ফিরে যারে মিথিলাতে।
আমার অঞ্চলের ধন নয়নমণি—
লারবো, লারবো রামকে বিদায় দিতে।
ও মুনি ফিরে যারে·······
মিথিলা হইতে আইলো বিশ্বামিত্ত মুনি
দশরথ পাদ্য অর্ঘ্য দিল ইহা শুনি ॥
তোমার দুই পুত্ত্ লয়ে যাব মিথিলা নগরে
শুনিয়া কৌশল্যা বলে আমার নয়ন রঞ্জন।
কেমন ক'রে র'ব প্রভু ত্যজি অঞ্চলের ধন।
দশরথ বলে বিদায় করি ভরত শত্রুঘনে।
বিদায় করিলা রাজা বিশ্বামিত্তার সনে ॥

দশরথ কৌশল্যার অশ্রুসিক্ত মুখের পানে তাকিয়ে বললেন,
বিদায় করিব আমি ভরত শত্রুঘনে।
তারপর, বিদায় করিল রাজা বিশ্বামিত্তার সনে ॥

বাৎসল্য বশে রাণী বিপদের মুখে রাম লক্ষণকে ছেড়ে দিয়ে কি স্থির থাকতে পারেন? তাই তাঁর কাতরোক্তির জন্য দশরথ ভরত-শত্রুঘ্নকে বিশ্বামিত্রের সংগে দিলেন। তারাও রাজার পুত্র কিন্তু দশরথ জানেন যে ভরত-শত্রুঘ্ন রাক্ষসদের সাথে যুদ্ধ করবে না তাই ভয়ের কোন কারণ নেই।

কৌশল্যা বলিছে রাজা ওদের পুত্ত্ কেনে।
ওরাও ধরেছে পেটে ছাড়িবে কেমনে ॥
রাজা বলে ওরা কিছুতেই যুদ্ধ না করিবে।
ডেপো ছেলে রাম তোর যুদ্ধ করিতে যাবে ॥

কৃত্তিবাসী রামায়ণে কিন্তু দশরথই রাম লক্ষণকে মুনির সংগে পাঠাতে রাজী হননি এবং বুদ্ধি ক'রে ভরত শত্রুঘ্নকে মুনির সাথে দিয়েছিলেন। তারাও ছেলে। কোন্ পিতা এক ছেলেকে রক্ষা করবার জন্য অপর ছেলেকে মৃত্যু মুখে তুলে দিতে চায়?—কিন্তু অন্ত্যজ-কবির এদিকে আসাবধানতা দেখতে পাই না। ভরত শত্রুঘ্নকে রাম লক্ষণের বদলে দিচ্ছেন সে সম্বন্ধে আমরা সুন্দর যুক্তি দেখতে পাই। স্নেহান্ধ পিতা মুনির অভিশাপের কথা ভুলেই গেছেন। আপাত দৃষ্টিতে রাম লক্ষণ রক্ষার উপায় হ'ল ভেবে আনন্দিত।

কৃত্তিবাসী রামায়ণের মতই অন্ত্যজ-সংগীতে বিশ্বামিত্র ভরত শত্রুঘ্নকে রাম লক্ষণ মনে ক'রে হৃষ্ট মনে রাজপুরী হ'তে বিদায় নিলেন। সরযূ নদীতে তাদের স্নান করিয়ে বললেন,

বল বাবা রাম লক্ষণ কোন পথে যাইবে ॥
ভরত বলে শুন ওগো প্রভু দয়াময়।
যুন পথে যাইবে তুমি যাইব নিশ্চয় ॥
ছয় মাসের পথে গেলে পায়ে ধুলা না লাগিবে।
ছয় দিনের পথে গেলে রাক্ষস বধিতে হবে ॥

এইস্থানে কৃত্তিবাসী রামায়ণের সংগে একটু প্রভেদ রয়েছে। কৃত্তিবাসী রামায়ণে তিন দিন ও তৃতীয় প্রহরের পথ। তারপর ভরত শত্রুঘ্ন ছয় মাসের পথে যেতে চাইলে। তখন—

বিশ্বামিত্তা বলে বাবা দশরথ নন্দন।
তোমরা ঘুরে চল অযুধ্যা এখন ॥

মুনি ফিরে আসবার সময় অযোধ্যার দিকে কোপ নয়নে তাকালেন। অমনি সমস্ত নগরে দাউ দাউ করে আগুন জলে উঠল। তখন রাজা প্রজা রক্ষার জন্য রাম লক্ষণকে বিদায় দিলেন। এখানে রাজার মহত্ব প্রকাশ পায়।

রাম লক্ষণ অগত্যা নিরুপায় হয়ে মুনির সংগে গেলেন। কারণ পিতা পাঠিয়ে দিয়েছেন, উপায় কি? কৃত্তিবাসী রামায়ণে রাম মুনিকে অনুরোধ ক'রে প্রজাদের রক্ষা করেন ও মিথিলায় যেতে চান। রাম লক্ষণ ও নদীতে স্নান ক'রে ছয় দিনের পথে যেতে চাইলেন। তারপর ছয় দিনের পথে চলতে চলতে হঠাৎ বিশ্বামিত্র বললেন,

এখানে আছে এক সর্প পথ আগুলিয়া।
ঐ দেখ স্বর্গে এক ঠোঁট মর্ত্যে এক ঠোঁট দিয়া ॥

রাম সর্পটিকে দেখে বললেন,

মারিতে পারি যদি আপনি দাও তপোবল।
আরাধনার শক্তিকে আমি করিব সম্বল ॥

রাম লক্ষণ সাধারণ মানুষের থেকে কোন অংশেই উচ্চ নয়। তিনি শুধু তপোঃশক্তির প্রভাবে অসাধারণ সর্পটিকে বধ করলেন।

তারপর রাক্ষসী তাড়কা বধের মধ্যেও কোন বৈচিত্র্য নেই। তাড়কা বধ হওয়ার পর বিশ্বামিত্র রাম লক্ষণকে বললেন,

ক্ষনেক পরে বলে বিশ্বামিত্তা মুনি।
একবার আমি দেখি নৃত্যকর তুমি ॥
হাতে করতালি দিয়া নাচ ঘুরি ফিরি।
রাম লক্ষণ নাচে আর চলে ধীরি ধীরি ॥
হেন সময়ে পাষাণ মানব হইল।
বিশ্বামিত্তা দেখে আর দেখে গৌতমের লোকে।
পাষাণ হইল মানব ছেলে দুটার নাচে।
মুনির আশীষে বুঝি মানুষ বাঁচে ॥
(গৌতমের লোকে বলে) যদি কারো পাষাণ আছে ফেলাও গিয়া দূরে।
পাষাণ মানব হইবে ছেলে দুটার জুড়ে ॥

রামায়ণের অহল্যা উদ্ধারের সংগে এ অহল্যা উদ্ধারের কোন মিল নেই। এ যেন বিধি নির্দিষ্ট। কোন ক্ষণ প্রভাবে পাষাণী মানবী হ'ল। রামকে বাদ দিয়ে অহল্যা উদ্ধার হয় না তাই কোন রকমে এ ঘটনার সংগে অন্ত্যজ-কবি রামের সংস্রব দেখিয়েছে। রাম শ্রীচরণ দিয়ে অহল্যাকে ধন্য করেন নি। আর সেই জন্যই অহল্যার প্রতি গৌতম ঋষির অভিশাপের কথা অন্ত্যজ-সাহিত্যে পাওয়া যায় না।

খেয়া ঘাটে পার হবার জন্য বিশ্বামিত্র মুনি চললেন। এদিকে নাবিকের স্ত্রী অহল্যা উদ্ধারের কথা শুনে নদীর ঘাটে স্বামীকে নৌকায় তুলতে বারণ করবার জন্য গেল। নাবিককে অনেক বুঝিয়ে রাম লক্ষণ ও মুনি নদী পার হলেন। কিন্তু নাবিকের নৌকাখানি মন্ত্র প্রভাবে সোণা হয়ে নদীতে ডুবে গেল। তন্ন তন্ন করে খোঁজ করার পর তাদের তরী পাওয়া যায়।

বিশ্বামিত্তা মুনি তখন করিলা গমন।
আর মিথিলা নগরে আসি দিলা দরশন ॥

এদিকে মিথিলায় জনক রাজা পণ করেছে
একশ' টাকা গণ্ডীবান।
এ গণ্ডীবান যে ভাংগতে পারে তাকে করবো সীতা দান ॥
চল ভাদু মিথিলা যাব রামের বিয়ে দেখিতে।
ধনুক ভেংগে হবে বিয়ে জনক রাজার কন্যাকে ॥

রাম হরধনু ভেংগে সীতার পাণি গ্রহণ করলেন। কিন্তু আনন্দের দিনে ভবিতব্যের কটাক্ষ যেন এই আনন্দ বাসরে কালির ছাপ রেখে যায়।

ও রামের মা ও রামের মা আজকে রামের অধিবাস।
চৌকঠাতে লেখা আছে চৌদ্দ বছর বনবাস।

* * *

রামের মা কৌশল্যা রাণী ধুলায় প'ড়ে অচেতন।
ওঠ্ কৌশল্যা চিঠা কর আসছে তোর ঐ নীলরতন ॥
একশ' টাকার জাম কিনিলাম,
রামকে দিলাম জল খেতে।
রামের আমার মলিন দশা
অগাধ জলে যায় ভেসে ॥

সীতা হরণের পর হনুমান বললে,

আমি আছি ভয় কিবা সাগর লংঘিব।
ঘরের সীতারে আমি ঘরেতে আনিব ॥

এইরূপে হনুমান সকলকে আশ্বাস দিয়ে শূন্যে লম্ফ প্রদান করলে। আকাশ পথে যাবার সময় সুরমা ও সিংহিকার বৃত্তান্তও পাওয়া যায়। তবে তাতে কোন নতুনত্ব নেই।

হনুমান লংকায় সীতার সহিত সাক্ষাৎ করার পর আম্রবনে গেল। রামায়ণের মধুবন অন্ত্যজ-সাহিত্যে আম্রবন নামে খ্যাত। সেখানে যত ইচ্ছা আম্র ভক্ষণের পর অযথা নষ্ট করতে লাগল। তখন ভারতবর্ষে নাকি আম্রবৃক্ষ ছিল না। হঠাৎ হনুমানের এ কথা স্মরণ হতেই হনুমান একটা আম নিয়ে ফিরে আসবার সময় রাক্ষসদের কবলে পড়ে গেল।

রাক্ষসগণ আম নিয়ে যেতে দেয় না দেখে হনুমান একটা আঁটি ছুড়ে সাগর পার করে দিল। তখন হতেই নাকি আম্র বৃক্ষের সৃষ্টি হয়।

লংকা হ'তে তুরে হনু আম্র ফ'লের আঁটি।
হা হা করে গিললে তারে ভূভারতের মাটি ॥
সেই দিন হইতে হইল আম্রের পত্তন।
লংকার ভাল দ্রব্য আইল এখন ॥

লংকা পোড়া হনু লংকা ছারখার করার পর সীতাদেবীর কাছে এসে বললে,

হাত মুখ পুড়ে গেল লজ্জাতে বাঁচি না।
হনুদের মাঝে আর ফিরে যাইছি না ॥
মুখ পোড়া দেখে সবে ইংগিত করিবে।
তারপর অংগদ মোকে বেশী জ্বালা দিবে ॥
দুখের মুখেতে হেসে বলেন শ্রীসীতা।
সব হনুর পোড়া মুখ শোন মোর কথা ॥

সীতার বাক্যে তখন হতেই যত হনুর মুখ ও হাত পা কালো হয়ে গেছে। বহু 'নিম্ন জাতের' মুখে এ কথা শুনতে পাওয়া যায়। কেবল যারা যুদ্ধে যোগ দেয়নি, তাদের মুখ পূর্ববৎ আছে। রামায়ণ কথায় উপরোক্ত গল্প দুইটী অন্ত্যজ-কবির স্ব-কপোল কল্পিত। এদের গানে এমনি ধারা ছোট ছোট গল্প পাওয়া যায়। তবে এ ধারার গান সংগ্রহ করা কঠিন।

ধার্মিক শ্রেষ্ঠ বিভীষণ রাবণকে বললেন,

অপ্সরী কিন্নরী আর মানবী রাক্ষসী।
যত পার ভোগ কর হও তুমি খুসী ॥
সীতা ছাড়ি দাও তুমি বনবাসির মেয়ে।
হনুর গলা ধরি কাঁদে দেখবে নাকি চেয়ে ॥

অন্ত্যজ-সংগীতে রাবণের উষ্মা যেন একটু বেশী। বিভীষণের কথা শুনে রাবণ অযথা গালাগালির পর বিভীষণকে পদাঘাত করলে। বিভীষণ স্মিত-হাস্যে বললেন,

এইবারেতে সোণার লংকার স্বর্ণ চূড়া।
ভূমে পড়ি একেবারে হয়ে যাবে গুড়া ॥

বিভীষণ স্বর্ণলংকা ত্যাগ করে চলে এলেন। অবহেলিতা সরমা নিরালা অরণ্যানীর অনাদৃতা বনকুসুমের মত রইল না। বিভীষণ তাঁর কাছে রামের সংগে যোগ দেবার অনুমতি নিয়ে গেলেন। কৃত্তিবাসী রামায়ণে কিন্তু বিভীষণ চারজন পাত্রের সংগে যুক্তি করেছিলেন। কুবেরকে অপমানের কথা বলে সকলের

অনুমতি নিয়েছিলেন কিন্তু তখন ধার্মিক-প্রবরের পতি-প্রাণা সরমার কথাও কিশোর তরণীর কথা মনে পড়ে না।

শ্রীরামের পাশে যাই দেহ অনুমতি।
অন্তিমেতে হবে দেখা যুগল মূরতি ॥
ভাল বুঝে যাও প্রভু নাহি করি মানা।
তরণীর মুখ চাহি থাকিব অবলা ॥
পুরুষের ধর্ম করিতে বাধা নাহি দিব।
পুরুষের পুণ্য হইলে সুখেতে মরিব ॥
শত কষ্ট দুঃখ সকলি সহিব।
নিশ্চয় স্ত্রীর প্রকৃত কর্ম সকলি করিব ॥

নল কর্তৃক সাগর বন্ধন করা হল। রামের সৈন্যগণ গাছ, পাথর দিয়ে সাগরের উপর সেতু নির্মাণ করলে। একটা কাঠ বিড়ালী একবার করে জলে ডোবে তারপর ছুটে গিয়ে বালিতে গড়াগড়ি করে এবং সেতুর উপরে গিয়ে গা ঝেড়ে দিয়ে যায়। এমনিভাবে তার ক্ষুদ্র শক্তি দিয়ে রামচন্দ্রকে সেতু বন্ধন করতে সহায়তা করে। সীতার উদ্ধার কে না চায়? বনের ক্ষুদ্র জীব সেও তার তুচ্ছ কর্মশক্তি দিয়ে জানাতে চায় প্রাণের আকুতি। হঠাৎ রামচন্দ্র কাঠবিড়ালীর সহায়তা করা দেখে লক্ষ্মণকে বললেন,

বনের বিড়াল সেও চায় দেখতে সীতার মুখ।
সীতা উদ্ধারের কাজে দেখ কিবা সুখ ॥

রামচন্দ্র কাঠবিড়ালীকে ডেকে তার গায়ে হাত বুলাতে লাগলেন। কত সাবাস দিলেন। চোখে তাঁর জল এল। রামচন্দ্রের হাতের পাঁচটা আংগুলের টানা দাগ কাঠবিড়ালীর পিঠে রয়ে গেল। কাঠবিড়ালীর পিঠের সাদা দাগ দেখে এরা বলে এই উপাখ্যান। পটুয়াদের গানে এ কথা সংগীতাকারে লিপিবদ্ধ আছে। সুন্দরাকাণ্ড শেষ। "সুন্দরাকাণ্ডেতে হয় সাগর বন্ধন।"

এবার মহারণের সূচনা হল। শুক ও সারণ রামের সমরায়োজন দেখে গেল। তারা ফিরে গিয়ে শ্রীরামের প্রশংসা করায় রাবণ তাদের ভৎর্সনা করলে। শ্রীরামের সৈন্যদলে সাজ সাজ রব পড়ে গেল। ভীত এস্ত রাবণ ছল-কৌশলে সীতাকে পাবার জন্য আর একবার চেষ্টা করলো।

বিজুজ্জিল (বিদুজ্জিহব) রামের মুণ্ড বনাইয়া দিল।
সেই মুণ্ডু রাবণ সীতারে দেখাইল ॥

রামের মায়া মুখ দেখে সীতা মুর্চ্ছিতা হয়ে পড়লেন। দলিত চম্পকের ম্লানিমায় কি সৌন্দর্য্য থাকে না ? ধুলি লুন্ঠিতা সীতা দলিত সৌন্দর্য্যের প্রতীক। সীতাও রাবণকে কিছু বললেন না। বিমুখ হয়ে ফিরে গেল পাণি প্রার্থী রাবণ। রাক্ষসের মায়া ওগো রামের মুণ্ড নয়—কে বললেন এই কথা। সীতা পেলেন সান্ত্বনা। কাছে বসলেন সরমা। স্বামী তাঁর সাগর পারে। সীতার অশ্রু আবিল মুখের দিকে চেয়ে বললেন,

ধৈর্য্য ধর সীতা তুমি হয়ো না উন্মাদ।
তা'হলে ঘটিবে ওগো ভীষণ প্রমাদ ॥

এদিকে সুগ্রীব সৈন্য সজ্জা রচনা ক'রে লংকার চারিদিকে বানর কটক বসিয়ে ফেললেন। অংগদ রাবণের দরবারে গিয়ে উপস্থিত হ'ল।

অংগদ নামেতে তুই বালির নন্দন।
তোর পিতাকে বধ করেছে রাম আর লক্ষ্মণ ॥
কেন এলিরে—
বনের পশু তুই এলি আমার লংকার মাঝারে।
চেয়ে দেখ দেখি কে রাবণ আছে রে ॥
বিশ্রস্ববার পুত্র তুই পৈণাস্তর নাতি।
একজনা রাখব না তোর বংশে দিতে বাতি ॥
রাবণের রাজ মটুক কেমনে লিব কেড়ে।
চেয়ে চেয়ে দেখে আর যায় সবে তেড়ে ॥
রাজ মটুক নিল কেড়ে অংগদ বসে পাঁচির উপরে।
থাকতে এত সৈন্য মোর অংগদ মটুক কাড়ে ॥

অংগদ বিনা বাধায় অক্ষত শরীরে রাবণের রাজ মুকুট নিয়ে এসে রামের শ্রীচরণে অর্পণ করলে। বললে, রাবণপুত্র মেঘনাদের শৌর্য্য বীর্যের কথা ; তার মেঘের আড়াল থেকে যুদ্ধ করার কথা আর 'নাগপাশ' অস্ত্রের নাম জানাতেও ভুল করলে না।

মহারণ সুরু হ'ল। ইন্দ্রজিত যুদ্ধে রাম লক্ষণকে নাগপাশে আবদ্ধ করলে।

আর গরুড় এসে জীয়াইল প্রভু দয়াময় বলে।
রাম বলে গরুড় তুমি কি চাও বল।
গরুড় বলে দেখিলাম রামরূপ কিষ্টরূপে চল ॥

অবাক হয়ে শোনে রাম বুঝিতে না পারে।
বিভীষণ কহে ডাকি গরুড়ে অন্তরে।
দ্বাপরেতে কৃষ্ণ দেখা মিলিবে তোমারে॥

ভক্তের ভগবান গোলকবিহারী হরি রামরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন এক প্রস্তাবনা ছাড়া এ কথা আর কোথাও পাওয়া যায় না। আমরা পূর্বেই বলেছি অন্ত্যজ-কবির রাম দেবতা নন, মানুষ। আমাদেরই ঘরের ছেলে। তাই এখানে ভক্ত-বৎসল রাম ভক্তের মনোবাসনা পূর্ণ করলেন না। ভক্ত-বৎসল করার চেয়ে রামকে মানুষরূপে সৃষ্টি করার দিকে অন্ত্যজ-কবির দৃষ্টি ছিল প্রখর। যদিও বাল্মিকী রামায়ণে দেখা যায় শ্রীরামচন্দ্র কালিন্দী পুলিনবিহারীর মূর্তিতে ভক্ত গরুড়ের সমুখে আবির্ভূত হয়েছেন।

নাগপাশ মুক্ত রাম লক্ষণ এখনও রেহাই পেলেন না। নাগপাশ ব্যর্থ হ'ল দেখে রাবণ ধুম্রাক্ষকে যুদ্ধে পাঠান এ কথা পাওয়া যায়; কিন্তু অকম্পন, বজ্র দংষ্ট্র ও প্রহস্তের সংগে বানর চমুর যুদ্ধের কথা পাওয়া যায় না।

প্রথম যুদ্ধে রাবণের পশ্চাৎ অপসরণের কথা পাওয়া যায় না, কিন্তু তার পরের ঘটনা কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভংগ অন্ত্যজ-সংগীতে শুনতে পাওয়া যায়।

ঢোল, কাসি, কাঁড়া, শিংগা, নাকাড়া বাজায়ে।
ফ্যাসাদ দেখিল রাক্ষস নিদ্রা ভাংগাতে গিয়ে॥
আগুনের ছেঁকা দেয় লোহার তাতালে।
পাশ ফিরে শোয় কুম্ভক বাবুগিরি চালে॥

শেষে কুম্ভকর্ণের নিদ্রা ভাংগলো। নিদ্রোত্থিত কুম্ভকর্ণ রাজ-দরবারে এসে বললে,

অকালে ভাংগাইলে ওগো কুম্ভকর্ণের নিদ্দা।
ব্রহ্মের শাপেতে যুদ্ধে হবে নাকো সিদ্ধা॥

কুম্ভকর্ণের বীরত্বে অন্ত্যজ-সমাজ মুগ্ধ। অকালে ঘুম ভাংগালে হবে অকাল মৃত্যু—এই অভিশাপ না থাকলে রাম লক্ষণ তাকে মারতে পারত না। একথা অন্ত্যজ-সংগীতে পাওয়া যায়।

অন্ত্যজ-কবিগণ রাম লক্ষণের প্রতি অবিচার করেছে। শোক সময়ে অধিকতর বিচলিত, ক্ষুধায় ক্ষুধিত, বিপদে কর্তব্যবিমূঢ় ক'রে রামচরিত্র চিত্রিত করায় তাদের অভিলাষ পূর্ণ হ'য়েছে।

একটা দৈবী শক্তি ছায়ার মত রামকে অনুসরণ ক'রে বিপদকালে বার বার তাঁকে সাহায্য করেছে। রামচন্দ্র যেন মহাভারতের অর্জ্জুন। পশ্চাতে সুদর্শন-ধারী শ্রীকৃষ্ণের বাণী—'নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচীন্'।

রাম কেবল নিমিত্ত মাত্র। অত্যাশ্চর্য্য বানর কটক, বিভীষণ, দেবতাদের সহায়তা সবই যেন দৈবী শক্তির প্রকাশ।

কুম্ভকর্ণের মৃত্যুর পর ত্রিশিরা, দেবান্তক, নরান্তক, মহাপাশ ও মহোদর যুদ্ধে গেল।

কুম্ভকর্ণ মরে গেইছে আর কিবা ভয়।
শালুক তোলা করে হনু দেখিতে বিস্ময়॥

এর পর কুম্ভ, নিকুম্ভ ও মকরাক্ষের মৃত্যু হ'ল। এবার তরণী সেন যুদ্ধে গেল। রামভক্ত তরণী।

রাম রাম বলি ধনুকে দিল টংকার।
রাক্ষসের মায়া রাম শির লাও তার॥

তরণী সেনের মায়ের কাছে বিদায় গ্রহণ কালের যে করুণ দৃশ্য তা' অন্ত্যজ-সাহিত্যে পাওয়া যায় না।

বীরবাহু এবং ভস্মলোচনের পতন ও মায়াসীতা বধ হয়ে গেছে। নিকুম্ভিলা যজ্ঞে ব্রতী ইন্দ্রজিত। লক্ষণ ও বানর সৈন্য সমভিব্যাহারে বিভীষণ লংকায় উপনীত হ'য়ে বানর ব্যূহ রচনা করার পর যজ্ঞ দ্বারে ত্রিশূল হাতে দাঁড়িয়ে রইলেন। ইন্দ্রজিত অস্ত্র আনতে যাবার সময় দেখলে দ্বারে বিপক্ষ পক্ষের প্রহরী খুল্লতাত—বিভীষণ। বললে,

বুঝিলাম ঘরের ভেদ দিল কে তাহারে।
ঘর ভেদীতে রাবণ নষ্ট হইল এইবারে॥

মেঘনাদ বিভীষণকে দেখে তার পরাজয় তথা লংকার ধ্বংস যেন মানস চক্ষে দেখতে পেল। "ঘর ভেদী" থাকলে যেন ধ্বংস হতেই হবে, কোন উপায় নেই। হতাশ হয়ে পড়ল সে।

কিন্তু 'মেঘনাদ বধ' কাব্যের ইন্দ্রজিত বিভীষণকে দেখে হতাশ হয়নি; পরন্তু নানা উপমা উপদেশ দিয়ে, দুয়ার ছেড়ে দিতে অনুরোধ করেছে।

মেঘনাদ বধ হয়ে গেছে। ক্রোধে, দুঃখে, ক্ষোভে ম্রিয়মান রাজা লক্ষণকে শক্তি শেলে জীবন্মৃত ক'রে দিলে।

রামের বিলাপ :

গা তোলরে গৌর বরণ সমিত্তার অঞ্চলের ধন।
ধুলায় প'ড়ে ও ভাই লক্ষণ বল কেন রে অচেতন ॥
একবার গা তোলরে—
কেন বা আমার সংগে এলি বনবাস।
পিতার লাগিয়া তাই হইল সর্বনাশ ॥
ওঠ ওঠ বলে রাম কপালে মারে ঘা।
এত দুঃখ দিল মোরে ভরতেরই মা ॥
যখন যাইব আমি অযুধ্যা ভূবন।
সমিত্তা মাতা তোর শুধাবে যখন ॥
রাম আলি সীতা আলি কোথারে লক্ষণ।
কেমন ক'রে বলবরে ভাই তোমার মরণ ॥

* * *

ও ভাই লক্ষণ রে একবার গা তোল অযুধ্যে যায়।
ভাইরে এমন সোণার দেহ ধুলায় গড়াগড়ি যায় ॥

লক্ষণের শক্তিশেল সম্বন্ধে অনেক গান প্রচলিত আছে। আর প্রত্যেক গানেই রামচন্দ্রের বিলাপ। আপন জনের মৃত্যুতে বিয়োগ বিধুর মানুষেরই মত সে কান্না ; তাতে দেবত্ব-সুলভ সহিষ্ণুতা নেই।

কি কুক্ষণে হয়েছিল সীতা অপহরণ। সীতার অগ্নি-পরীক্ষা অন্ত্যজ-সাহিত্যে এক অভিনব বস্তু। পটুয়াদের গানে "পালাবন্দী" সীতার অগ্নি-পরীক্ষা পাওয়া যায় কিন্তু আমরা এখানে দুই পংক্তি উদ্ধৃত করছি—

আগুনের ভিতরে সীতা হাসে খলখল।
রাম দেখে তার সীতা কত যে নির্মল ॥

অযোধ্যা প্রত্যাবর্তনের শুভক্ষণ হয়ে এল। রাম বিভীষণকে রাজ্যে অভিষিক্ত ক'রে অমর বর দিলেন। সেই থেকে আজও নাকি বিভীষণ সূক্ষ্ম শরীর নিয়ে অলক্ষ্যে বাস করছেন। এদের বিশ্বাস কেউ তাঁকে দেখতে পায় না। হঠাৎ কারো মৃত্যু হ'লে এরা বলে "বিভীষণের সাক্ষাৎ হয়েছ্যাল।" কিন্তু হয়তো তাকে ঘাস কাটতে গিয়ে সাপে দংশন করছিল এবং সংগে সংগে তার মৃত্যু হয়েছে।

এখনও বিভীষণ এক একবার করে "মত্ত্যে" পা দেন। কোন কোন বছর জগন্নাথের রথ দেখতে আসেন। "মড়ক হ'লে, আকাল হলে বুঝতে হবে তাঁর

পদধূলি পড়েছ্যাল"। অনুসন্ধান করলে জানতে পারা যায় যে "আকালের" বছর জগন্নাথের রথ খুব ভারী হয়।

রাম লক্ষ্মণ সীতা অযোধ্যায় ফিরে এলেন। মহাসমারোহে রামের রাজ্যাভিষেক হ'ল।

একদিন লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্নের স্ত্রী সীতাকে জিজ্ঞেস করলে, কি ক'রে রাবণ তোমায় হরণ করেছিল? সীতা সকল "জায়ের" নিকট বিগত চৌদ্দ বৎসরের ইতিহাস বলে যায়।

কৃত্তিবাসী রামায়ণে রামের দরবারে মুনিগণ এলে পর অগস্ত্যমুনি রাক্ষসের বৃত্তান্ত বর্ণনা করেন।

অন্ত্যজ-জগতে স্ত্রীলোকদেরও একটা দরবার আছে। সীতা সেই দরবারের হাতে পড়েছেন; নিস্তার পাওয়া সংকট। সীতাকে সকল "জায়ে" জিজ্ঞেস করলে রাবণ দেখতে কেমন? সীতা বললেন, ভয়ংকর সে মূর্তি। তারা বললে এতে আর কি ক'রে জানবো যে রাবণ কেমন ছিল।

তখন সীতা আরও ভাল ক'রে বর্ণনা করতে লাগলেন। বললেন,

দশমুণ্ড কুড়ি হাত পর্বত প্রমাণ।
মস্ত মস্ত মোঁচ তার দড়ার প্রমাণ॥

সীতাদেবীর এত কথা কিন্তু ভরত, শত্রুঘ্ন ও লক্ষ্মণের স্ত্রী বুঝতে চায় না। অগত্যা সীতা মেঝের উপরে খড়ি দিয়ে রাবণের ছবি অংকন করে দেখালেন।

গর্ভবতী সীতার নিদ্রার আবর্ষণ হ'ল। অন্য সকলে সেখান থেকে উঠে চলে যাবার পর ক্লান্ত সীতা সেই মেঝেতে সেই ছবির উপরেই ঘুমঘোরে শুয়ে পড়লেন। তারপর রাম এসে দেখলেন, সীতা রাবণের ছবির উপরে শুয়ে আছেন।

রাম মনে মনে বললেন:

রাবণ বধ করে সীতা করিনু উদ্ধার;
ইহাতে মন না ভেজে দেখছি সীতার॥
সীতা আজও ভুলতে না পারিল রাবণেরে।
তাই পট এঁকে দেখে সে রাবণ শরীরে॥

রাম ভাবলেন, সীতা তাঁকে পতিরূপে চায় না। অন্য পতির ইচ্ছায় সীতা রাবণকে বরণ করেছিলেন; কেবল উপায়ান্তর না দেখে আসতে বাধ্য হয়েছেন।

অন্ত্যজ-রামায়ণে সীতাকে বনবাস দেওয়ার ইহাই কারণ। রাম প্রজার সন্তুষ্টি বিধানের জন্য সীতাকে ত্যাগ করেন নি।

অন্ত্যজ-জগতে সতীত্বের ব্যাখ্যা অন্যরূপ। এক স্বামীর ভাত খেতে খেতে অন্য স্বামীর ঘর করার ঘোষণাটাই তাদের কাছে অ-সতীত্ব নাম।

পূর্বোক্ত ঘটনায় এই রকম মনোবৃত্তির ছাপই দেখা যায়।

"যৈবুনকালে" সকলেই একটু আধটু রংয়ের খেলা করে, তাতে কারো কিছু এসে যায় না।

* * *

সীতা দেবী বাল্মিকীর তপোবনে আছেন। সেখানে কিছুদিন পর তিনি একটি পুত্র সন্তান প্রসব করলেন। দিনে দিনে ছেলেটি বড় হ'ল।

একদিন সীতা বাল্মিকীকে সন্তান রক্ষার ভার দিয়ে ফুল তুলতে গেলেন। বৃদ্ধ মুনি লবের শিয়রে ব'সে আছেন। কিছুক্ষণ পর মুনির তন্দ্রার আবেশ হ'ল। ময়ূরের কেকা রবে তাঁর তন্দ্রাভংগ হ'লে তিনি দেখলেন বিছানায় লব নেই। সীতা লবের মুখ চেয়ে রামকে ভুলে আছেন কিন্তু একি দুর্দ্দৈব! বাল্মিকী অনেক খোজ করলেন কিন্তু কোথাও লবকে পেলেন না। অগত্যা কমণ্ডলুর জল ছিটিয়ে একগাছি কুশে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করলেন। এই ছেলে হ'ল কুশ।

বারো বৎসর অতীত হ'য়ে গেল রাম অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করলেন। স্বর্ণময়ী সীতা প্রতিমার কথা পাওয়া যায় না কিন্তু লব কুশের যুদ্ধ সম্বন্ধে অনেক গান আছে।

ধরেছি যজ্ঞের ঘোড়া আমরা দুইজনে।
আমাদের গুণে হর এল তপোবনে॥
জয়পত্র দেওয়া কপালে, ধরলাম ঘোড়া বাহুবলে।
দেখবরে তোর বীরত্ব; বাণে তিনজনা হয়েছে হত
তোর অংগ ক্ষত দেখরে কত আপন নয়নে॥
আমাদের এই শিশুরণে আজ রক্ষা পাবে কেমনে।
যাবে শমন ভুবনে রক্ষা করবে কোন জনে॥

রামচন্দ্রকে লব কুশ ব'ললে, যদি শক্তি থাকে ত যুদ্ধ ক'রে ঘোড়া নিয়ে যাও। ছলে বলে ভুলিয়ে ঘোড়া নিয়ে যাওয়ার আশা ত্যাগ কর।

রামচন্দ্র কত অসহায়। ছোট দুইটা শিশুর কাছে হেরে যাওয়ার কথার জন্যই এত গানের সৃষ্টি হয়েছে। কারণ এই স্থানে অন্ত্যজ-কবি রামের পৌরুষকে অনেকখানি খর্ব করেছে। বাগে পেয়ে ভগবানের সংগে খুব একহাত খেলে নিয়েছে।

রামচন্দ্র বলছেন :

কোথাকার জংলা ছেলে জন্ম নিলে এ জংগলে।
পিতামাতার নাম জানে না তারে জারজ ছেলে বলে ॥
বললাম তোদের কেবা পিতা।
বললি নারে তার বারতা ॥
যদি তোরা মুনির ছেলে।
কিসের তরে ঘোড়া ধরলে ॥
বনে বেড়াও ফলমূল তুলে কাজ হ'বেরে পরকালে ॥
জ্ঞান নাই তোদের কাণ্ডাকাণ্ড,
আমার যজ্ঞ করলি লণ্ডভণ্ড,
তোদের মত আর পাষণ্ড মেলেনা ভূমণ্ডলে ॥

বাল্মিকী প্রত্যাবর্তন করলেন। পিতা পুত্রের যুদ্ধ মিটে গেল। রাম রাজপুরীতে সীতা ও সন্তানদের নিয়ে গেলেন। এদের সাহিত্যে লব কুশের রামায়ণ গান পাওয়া যায় না।

এবার সীতার পাতাল প্রবেশ। সীতার পাতাল প্রবেশ সম্বন্ধে যে কোন সংগীত প্রচলিত নেই তা'ত আমরা পূর্বেই বলেছি।

রামের সংগে কালপুরুষ দেখা করতে এল। নির্জন গৃহের মধ্যে কালপুরুষ রামকে সত্য করিয়ে নিলে যে—

কড়ার[১] কর রাজা কথার সময়ে।
যে আসিবে এ স্থলে বিসর্জ্জিবে তারে ॥

* * *

রাম সত্য ক'রে লক্ষ্মণকে প্রহরী নিযুক্ত করে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেন। বিধির নির্বন্ধ। এই সময়ে দুর্বাসা মুনি এসে রামের সংগে দেখা করতে চাইলেন। মুনির অভিশাপের ভয়ে, অযোধ্যাকে রোষাগ্নি হ'তে বাঁচাবার জন্য লক্ষ্মণ ঘরের মধ্যে প্রবেশ ক'রে রামের কাছে দাঁড়ালেন। কালপুরুষ চলে গেল। লক্ষ্মণ বর্জন হ'ল।

অন্ত্যজ-কবি রামের জীবন আলোচনা ক'রে সর্বদাই বলতে চায় যে তিনি স্বয়ং ভগবান নন। আমরা একটী গানে এ ভাবটি দেখতে পাই। প্রকৃত ভক্তই ভগবৎলীলার প্রতি সন্দিহান হয়।

---

১ সত্য

কি ক'রে বলব তোমায় পূর্ণব্রহ্ম সনাতন।
রাবণ এসে যোগী বেশে তোমার নারী করিল হরণ ॥
ওহে তুমি যদি স্বয়ং হ'তে তবে গাছ পাথরে সাগর বেঁধে,
বান্দরের সাথে করতে মিতে ?
ভল্লুক বানর হয় মিলন ॥
চারি সহোদর থাকতে তোরা,
তোদের বাবা কেনে বাসমরা।
তোদের বাবার কপাল পোড়া তৈল মধ্যে শয়ন ॥
তোদের বাবা মাইয়ার১ কথা শুনে
দুই ভাইকে দিলেক বনে।
কলংক বড় ত্রিভুবনে বনে কর কাল যাপন ॥
আগুনে পুড়িবি কেন পতংগের মতন ॥
যেমন ডোরা পড়েছে চিটে মাউত গুড়ে।
পরের কথায় আপনার মাথায় পথুর খোঁড়ে ॥
বিধি এই ছিল কপালে হাজার টাকার বাগান
খেলে ছাগলে ॥

* * *

বাঙলা দেশে রামায়ণের এত চর্চা থাকা সত্বেও অন্ত্যজ-জগতে পৌরুষের চর্চা নেই কেন ? এ প্রশ্ন উঠা স্বাভাবিক। আমি একজন বৃদ্ধের কাছে শুনেছি, আগে এদের "পিতে পুরুষে" রামকে বীর বলতো কিন্তু কোন এক "গুণিকে" রামের "আদ্দেশ" বলা হয় যে তিনি বীর ন'ন। সব "অদেষ্ট" তাই রাবণ "মরেছ্যাল" আর সেই থেকে রামায়ণ গানে এদের অদৃষ্ট ভীরুতার কথা জানতে পারা যায়।

পূর্বে নিশ্চয় এদের মধ্যে পৌরুষের চর্চা ছিল। পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনীর চাপে পড়ে পড়ে সব কিছু হারিয়ে ফেলে ; আর তখন হ'তেই রামায়ণ কথায় রাম তৃতীয় ব্যক্তি হয়ে দাঁড়ান। নিভৃত পল্লীর ঠাকুরমায়ের গল্পে এক একজন ভূঁয়ে ডাকাতের শৌর্য্য গাথা শুনে তাদের কলির রাম বলেই ভ্রম হয়।

এখন অদৃষ্টকে এরা অত্যন্ত বিশ্বাস করে বলেই রাম অদৃষ্টের ক্রীড়নক। আর এ বিশ্বাস করা অন্যায়ও নয়। চোখের সামনে দেখছে "বাবু" খাচ্ছে দাচ্ছে

আরাম করছে "পিতে পুরুষ" এর ধনে ; আর নিজেরা উদয়াস্ত গরুর মত খেটেও আহার্য্য সংস্থান করতে পারছে না। এদের দুঃখের কথা শুনে "বাবুরা" বলে—তোদের কপাল। সেই কথাটাকেই এরা বলে—নিখন, অদেষ্ট। এই যা, তফাৎ। কিন্তু সত্যই কি এর জন্য ললাট-লিখনই দায়ী না মানুষের হাত গড়া [illegible] ?

কপাল দেখিয়ে কে এদের ঠেকিয়ে রেখেছে.—বিধাতা না মানুষ ?

গ্রাম্য দেবতার উপাখ্যান

সত্য-সাধনায় নিঃসাড় কদাচারী বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের বীভৎস ধর্ম সাধনায় বাংলার মসি-বিবর্ণ ইতিহাসে শংকরাচার্য্যের ধর্মমত নূন-গণ্য হয়েছিল। বাঙালীর প্রাণে তা' সাড়া জাগাতে পারেনি। এই তর্ক বিতর্কের কণ্টকাকীর্ণ পথ বাংলার হিন্দুধর্মে পুনরুত্থানের আশা সফল হ'তে সাহায্য করেছিল সামান্যই। শংকরের অদ্বৈতবাদ আপামর সাধারণের বোধগম্য হওয়া আয়াসসাপেক্ষ। এ মতের শ্রেষ্ঠতা ও সৌন্দর্য্য উপলব্ধ হওয়ার মত তখন জন-মানস-প্রকৃতি সুস্থ হয়ে ওঠেনি। শুধু সেইজন্যই বাঙলার রাজা আদিশূরের কৌলিন্য প্রথা পত্তন ব্রাহ্মণ্য ধর্ম প্রবর্তনের সুযোগ সৃষ্টি করেছিল কিন্তু সাধারণের হৃদয় জয় করতে পারেনি।, রাজা লক্ষণ সেনের সময় হিন্দু আচার, প্রথা প্রভৃতি আনুষ্ঠানিক হিন্দু ধর্ম জগতের প্রতিষ্ঠা করেছিল কিন্তু জনসাধারণের দৈনন্দিন কথা-বলা-ভাষায় দেবদেবী মাহাত্ম্য ব্যাখ্যাত হ'তে সুরু না হ'লে বাঙলায় ব্রাহ্মণ্য ধর্ম প্রচার হ'ত কি না বলা কঠিন।

তাই দেখা যায়, সধর্মীগণের আলেখ নিরঞ্জনকে শূন্য পুরাণের উলুকবাহন দেবনিরঞ্জন ধর্মঠাকুররূপে। সেদিনের আবহাওয়ায় হিন্দুধর্ম, বাঙলার জনসাধারণের ধর্মে নেমে আসতে আরম্ভ করেছিল সাহিত্যের সোপান বেয়ে। তাই বৌদ্ধ প্রভাবিত ধর্মঠাকুর চিন্তাশীলদের গবেষণার বিষয়। তারপর আস্তে আস্তে পথভ্রান্ত জনসাধারণের মধ্যে ধর্মভীতি সঞ্চারিত হ'তে লাগল। নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনা বা স্বরূপে অবস্থান মানুষকে পরিতৃপ্ত করতে পারেনি; এদিকে চৈতন্যের ভক্তি ধর্মও তখন ভবিষ্যতের পথে। তাই আস্তে আস্তে মারী ও সর্পের দেবতা মনসা, শীতলা, অমংগল দূরীকরণের জন্য রোষদৃষ্টি শনিঠাকুর, মংগল আকাঙ্ক্ষায় মা মংগলচণ্ডী, শিব প্রভৃতি দেবতার পূজা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই সব দেবতার মাহাত্ম্য প্রচারমূলক সাহিত্য-ই পূজা প্রচারে হয়ে উঠেছিল বিশেষ অবলম্বন। সমাজে ব্রাহ্মণ ক্রমে ক্রমে স্থান ক'রে নিতে আরম্ভ করলো। ভয়ে ভক্তির উদ্রেকের জন্য ব্রাহ্মণের বর্ণনা সাহিত্যে তেমনিভাবে করা হ'ল।*

*বেদ করে উচ্চারণ, বের্যায় অগ্নি ঘনে ঘন, দেখিয়া সবাই কম্পমান। মনেতে পাইয়া মর্ম্ম সভে বলে রাখ ধর্ম্ম তোমা বিনা কে করে পরিত্রাণ। এইরূপে দ্বিজগণ, করে সৃষ্টি সংহারণ ই বড় হইল অবিচার। (নিরঞ্জনের রুষমা শূন্য পুরাণ)

অন্যভাবে হিন্দুধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হ'তে একদিকে যেমন বৌদ্ধধর্মের অনেক প্রথা প্রভৃতি রাখতে হ'য়েছিল, তাদের মতের কর্মফল, মায়া, অনিত্যতা, অহিংসা, মোক্ষ এই সব হিন্দুধর্মের নিজস্ব ক'রে নিতে হয়েছে। তেমনি অপরদিকে লোকধর্মকে হিন্দুধর্মসম্মত ক'রে নিতে লৌকিক দেবতাদেব অপাংক্তেয় রাখা চলেনি। তাই পুবাণে শাস্ত্রে এই সব দেবতার লীলা মাহাত্ম্য প্রক্ষিপ্ত হয়েছে। ফুল্লরা, কালকেতুর চণ্ডী, শ্রীমন্তের চণ্ডী, মহিষাসুর, শুম্ভ নিশুম্ভ, রক্তবীজ দলনকারিণী হিন্দুর দেবতা নয়, এ দেবতা বাংলার জনসাধাবণেব দেবতা কিন্তু হিন্দুধর্ম লোক-সাহিত্যের নব প্রচারিত দেবী মাহাত্ম্যে নিমগ্ন জনসাধারণকে কুক্ষিগত করবার জন্য তার গায়ে হিন্দুধর্মের টিকিট এঁটে দিয়েছে। এমনিভাবে আবও আরও দেবতা ছত্রিশ কোটীর সংখ্যা পূরণ কবেছে। তাই বাংলাব দেবতা বাঙালীর দেবতা।

এমনিভাবে পূজা প্রচাব হয়েছিল বলে এক এক সম্প্রদায় আপন আপন আবাধ্য বা আরাধ্যা'র বিশেষ স্থান কববাব জন্য অপর দেবতার মহিমা খর্ব করতে দ্বিধা করেনি। তার আবও কারণ দেশে কোন ধর্মই দৃঢ়মূল হয়নি তখন। মানুষেব শ্লথ ধর্মভাব আব বিতৃষ্ণা বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার ন্যাক্কারজনক পরিমণ্ডলে দৈব অলৌকিকতার ভীতি বিশ্বাস গঠন কবেছিল বাংলার হিন্দুধর্মে। দেশের অশিক্ষিত 'ছোট' জাত সবপ্রথম আকড়ে ধরেছিল এ ধর্মকে। যাদের মধ্যে সবাসরি পথে শংকবের শুদ্ধ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম প্রচাব ছিল অসম্ভব কল্পনা। এই সব জাতেবা যেমন দেবতাদের ভয় করতো তেমনি আবার পূজাব জন্য আকুল স্বভাব ঠাকুরের 'নিঃসহায়তায় বর্ণিত লীলা-মাহাত্ম্যে স্নেহ মমতায় ব্যাকুল হ'ত। দেবীকে কন্যা বলে ফেলতো, দেবতার দেবত্বের কথা ভুলে গিয়ে। এই মাধুর্য্য শংকবেব নির্গুণ উপাসনায় কোথায়? ব্রাহ্মণ্য ধর্ম বাংলাকে সেদিন যা' দিয়েছিল, তার শত গুণে পরিপুষ্ট হয়েছিল বাঙালীর স্বকীয়তায়। আর্য্যেতব পূজা অনুষ্ঠান এমনিভাবে হিন্দুধর্মকে মহীয়ান ক'রে তুলেছে। শ্রদ্ধেয় দীনেশ সেন মহাশয় তাঁর Folk Literature of Bengal পুস্তকে লিখেছেন: Chandi, the goddess, as daughter of a Hadi, "হাড়ির ঝি চণ্ডী মা" is a familiar line which occurs often the Colophon. We know the Hadis, in olden times, used to perform priestly functions in some of the Kali temples, and they even do so now in some parts of Bengal. (Folk Literature of Bengal ৯০-৯১ পৃষ্ঠা)

এই সব জাতিরা পূজার অধিকার পাওয়ায় এবং তাদের ধর্মভীতির আধিক্য বশতঃ লোক-দেবতার পূজার প্রচার হয় পরিপূর্ণরূপে। তাদের মায়া মমতা উদ্বেল হয়ে ওঠে দেবতার মানবোচিত সুখ দুঃখ কাতরতায়। তখনই বিশেষভাবে দেশের জনসাধারণ ধর্মের উন্মাদনায় মদির হয়ে ওঠে। দেশ সে সময় শৈব শাক্তের গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়। আপন আপন সম্প্রদায় বৃদ্ধির জন্য লীলা-মাহাত্ম্য বর্ণনার লড়াই লেগে যায়। কোন কোন উপাখ্যান শুধু দেব বা দেবী মাহাত্ম্য বর্ণনায় অলৌকিক শক্তির প্রাবল্য দেখিয়ে সাধারণকে জয় করতে রচিত হয়। কোথাও বা অন্য এক দেব ভক্তের প্রতি দেবীর জেদ হয় নিজের পূজারী করবার জন্য। চাঁদ সদাগর আজন্ম শৈব। আরাধ্যের প্রতি অটল থেকে বলে, "যে হাতেতে পূজি আমি দেব শূলপানি। কেমনে পূজিব তাতে চ্যাঙমুড়ি কানি।" ধরা-জীবনের রোগ-মৃত্যু-জরা কাতর চাঁদ আবার দেবীর পূজা করতে বাধ্য হয়। আত্মপ্রসাদ পায় মনসা দেবীর ভক্তেরা। কত শৈব শাক্ত হয়ে যায়।

লোক দেবতার পূজা প্রচারের ছড়াছড়ির দিনে এমন অনেক দেবতার পূজা প্রচলিত হয়েছিল যাদের জন্য পুরাণে প্রক্ষেপ প্রয়োজন হয়নি। কেন না সামান্য জনসমষ্টিই এ দেবতার প্রতি ঢলেছিল। এমন বহু দেবতা আছে। তা' ছাড়া আরও কতকগুলি দেবতা বিশেষ প্রভাব সমন্বিত দেবতার নামে ও লীলা-মাহাত্ম্যে নিজেদের সামান্য স্থান সংগ্রহ করে পূজা পেয়ে আসছে। বাংলাদেশের বহুস্থানে দন্তেশ্বরী—দন্তরোগ নিরাময়ের দেবতা প্রভৃতি অপৌরাণিক দেবতা ও পাথরচণ্ডী, সোনাইচণ্ডী, পায়রা'চণ্ডী, বাঘরাইচণ্ডী প্রভৃতি দেবতা চণ্ডী মায়ের আওতায় নিজেদের পূজা লোলুপতাকে গোপন করতে চেয়েছে। এর মূলে কাজ করেছে ছোট ছোট গোষ্ঠীর নিজস্ব ধর্মবিশ্বাস ও স্বমত প্রচারের প্রয়াস। রচিত হয়েছে ছোট ছোট উপাখ্যান। যদিও ধর্ম-মংগল, মনসা-মংগল, চণ্ডী-মংগলের তোড়ে তা' হয়েছে অকিঞ্চিতকর। এক এক স্থানে এই সব দেবীর পূজা হয় কোথাও বা হয় না। পূর্বে সামান্য চেষ্টা হয়েছিল। আরও অনেক দেবতা আছে যাদের নাম জানা যায় না। "Their names are unknown and non-sanskritic, and the mode of their worship is strange." (Folk Literature of Bengal ২৪৩ পৃষ্ঠা।) এই সব দেবতার প্রভাব হ্রাস করবার জন্যও উপাখ্যান সৃষ্টি হয়েছে।

কিন্তু এইসব উপাখ্যান কোন মতাবলম্বীদের প্রতি আঘাত হানেনি; তা'ও দেখা যায়। অনেকগুলি সামান্য স্বার্থ রক্ষার তাগিদেই রচিত হয়েছিল।

স্থানীয় কোন শক্তি দেবতার প্রভাব অটুট রাখতে অন্য শক্তি দেবতার মাহাত্ম্য খর্ব করে উপাখ্যান লিখিত হয়েছে।

কোথাও বা কল্পিত দেবতার পরাজয়ের কথা বর্ণনা ক'রেও দেবী-মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে। পল্লী অঞ্চলে এমন উপাখ্যান শুনতে পাওয়া যায় আজও। যে ধারায় ব্রাহ্মণ্য ধর্ম এদেশে স্বত্ব সাব্যস্ত করেছিল ঠিক সেই তাদেরই এক এক দেব বা দেবী পূজা প্রাপ্তির মৌরসী পাট্টা দাখিল ক'রে বসে আছে।

এই সব উপাখ্যান সংগৃহীত হ'লে দেবতার কে কি রকম জন সমর্থন ও ভক্তি ছিল তা' জানতে পারা যায়। তাদের স্বার্থও এইসব উপাখ্যান রচনায় প্রণোদিত করতো—এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। কাহিনী-কবিতায় এই লীলা মাহাত্ম্যে স্বার্থ-দুষ্ট লোকের উদ্দেশ্যও আছে। লোকমুখে এক কাহিনী আজও অশিক্ষিত পল্লীবাসীর ধর্মভাব উদ্রেক করে। গান ক'রে গাইবার কোন রীতি এ গানের ছিল না বলে অনুমিত হয়, কেন না এক এক স্থানের স্থানীয় দেব-মাহাত্ম্য সাধারণ্যে অটুট রাখতে অল্প লোকের মাঝে এ সব প্রচারিত হ'ত। এই গানগুলির ভাষা আধুনিকতা গন্ধী।

আগরের * থেকে খানিক দূরে শ্যাওড়া ঝোপে মা সর্বমংগলা পূজা নেবার জন্য বদ্ধ পরিকর হ'ল। সাধারণে কে শোনে কথা? মা স্বপ্ন দিলো গ্রামের ব্রাহ্মণদের। তারা হ'ল গররাজী, কেন না আগরের মা ব্যতিরেকে ব্রাহ্মণরা আর কোন দেবতাকে জানে না; মানে না। সর্বমংগলা মা দাসদের রমণকে স্বপ্ন দিল কিন্তু সেও করজোড়ে দেবীকে মিনতি করলো, তার পূজা দিতে পারবে না বলে—কেন না সর্বমংগলা মাকে কেউ জানে না।

যদি আছ মা আছ তুমি থাক নিজ ধামে।
মানুষের দু.খ দেখতে এসো না গেরামে॥

এমনিভাবে বাজে কথা বলে সে সরে পড়ে। মায়ের ব্যাকুলতা বেড়ে যায় মর্ত্যে পূজা প্রাপ্তির আকাংখায়।

ধনেশ্বর রায়কে মা স্বপ্ন দিল। সে তো কিছুতেই রাজী হ'ল না। বললো,

সর্ব মংগলা তুমি সব মংগল হলে।
ধনে পুতে মেতে সবে তোমারে যাবে ভুলে।

এই সব নানা কথা বলে সেও গররাজী হ'ল।

* বীরভূম জেলার একটি গ্রাম।

তখন গ্রামে সাত কলসী সোণার আর সাত কলসী রূপার মোহর আর টাকা সোণার শিকলে বাঁধা হয়ে নিশুত্ রাতে গ্রামের মাঝে মাঝে ঝম্ ঝম্ ক'রে বেড়াতে থাকে। যে সর্বমংগলা মায়ের পূজা করবে সেই পাবে অতুল ঐশ্বর্য্য! দুপুর রাতে এলো-চুলে সৌরভী বাগ্দিনী ধরতে গিয়েছিল সেই কলসী। মা সর্বমংগলা পূজা পাওয়ার জন্য ব্যাকুল তখন, তাই সেই অর্থ সৌরভীর ঘরে হাজির হ'ল। কিন্তু প্রাতঃকালে সৌরভী দেখলো, কলসীগুলো সব মাটির হয়ে গেছে আর কলসীর ভেতর ছাই ভর্তি আছে। রাত্রের বেলা স্বপ্ন দেখলো, গ্রামের মোড়ল যেন মনসা দেবীর বরে পাওয়া সেই টাকাগুলি মায়ের আদেশে ছাই ক'রে দিয়েছে মন্ত্র দ্বারা।

তবুও সর্বমংগলা মা বললো,

সর্বমংগল হবে যে মোরে পূজিবে।
দশা কেটে গেলে পরে ছাই সোণা হবে॥

দেবতার সব কথা সকলে শোনে। কেউ বলে, আজ আমায় স্বপ্ন হয়েছে। এমনিভাবে একটা হৈ হৈ চলে। তবে মনসার দেবাংসী যে কুপিত হয়েছে তাও জানতে কারো বাকী থাকে না।

সৌরভী বাগ্দিনীর কিন্তু টাকার লোভ ছিল অত্যন্ত। তাই সে ছাই আবার সোণা হবে জেনে মায়ের পূজা করতে প্রস্তুত হয়। তখন দেবী স্বপ্নাদেশ দিল:

শল্লা পখুরেতে আমি হবো অদিষ্টান।
ধান দুর্বো গুয়ো পান সবে দিবি দান॥
হাটু জলে ডুব দিবি মোর নাম করি।
তোর হাতে লেগে আমি উঠিব উপরি॥

সে এক মংগলবারের প্রত্যুষ। শল্লা পুষ্করিণীতে লোকে লোকারণ্য। ঢাকঢোলের অশ্রান্ত বাজনা। গভীর জলে রক্ত-কহ্লারের পাশে ঘূর্ণী অবিরাম ঘুরছে।

কিন্তু তিনটি কালো সাপের মতো জীব সমস্ত পুকুরে হঠাৎ খেলে বেড়াতে লাগলো। সৌরভী আর পুকুরে নামতে সাহস করলো না। লোকে বললে, আগরের মায়ের বারণ আছে। এই এলাকাতে আর কে থাকতে পারে!

এই সব কবিতা-কথা সন্ধান করলে জানা যায়, বাঙলার ধর্ম জগতের মধ্যে এমন একটা লৌকিক জগত রয়েছে যা' শাস্ত্র বর্হিভূর্ত কিন্তু শত শাস্ত্র

অধীত জ্ঞানমার্গীর যে বিশ্বাস অর্জনের সাধনা অসম্পূর্ণ থেকে যায় তা' সাধারণের মধ্যে স্বভাবের বসে জন্মে থাকে। সেখানে তর্ক, যুক্তি, বাদ-প্রতিবাদের তিক্ততায় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠে না দশদিক। এই বিশ্বাসই তাদের দৈনন্দিন জীবনের সুষমা শত অভাব অশান্তিতেও পরিপূর্ণ রাখে। এই বিশ্বাসই তাদের সৎ হ'তে প্রবুদ্ধ করে; অন্ধকার থেকে আলোকের পথে নিয়ে যায়।

রাজা রামের শাক্ত সাহিত্য

মা নামের মধ্যে যে যাদু আছে, আছে যে মধুরতা, প্রাণ-মন-মাতানো আকুল সুর, তাইতো তার মধ্যে লুকিয়ে ছিল বিশাল সাহিত্য সম্ভাবনা। এই মা নামকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে ভাব-বন্যার জোয়ার বয়ে গেছে—রচিত হয়েছে কত কাব্য, কত গাথা, গান,—শুধুমাত্র মানুষের মা নামের পরিপূর্ণ সার্থকতায় অতি প্রাচীনকাল হতেই এই সাহিত্য প্রচলিত। তারপর সংস্কৃতির সোপান বেয়ে, তন্ত্রের যুগ অতিক্রম করে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, বরাহ পুরাণ, দেবী ভাগবত, মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত চণ্ডী প্রভৃতি হ'তে রস সংগ্রহ ক'রে এই সাহিত্য পত্র-পল্লবে মহামহীরুহের আকার ধারণ করে। কিন্তু সবার উপরে কবিকংকণ মুকুন্দ রামের ও ভারতচন্দ্রের আখ্যান বহু লোকের দ্বারা পঠিত ও গীত হ'য়ে এসেছে। তারপর রামপ্রসাদের প্রাণ-মন আকুল করা মাতৃ-সংগীতে দশদিক মুখরিত হয়েছে। তাই তো এ সাহিত্য বাংলারই নিজস্ব। এ গানে বাংলার মূলগত ভাবের এমন স্বতঃ প্রকাশ পরিলক্ষিত হয় যে, যেন এ গান বাংলাদেশের মর্মমূল থেকে উত্থিত। তাই শত বাধা বিপত্তি, অর্থনৈতিক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও আজও এর উৎসমুখ শুকিয়ে যায়নি। মাতৃমন্ত্রের সোণার কাঠির পরশে সবই সম্ভব।

দেবী রাজরাজেশ্বরী। এই দেবীকে নিয়ে সাহিত্য রচিত হয়েছে; কিন্তু তা' বাঙালীর প্রাণ মাতানো গান হয়নি। তাতে সাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি হয়েছে; ভক্তসাধারণ মাহাত্ম্য কথা শুনে উদ্দেশ্যে প্রণাম করেছে—শক্তিশালিনী, ঐশ্বর্য্যশালিনী মাকে। কিন্তু যে গানে বাঙালীর মন ডুবে গেছে, মুখর হয়ে উঠেছে যে মায়ের কথা বলতে, সে মা রাজরাজেশ্বরী হয়েও ভিখারীর ঘরণী—পুত্র কন্যার জননী; তাদেরই চিন্তায় ব্যাকুল! স্বামী ছন্নছাড়া, উদাসীন। শ্মশানে, মশানে ঘুরে বেড়ায়। বস্ত্রাভাবে প্রায় দিগম্বর। কি ভাবের ঘোরে পড়ে থাকে। আচ্ছা দু'কথা শুনিয়ে দিলেও রাগ করে না। ঘরে আজ খেতে কাল নেই। মা তো ভাবনায় দিনরাত উন্মনা। অসহিষ্ণু হয়ে কখনও কখনও ঝগড়া করে.; সব ছেড়ে দিয়ে বাপের বাড়ী চলে যাবার কথায় শাসিয়ে দেয় স্বামীর উপর তাপ ক'রে। হরের সম্বিত ফেরে। মায়ের বাপের বাড়ী

যাবার কথায় সে কখনও সংসারে মন দেবার ব্যর্থ প্রয়াসে নিজেই হাস্যাস্পদ হয়। এই মা-ই শাক্ত সাহিত্যে প্রাণ-চাঞ্চল্য জাগিয়েছে। যেদিন হতে বাঙালী শক্তিচর্চা ভুলে গেছে, সেদিন হ'তেই এই মাকে দেখেছে দশপ্রহরণ ধারিণীর সর্বৈশ্বর্য্য বিস্মৃত হয়ে। তা' ছাড়া এই মা যে বাঙালী ঘরের কন্যা। পরিপার্শ্বিকের পাল্লায় পড়ে অমন আলো করা রূপ তাঁর ভিখারী স্বামীর ঔদাসীন্যে মলিন হয়ে গেছে। গরীবের হাতে পড়ে যেন তাঁর সব আশা অপূর্ণ থেকে গেছে। কিন্তু তবুও স্বামীগর্বে মা আত্মহারা। স্বামী নিন্দা শুনে ধরাকে রসাতলে দিতে তিনি প্রলয়ংকরী হয়ে ওঠেন। সাহিত্যিকের কল্পনায় এত শক্তি কোথায় ছিল—এ যে এ দেশেরই নারীর বৈশিষ্ট্য। ভক্তি রসের অবলম্বনে এই সব কল্পনাসুলভ চিত্রে চিত্রে সাহিত্যে মাতৃমহিমা পরিব্যাপ্ত। আর এই ভক্তি মদিরায় উন্মাদ সন্তানের মা নাম করতে কণ্ঠ তার কোনদিন স্বর বিহীন হয়ে যাবে না।

এ সাহিত্যে কোনদিন গতি মন্থর হবে না। রাজরাজেশ্বরী মাকে দীন সন্তান ভুলে থাকতে অবশ্যই পারে। কিন্তু যে মা করুণ চোখে সন্তানের উপর ভরসা ক'রে আছে, তাকে ভোলা যায় কি করে? এ যে সেই মা, বাঙালীর একলার।

এ মায়ের জন্য চিন্তা করতে হবে সব সন্তানকে। এই তো সার্থক পূজা। এখানেই ত প্রাণের সাড়া পাওয়া যায়। কোন ব্যবধান না রেখে সন্তান আবার মায়ের কোলে নিজেকে এলিয়ে দেয়। বারে বারে শাক্ত-সাহিত্যে বিশেষ ক'রে এ মায়ের ছবিই অংকিত হয়েছে। আর অলৌকিক শক্তি-শালিনী মাকে দূর থেকে প্রণাম করেছে ভক্ত; ভীতি ভক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে, হৃদয়ের গোপন স্তর হ'তে উচ্ছলিত হয়নি। ঐ ভক্তিই মাতৃভক্তি, দেবভক্তির শীর্ষচূড়া অবলম্বন করে রেখেছে। "ঐশ্বর্য্য-মিশ্রা হইয়াও অবসানে নাম রূপাতীত অদ্বৈত" (কাব্যালোক) এই শাক্ত-শক্তি জগতে অপূর্ব। বিশেষ করে শাক্ত সাহিত্যের এই মূল সুর অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যেই আত্মপ্রকাশ করে। তৎপূর্বে দেবীর ভয়ংকরতার; তাঁকে উপেক্ষা করলে দুঃখ ও বিপদ-আশংকা আছে—এ কথাই কাহিনী-মূলক মংগল-কাব্যে বর্ণিত হ'ত।

শাক্ত সাহিত্যে আর একটি বিষয় লক্ষণীয়। কোথাও কামনাময় ভক্তি আশ্রিত মাতৃভাব আবার কোথাও তা' ভক্ত হৃদয়ের মধ্যে পরিম্লান হয়ে গেছে। পূর্বালোকিত মাতৃ-রূপ বর্ণনার মধ্যে এর যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায়। মাকে রাজরাজেশ্বরী ভাবলে মন কামনায় উথলে ওঠে। ও যে সাধকের অন্তরায়

সৃষ্টি করে কিন্তু মা রাজরাজেশ্বরী না হ'লে সকাম ভক্তির স্তরে না আসতে পারলে চূড়ান্ত নিষ্কামনাময় হওয়া যায় না; তাইতো মা রাজরাজেশ্বরী হয়েও দীন।

বাঙলার পথে ঘাটে এই মা নামের ছড়াছড়ি। শয়নে মাতৃনাম, যাত্রার সময় মাতৃনাম, বিপদে মাতৃনাম—মানুষের জীবনে ওতঃপ্রোত জড়িয়ে আছে। ঝঞ্ঝা-সংকুল জীবনের এ কি কম ভরসা। কার আছে এই শক্তি মানুষকে সান্ত্বনা দিতে; সংসার সমুদ্রে হাল ছাড়া পাল ছেঁড়া মাঝির মত অবস্থা হ'তে নির্ভাবনায় কুল পাওয়ার ভরসা করতে? একমাত্র মাতৃনামই সম্বল সব কিছুতে। তাই বাঙালীর কণ্ঠ হ'তে এত গান জাগে। চরম দিনে মায়ের কাছে যাওয়াতে আনন্দ আছে বলে তাও কামনা করে না সন্তান—ঐশ্বর্য্যও চায় না, ভক্তিও চায় না, চায় শুধু মা বলবার ক্ষীণ কণ্ঠস্বর। এত গানের দেশে ত বহু গান লুপ্ত হ'তে চলেছে আজ এই বিংশ শতাব্দীর পাপ-ক্লিন্ন আবহাওয়ায়। কিন্তু তবুও বহু জাতি তাদের কৌলিক-বৃত্তি গৌরবে এখনও অনেক গান মুখে মুখে বাঁচিয়ে রেখেছে। বর্ধমান জেলার কলীনামক জাতির মুখে অনেক শাক্ত সংগীত শুনতে পাওয়া যায়। এই শাক্ত-সাহিত্য বড় ব্রতের গান নামে প্রচলিত। ব্রতানুষ্ঠানে সাধারণের ভক্তি উদ্রেক মানসে এই গান মন্দিরা সাহায্যে গীত হয়। ভক্তি-আনত শিরে শোনে পল্লীবাসী। মাতৃ-মাহাত্ম্যের প্রচার হয়; লোকশিক্ষার প্রসার হয়।

এই গানের রচয়িতা কবি রাজারাম। তাঁকে বৈষ্ণব সাহিত্যের আসরেও দেখা যায়। তাঁর রচিত অনেক বৈষ্ণব সাহিত্য আছে। (বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস; শ্রীসুকুমার সেন—১ম খণ্ড) তাঁর রচিত বহু শাক্ত সংগীতের সন্ধান পাওয়া যায়। এই গানের ভাষা সুললিত, ছন্দ মনোরম আর এই সংগীতের রচনায় কোন কষ্ট কল্পনার স্থান নেই। কবি আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে যে ভাবলোক সৃষ্টি করছেন তা' অপূর্ব। ছোট ছোট অনেক পালা ও খণ্ডিত পালার সন্ধান পাওয়া যায়। তার সবই পুরাণ বা যে কোন শাস্ত্র বর্ণিত দেবী মাহাত্ম্যকে নিয়ে লিখিত। উপাখ্যানও অপ্রতুল নয়। তাঁর রচিত অনেক পদাবলীর সন্ধানও পাওয়া যায়। এ গানের পুঁথির কয়েক পৃষ্ঠার সন্ধানও মিলে।

বিবাহের পালা

বরবেশে গিরির ভবনে শূলপাণি।
চল চল অবিলম্বে আনিতে ভবানি॥

আমার বচন ধর হরিদ্রা বসন ধর
ডম্বুর ত্যজিয়া পর বলয় করে।
হাড় মালা ত্যজিয়া পর মণিময় হারে॥
ভুবন মোহন কিবা রতিপতি মনলোভা,
অংগাদিতে অতি শোভা শিরেতে মুকুটমণি।
বরণ করিবে রাজা বরণ করিবে তখনি॥
ধন্য ধন্য মানে যেন এ তিন সংসার
বসিবে যেন এ কার সংগে নবীনা কামিনী॥
ভূতের অক্রীতি (?) মায়া হইবে তখনি॥

এত সাধ্যসাধনা সত্বেও হর বেশবিলাসের কথা শুনলে না। নির্বিকার চিরাচরিত রইল। সখিগন মুখঝামটা দেয়। লজ্জা করে তাদের শিরের রূপ আর ভাব ভংগী দেখে। বলে—

ওমা ছি ছি লাজে মরি দেখে হাসি পায়।
কটিতে ছিল অম্বর খসে পড়ে বাঘাম্বর,
উলংগ হইল হর, নিকটে কে যায়॥
সর্বাংগে ভুজংগের মালা নাচিছে যত ভূতের মেলা
ফেলায়ে বরণের ডালা যত রমণী পালায়॥

বিবাহের পর হরের বামে হর-ঘরণী বসেছে:

হরের মনমোহিতে বামে বসে শংকরী।
চরণ পংকজ রাজে মুখ চন্দ্র সুবিরাজে,
মা আমার রাজরাজেশ্বরী॥
মৃণাল সমান ভুজে বলয়া কংকন বাজে,
মলিন হইল দিগ্‌রাজে শ্রীঅংগ হেরি।
দন্তরুচি ঝলমল, জিনিয়া বান্ধুলি ফুল,
ও মুখ মণ্ডল শোভা নত বিজুরী॥

ভুবন মোহিনী মায়ের রূপ বর্ণনায় বিবাহকালে কবি অকৃপণভাবে মনোমত কথা খুঁজে খুঁজে সাজিয়েছেন। আর তার পূর্বে হরের ভস্ম-ঢাকা রূপ মনোহর করতে তার ঔদাস্যের কথা বলে বেদনা মদির আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছেন, তাতে যে ট্রাজেডির সুর ধ্বনিত হয়ে ওঠে তা' উপভোগ্য হলেও মনে একটা কিসের সুস্পষ্ট দাগ কেটে দেয়।

এই ট্রাজেডি আবার রমণীর কৌতুকে আরও আবর্ত-সংকুল হয়ে ওঠে।

যত রমনী কৌতুকে যৌতুক দেয় কত মণি।
রজত-কাঞ্চন প্রমাণ দেয় যত শৈলমনি ॥
রত্ন দিল যত্ন করি রত্নাকর যার আজ্ঞাকারী
কুবের যার আছে ভাণ্ডারী, যার মণি চিন্তামণি ॥
দিতে হয় কি রথরথি বিশ্বেতে যাহার গতি,
রাজারাম কয় পশুপতির চরণ বিনে না জানি ॥

কবি সান্তনার উপায় ঠিক করেন। হরের কিছুরই অভাব নেই। কিন্তু কৈ কুলরমণীরা তা' মানে না। দীনতা ত ঢাকা পড়ে না, শৈলরাণী গিরিন্দ্রানীর বুকে কিন্তু শেল বাজে।

দক্ষযজ্ঞ

দক্ষযজ্ঞ সম্বন্ধে অনেক পদ পাওয়া যায়। দুই একটা উদ্ধৃত করলে দেখা যায় যে, এখানে কবি গতানুগতিক পথে না গিয়ে গানের আকারে ঘটনা সম্বন্ধ করেছেন।

কর যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ আরম্ভন।
দক্ষ দজ্ঞ কর আরাধন ॥
যজ্ঞের বারতা দিতে নারদে পাঠায় ॥
যথাযথ স্থানে যেন করে নিমন্ত্রণ ॥
যদি জাগে যোগেতে যোগীর সাধনে,
সে ধনে যে করে সাধন ॥
সর্ব যজ্ঞ অধিকারী সর্ব যজ্ঞ মায়াহারী,
তার কৃপায় যাগযজ্ঞ হয় সমাপণ ॥
ছিল প্রলয় কালেতে আ-লয় সলিলে
সে লীলা জানে কোন্ জন।
আপন ইচ্ছায় হরি পৃথিবী সৃজন করি,
ইন্দ্র, চন্দ্র, রবি যম করিল সৃজন ॥

ওহে দক্ষ আমার বাক্য কর অবধান।
বেদ বিধি মতে কর যজ্ঞের বিধান ॥

নিমন্ত্রিতে দেবগণে স্বর্গ, মর্ত্য, ত্রিভূবনে,
বাকী কেবল ত্রিলোচনে করিতে সম্মান ॥
মদমত্ত অহংকারে তোমারে চিনিতে নারে,
দেব সভা মধ্যে হর না করে প্রণাম ॥
তুমি দক্ষ প্রজাপতি মান্য রাখ প্রজা অতি
নৃপতির অগ্রগতি মনের প্রধান ॥

কিন্তু এত কথায়ও দক্ষের মন টলল না। ভবিতব্য বলবান। যা' ঘটবে তা' লিপিবদ্ধ হয়ে আছে, নতুবা জগতে কিছুই পরে অঘটনীয় আশ্চর্য্য থাকে না। তাই হরবিহীন যজ্ঞও সম্ভব হ'ল।
হরের এ অপমান কথা গৌরী শুনল।

যায় যাবে প্রাণ কি সম্মান কর আজ্ঞাদান।
আমি আজ থাকতে কাছে হরের এত অপমান
সৃষ্টি লয় কটাক্ষেতে যে করে প্রলয়।
সে হরের কি মান্য হরে এ কি এ প্রাণে সহে,
করেন সমুদ্র মন্থন ॥
তাহে বিষ উপজন সুরাসুরে কম্পমান।
দুহাতে করিলেন পান।

* * * *

এই যজ্ঞে স্বামীর প্রতি ভালবাসার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে সতী প্রাণত্যাগ করল।

রাজারামের তত্ত্ব সম্বন্ধীয় পদাবলী অতীব সুন্দর। ভাবের সৌকর্য্যে, ভাষার কারুকারিতায় এই পদগুলি শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে। যোগী সাধকের অনুভূতি দিয়ে রচনা করা এই সংগীত।

আমার মুলাধারে কুণ্ডলিনী।
নিরালম্বে দোলে হৃদি শতদলে
সহস্রারে খেলে দিবস রজনী ॥
নাসার নিশ্বাস প্রলয় পবন,
নয়না সঘনা বিকট দশন ;
তম বিনাশিতে তিমির বরণ,
ত্রিতাপে নাশিতে অসি ধারিনী ॥

ধরিয়া সুশিখা ইড়া আর পিংগলা
কটিতে কিংকিনী গলে মুণ্ডমালা।
পঞ্চ আত্মা সহ স্বভাব উতলা॥
ছয় রিপু বিনাশিনী॥
ভক্তি লাল জবা স্নেহ নিবেদন।
এ দেহ জীবনের যোগ্য পাত্রের জন;
কুমতি নাশিতে সগুণে চঞ্চল,
রাজারামের প্রতি গতি দায়িনী॥

আগমণী বিষয়ক অনেক পদ পাওয়া যায়। এই গানে মাতৃ-হৃদয়ের ভাব উচ্ছলিয়া ওঠে।

যাও গিরিবর কৈলাস শিখর আনিতে আমার গৌরীরে।
গৌরী কত অভিমান, হয়ে ম্রিয়মান, কয়ে পাঠাইছে নারদেরে॥
বিবাগী জামাতা দেব কৃত্তীবাস, বাস ছাড়ি করে শ্মশানেতে বাস।
বুঝাবে নিষেধ না করে।
সুন্দরী কুমারী কুপাত্র ঈশানে, পাষাণী হয়ে বুক বেঁধেছি পাষাণে।
তাই ভাবি মনে হর জনম ভিখারীরে।
সেই দুখে মরি রাজকুমারী আমার ভিখারী ঘরে।
অবিলম্বে যাও বিলম্ব না করি।
শংকরী বিহনে অন্ধকার পুরী॥
শূন্যময় হেরে।
রাজারামের বাণী, শুন শৈলমণি,
গৌরী আনি জুড়াও মেনকারে॥

রাজারামের এই গানগুলি হেয় নয়, তবে লোকমুখে প্রচলিত থেকে বহু গানের পাঠ বিকৃতি ও ছন্দের গোলমাল হয়েছে। রাজারাম বৈষ্ণব কবি হিসাবে সুবিদিত। তাঁর শাক্ত সাহিত্যের সন্ধান যখন পাওয়া গেছে, তখন মনে হয় তাঁর আরও অনেক সাহিত্য সৃষ্টি উদ্ধারের প্রতীক্ষায় আছে। এই সব সাহিত্য উদ্ধারের জন্য আগুয়ান হয়ে আসতে হবে। তা' না হলে দেশের সাহিত্য নিয়ে আনন্দ করবার অনেক কিছু থাকলেও প্রকৃত ইতিহাস রচনার বেলায় কোথায় যেন অস্বস্তি থেকে যাবে।

রাজারামের শাক্ত সাহিত্য

(দুই)

ভারতে ত্যাগই সনাতন ধর্ম। কত পণ্ডিতের পদানুসরণে মানুষ বার বার এই ত্যাগের শিক্ষাই পেয়েছে। তাই বাংলার মাটিতে হয়েছে চাঁদের উদয়। রিক্তা ধরিত্রীর বুকে প্রেমাশ্রুবন্যার উজান বয়ে গেছে। গানের আকুলতায় মানুষ ঘর ছেড়েছে; স্ত্রী, পুত্র, কন্যা সকলকে পরিত্যাগ করে গৌর তনুকে করেছে অনুসরণ। ভোগের মধ্যে ভোগ বিবর্তি—এ দেশের অপর ধর্মমত। এই মত-প্রভাবে বাংলাদেশে তান্ত্রিক সাধনা পত্র-পল্লব বিস্তার করে। কিন্তু সম্প্রদায়ের মধ্যে উৎকট তান্ত্রিক যারা তারা সাধারণের নিকট গুপ্ত থাকতে চেষ্টা করেছে এবং তাদের সাধনার বিবর্তন পথে ভ্রষ্টাচরিত যোগ প্রক্রিয়ার মধ্যে সাহিত্যের উপাদানের একান্ত অভাবে এই পথ পদস্খলিতের নারকীয় ব্যাভিচারে রূপান্তরিত হয়ে এ ধারার বহুল ধ্বংস সাধন করেছে। এই ধর্মের ভিতর মা ও কন্যা সম্পর্ক নিয়ে বাঙালীর ভাব প্রবণতার মাধুরী মিশিয়ে গড়ে উঠেছে মধুর শাক্ত সম্প্রদায়; মা ও সন্তানকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে বিশাল সাহিত্য।

বৈষ্ণব ধর্মের মত শাক্ত ধর্মের পিছনেও বিরাট সাহিত্য রয়েছে। সাধক সাধন মার্গে যতই অগ্রসর হয়েছে ততই অনির্বচনীয় রসাস্বাদের স্বরূপ প্রকাশ করতে ক্রমশঃ নির্বাক হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও শতবাক্ হবার চেষ্টার ত্রুটি করেনি। এমনি করে এক একটা ধর্মকে বা ধর্ম সাম্প্রদায়কে কেন্দ্র করে বিশাল সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব হয়েছিল; তাই যুগপৎ ধর্ম প্রচার ও সাহিত্য ভাণ্ডার সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে গেছে। আর তখন প্রচারের অন্য কোন পথ না থাকায় সাহিত্যের সাহায্যই ছিল একান্ত অবলম্বনীয়। কিন্তু পুস্তকাকারে প্রচারের পথ ছিল কষ্টসাধ্য। যন্ত্র-পূর্ব যুগের সাহিত্য তাই আবালবৃদ্ধবণিতার কাছে নিজস্ব আবেদন পৌঁছে দিত সামান্যই। তা'ছাড়া আক্ষরিক জ্ঞানশূন্য লোক সর্বযুগেই অল্পবিস্তর আছে। তাই একটু অনুধাবন করলেই দেখা যায় সে যুগে এক এক দেবদেবীর মাহাত্ম্য প্রচারের মুখপাত্র হিসাবে বিশেষ বিশেষ সংগীতজ্ঞ জাতির উপর ভার পড়ত। পরন্তু ধর্মপ্রচার ও সাহিত্যের প্রসার সম্ভবপর হয়ে তাদের জীবিকার্জনের পথ প্রশস্ত করেছিল। এই প্রচার আবার নানারকমের ছিল। কোথাও গোপীযন্ত্র হাতে বিহ্বল সন্ন্যাসী শান্ত পল্লীর মাটির কুঁড়ে ঘরের প্রত্যেক

দুয়ারে দুয়ারে প্রাণ মাতানো গানের মোহময় আবেশে পল্লীর বাতাসকে উদাস করে তুলত। পল্লীবৃদ্ধ অবিরল ধারায় কেঁদে চক্ষু ভাসাত। লজ্জাবনতা বাড়ীর বধূ গলায় আঁচল দিয়ে তাঁর উদ্দেশ্যে প্রণাম করত প্রাণ মন সমর্পণ করে। তাইতো সংসারধর্ম পালন করত তারা দেবতাকে সম্মুখে রেখে। স্ত্রী স্বামীকে, স্বামী স্ত্রীকে, ভোগ ও নশ্বর ভালবাসার চোখে দেখতো না; ইষ্ট প্রেমের আস্বাদন পেত এই ভালবাসার মধ্যে। তারপর প্রত্যেক পূজাকে কেন্দ্র করে এক এক সংগীত ধারা উচ্ছল গতিপথে অগ্রসর হ'ত। ধর্মচরিত্রের পরিচয় করে দিতে গান রচনার রীতি ছিল। কথা কাটাকাটির মধ্যে প্রচার-সাহিত্য রচিত করত কবিগণ। পূজার আসরে অপরিহার্য্য সংগীতানুষ্ঠানের রীতিই মংগল-কাব্যে রূপ নেয় বিশেষভাবে। মংগল হবার প্রলোভনে, এই মানবীয় দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে এক এক ধর্ম সম্প্রদায় আপন আপন ধর্মের মাহাত্ম্য কীর্তন ও আপন আপন ধর্মের সারবত্তা সপ্রমাণ করে নিজেদের সম্প্রদায়ের কলেবর বৃদ্ধি করত।

শাক্ত ধর্মও বহু প্রাচীনকাল হতেই মাহাত্ম্য প্রচারমূলক মংগল-কাব্যের দ্বারা সাধারণ্যে প্রচারিত হয়েছিল। "জান ন'রে মন পরম কারণ" (রামপ্রসাদ)—এই আত্মজিজ্ঞাসার উদগ্র কৌতূহলেই শাক্ত সাহিত্যের সূত্রপাত।

"জগত মাতৃত্ব ও জগত পিতৃত্ব এই উভয় শক্তি-সমন্বিত সপ্রকাশ চৈতন্য সমুদ্রের নামই পরম কারণ।" মাতৃত্ব শক্তির আশ্রয় নিয়ে এই চিন্ময় মহাশক্তিকে জানবার আকুতিতেই তাঁকে কালী, দুর্গা, তারা নামে ভক্তকে ডুকরে কাঁদবার একটা উপায় বলে দিয়েছে। পরম কারণের সন্ধান পথে এমনিভাবে কাঁদতে কাঁদতে চোখের কান্নায় ও মনের কান্নায় একাকার হয়ে ভাবরসের বন্যায় ভাবময়ী ভেসে এসেছে ভক্তের হৃদকমলে। এদেশে কি বৈষ্ণব, কি শাক্ত—যে কোন সাহিত্যেই দেখি এই ভাব সাধনায় সিদ্ধ হবার ব্যাকুল কাকুতি। হৃদয়ের উন্মাদনায় শাক্ত কবি দেবীমাহাত্ম্য প্রচার মানসে শক্তি লীলা বর্ণনা করেছেন, কোথাও পৌরাণিক ইতিবৃত্ত আপনার ভক্তি মদির হৃদয়ের কল্পনা ও শব্দ চয়নে সুর লহরীর ঝংকারে সাহিত্যের মাদকতায়; আবার কোথাও পূর্ব প্রচলিত কাল্পনিক দেবীকে গানের আকারে সুললিত ক'রে। কাব্যে দেবীকে কোথাও করাল বদনী ভয়ংকরীরূপে আবার কোথাও সুস্মিতা জননীরূপে দেখা যায়। এই মংগল গানে দেবীর অলৌকিক শক্তি মাহাত্ম্য শ্রবণে সাধারণ্যে ভয়ের সঞ্চার হয়েছে আর এই ভীতি ভক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে ভাবরসের উৎসমুখ খুলে দিতে

প্রথম পদবিক্ষেপে সোপান প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণের চণ্ডী, সপ্তশতী অবলম্বনে লেখা "চণ্ডীকাবিজয়" হ'তে বিদ্যাসুন্দরের পার্থিব প্রেমের কাহিনীকে নিয়ে লেখা 'কালিকা মংগলে'র মধ্যে একই মূল সুর ধ্বনিত। কিন্তু অন্য লোকের দেবীকে মা ও মেয়ে বলে সংসারের মায়ার শিকলে বাঁধার দাবী করতে আরম্ভ করায় শাক্ত-সাহিত্যের মধ্যেও বিশেষ প্রাণ স্পন্দন জেগে ওঠে। মানুষের প্রকৃতি সুলভ মাতৃভক্তি ও সন্তান বাৎসল্যের অগাধ প্রেরণায় নিত্য নতুন ভাবময় সাহিত্য সৃষ্টি হতে আরম্ভ হয়। এই সময় বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রভাবে অনুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়ে থাকে নতুনতর সাহিত্য সম্ভাবনায়।

প্রেমের সোণার কাঠির পরশে বর্ণনামূলক আখ্যান কাব্যের ধারা অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত একইভাবে প্রবাহিত হ'তে হ'তে বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাবে দু'ধারা হয়ে গেল। বর্ণনামূলক দেবীমাহাত্ম্য ও প্রেমময় গীতি কবিতায়, বাঙলার আকাশ বাতাস হ'ল মুখরিত। দ্বিজ কালিদাস, দ্বিজ রামচন্দ্র, রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্র প্রভৃতি প্রথমোক্ত ধারার কবি আর রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত দাশরথি রায়, নীলুঠাকুর, নিধুবাবু, রাম বসু, কালী মির্জা, শ্রীধর কথক প্রভৃতি দ্বিতীয় ধারা সঞ্জীবিত রাখতে লেখনী ধারণ করেন। রামপ্রসাদের সাহিত্য সাধনায় এই দুই ধারার পূত সংগম সত্ত্বেও গীতিমূলক পদাবলী রচয়িতা হিসাবে তিনি অবিসম্বাদিত শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন কিন্তু আখ্যায়িকা রচনায় দেবীমাহাত্ম্য প্রচারে তাঁর দান কম নয়। রামপ্রসাদের মতই আমাদের এই শাক্ত কবি রাজারামও ঘটনাপরম্পরায় লীলামাহাত্ম্য বর্ণনা করার সাথে সাথে বৈষ্ণব সাহিত্যের মত শাক্ত পদাবলী রচনা করে গেছেন। দু'ধারার গানেই এমনি সব ভণিতা আছে।

রাজারাম কয় ত্রিপুরারী
দুখের ভার আর সইতে নারি॥
আমি ভবে এতই ভারি
নিলাম ঐ চরণে ভার॥
মন্দ পবণের গতি, মনোহর গন্ধ জ্যোতি;
রাজারাম কয় রতিপতি ধরিয়াছে শরাসন॥

এই রাজরাম সম্বন্ধে পূর্ব প্রবন্ধে আমরা কেবলমাত্র তিনি বৈষ্ণব কবি এই এই কথাই উল্লেখ করেছি। শাক্ত সাহিত্যেও যে সেই কবিরই তা' বিচার-

সাপেক্ষ। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক রাজারাম অপর রাজারাম দত্তের সন্ধান পাওয়া যায়।

রাজারামকে অবিসম্বাদিত বৈষ্ণব কবি বলা যেতে পারে। তাঁর রচিত বৈষ্ণব সাহিত্য, "হরিনাম তরংগিনী।" আবার জৈমিনীর সংহিতার অন্তর্গত দণ্ডীরাজার উপাখ্যান নিয়ে "দণ্ডীকাব্য" রচনা করেন রাজারাম দত্ত। "ভক্তি মঞ্জরী"র রচয়িতাও রাজারাম দত্ত। এখন এই দুই জন ব্যক্তিকে একজন বলার পথে বিঘ্ন সামন্যই। কারণ বহু উপাখ্যানকে অবলম্বন করে একজন কবির নানাকাব্য রচনা করা অসম্ভব নয়।

ছড়াটির এই পাঠ হয়তো সর্বত্র পাওয়া যায় না। তবে আলোচ্য প্রবন্ধে সংগৃহীত ছড়ায় কোন ঐতিহাসিক তথ্যের ছায়া পড়লেও এখানে এত কথা বলে শুধু ছন্দের মাধুর্য্য ও নতুনত্বের দিকটাই সব সময় তুলে ধরা হচ্ছে। প্রায়ই সময় দেখা যায় যে, ছন্দের মধ্যে বৈচিত্র্য আনবার জন্য লোক কবি এই সব অনর্থক কথা আমদানী করেছে। সুরের লহরী অর্থের কথা চিন্তা করবার অবকাশ রাখে না।

এখানে ছড়াগুলি থেকে বাঙলার মাঠ, তার বিমুক্ত আকাশ—যে আকাশের বুকে শ্যামল শস্পাকীর্ণ সবুজ মাঠের ছায়া প্রতিবিম্বিত হয়। ফেনিল নদীর কিনারায়, ফেনিল কাশ ফুলের লুটোপুটি আর যেখানে বট পাতার মুকুট পরা গোষ্টবিহারীদের রাখালিয়া বাঁশির ছন্দে ছন্দে যে জীবনের ধারা মুখে মুখে ফেরা গাথা গীতিকায় এসে সুরের মোহে বাঁধা পড়েছে।

চাঁদের নিছনি অঞ্জনে সুর্মা সজল চোখের মদিরতায় নারী যে সাহিত্যে দেবী হয়ে যায়; স্বর্গের দেবীর কথা কেউ শুনতে চায় না মর্ত্যের মানুষের গানে তাইতো লোক-সাহিত্যের আসর সর গরম। এ এক বিচিত্র জগত। এ এক অনির্বচনীয় আস্বাদন। যে ডুবেছে সে মরেছে। স্বর্গের দেবী তাই বাঙলা দেশের লোক-সাহিত্যে এসে নারী হতে চায়। রাধা তাই এখানে কৃষ্ণকে 'নাগর' রূপে পেতে চেয়েছিল। পুরাণে, শাস্ত্রে ভগবানকে নায়করূপে পেতে রাধার এত স্পর্দ্ধা হ'ত না। তাই লোক-কবির ছন্দে, তাদের অনর্থক এবং নিরর্থক বাক্য বিন্যাসে আমরা দেবীকে মানবীরূপে দেখতে পেয়েছি। আমাদের জীবন ধন্য হয়ে গেছে। লোক-সাহিত্যের ছন্দ শোভাময়ী হয়ে উঠেছে। এর আকর্ষণে স্বর্গ মর্ত্য একাকার হয়ে গেছে।

লোক-সাহিত্যের মহাদেবও তাই জটাজুটধারী হিমালয়ের নৈষ্ঠিক সন্ন্যাসী নয়। সেও গৌরীর সংগে দিনরাত কোন্দল করে; কুচুনীপাড়ায় যায়। আর মান অভিমানের 'গায়েন' করতে করতেই পালা শেষ হয়।

এই সব গাথা গান গীত হয় ডুবকি, ডুগডুগি, বিষমঢাকি, গাবগুবি, নুপুর, বিশেষ ভংগিমায় কাঠির তালে তালে, একতারা, মৃদংগ এমনকি মুখের বিচিত্র আওয়াজে ও দেহে বিশেষ ভংগিমার তাল তুলে। এই বাজনাগুলিও প্রত্যেকটি বাঙলার নিজস্ব। এদের সুরের মধ্যেও বেশ বৈচিত্র্য আছে।

মন্দাক্রান্তাতালে জীবনটা বইয়ে দেবার অভীপ্সা আমাদের অনেক সময় ব্যাকুল করে দেয়। নানা ছন্দের দোলায় আমরা অতি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠি। কিন্তু অপ্রয়োজনীয় সামান্য এক একটা কথা বাঙলার মাটির মমতা মিশানো যে সুরের জন্ম দেয় তা' কোন কাল হ'তে মাটির সাথে সম্পর্কিত গরিষ্ঠ বাঙালী সমাজকে মানসিক খোরাক যুগিয়ে আসছে তার খতিয়ান কোথায় পাবো?

আমরা ভুলে যাই অপ্রভাবিত বাংলা ছন্দের অলিখিত ইতিহাসে সেই নজীর জমা দেওয়া রইল। সাহিত্যের ইতিহাসে এর অনেক নজীর পাওয়া যায়। তা' ছাড়া রাধাবল্লভ দাসের "হরি নামার্থ' (বিশ্বভারতী সংস্করণ, ৮৪) এর ভনিতায় দুই ব্যক্তিই যে একজন তা' প্রমাণিত হয়ে সমস্ত সন্দেহ নিরসন করেছে। দেবী মাহাত্ম্য প্রচারমূলক সাহিত্য রচনা করাও তাঁর পক্ষে কিছু অসম্ভব নয়। আর শাক্ত পদাবলী বিশেষভাবে বৈষ্ণব পদাবলীর দ্বারা প্রভাবান্বিত। রামপ্রসাদ দেবীর গোষ্ঠ, রাস ও মিলন বর্ণনা করেন। তিনি কৃষ্ণ কীর্তন এবং কালী কীর্তন রচনা করেন যেমন, তেমনি সেই একই রাজারাম শাক্ত সংগীতের রচয়িতা। তাঁর শাক্ত পদাবলীর মধ্যেও গৌরচন্দ্রিকা রয়েছে।

রাজারামের আখ্যানকাব্য সংগীত বা গীতি কবিতা হিসাবেই রচিত হয়েছিল। এই সহিত্যের উপজীব্য মাহাত্ম্য প্রচারমূলক কাল্পনিক কাহিনীকে গ্রহণ করে রচিত হয়েছে, তবে বেশীর ভাগই শাস্ত্রোক্ত কাহিনীকে অবলম্বন করে লিখিত। এই গানগুলি গীত হবার উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে সৃষ্টি করা হয়েছিল। তাই কৌলিক বৃত্তি হিসাবে একটি জাতির উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া এই সাহিত্যের বহুল প্রচার হয়নি। তাই "হরিনাম তরংগিনী"র রাজারামকেই বিশেষভাবে জানা যায়।

হরগৌরী মিলন:—হরগৌরীর সংসারে কোন্দল লেগেই আছে। আবার তাঁদের প্রেমের ঢলাঢলিতে রংগ দেখা ভার। ঠিক বাঙালীর সংসারের মতই

গৌরী সেদিন হরকে আচ্ছা দু' কথা শুনিয়ে দিলে সামান্য ব্যাপারে—দেব সভায় নিমন্ত্রন রক্ষা করতে না যাওয়ার জন্য। শিব প্রায়ই স্ত্রীর কথা হেসে উড়িয়ে দেয়। আজ 'অকর্মা স্বামীর হাতে পড়ে শান্তির আর অন্ত নাই' বলে—স্ত্রীকে কাঁদতে দেখে রাগে আচ্ছা করে ঝগড়া করলে। গৌরী তো তেলে বেগুনে জলে উঠলো। হঠ্ করে বাপের বাড়ী যাবার ভয় দেখালো, রাগের মাথায় শিবও তাকে ছেড়ে স্বস্তিতে থাকতে পারবে বলে আস্ফালন করল। তাই গৌরীর নন্দীকে সংগে করে চলে যাওয়া দেখেও নির্বিকার রইল মহাদেব।

কিন্তু হর কি গৌরীকে ছেড়ে থাকতে পারে? তাই সে ভিক্ষাচ্ছলে শ্বশুর বাড়ী গিয়ে মানিনীর মান ভাংগাবার ব্যবস্থা করল।

দে দে শিংগা ডম্বুরে।

সন্ধি বাক্য ধর দেরে বাঘাম্বর,
ভিক্ষাচ্ছলে যাব আমি হেমন্ত নগরে॥
কি কাজ ভবনে বাস করিব শ্মশানে
আমা গৌরীর বিহনে আঁখি ঝুরে॥
যার জন্যে তনু জরা চৈতন্যরূপিনী তারা,
তারা আমার নয়নতারা জুড়াবো তারে হেরে॥
গৌরীর সনে গৌরবে বামেতে বসিবে যবে,
কবে কৈলাসে আসিবে আশা আমার অন্তরে॥
গৌরীর বিচ্ছেদ আগুনে দহিছে হৃদয় বনে,
রাজারাম কয় সত্বরে চঞ্চলা আসিবে ঘরে॥

এবার হর গৌরীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করল:

কি করিব গো যোগী শিংগায় গৌরীর গুন গায়।
বাঘাম্বর পরিয়া অংগে রংগেতে নাচিয়া যায়॥
বৃষোপরি আরোহন ভস্মমাখা ত্রিলোচন,
হাড়ের মালা গলায় দোলে জটাতে ফণী খেলায়॥

* * *

কার তরে যোগী হয়েছ।

তুমি হে উতযোগী মহাযোগী পঞ্চানন॥
পরেছ দিগম্বর, পরেছ বাঘাম্বর
বিভূতি কলেবরে রজত বরণ॥

শংখের কুণ্ডল দোলে শোভা করে ভূমণ্ডলে,
শিরেতে ফণী খেলে মুনি জনার হরে মন।

গৌরীর সখিগণ হরকে দেখে চিনি চিনি করে :

ওহে যোগী দেখেছি কোথায় আমরা তোমায়।
বৃদ্ধ বেশে রংগ দেখে হেসে মোদের পরাণ যায়॥
চিনি চিনি করি তোমায় চিনতে নারি
যোগী কিংবা ব্রহ্মচারী কপটভাব বুঝা যায়॥
শুনহে যোগীবর আপনার ভেক্ ছাড়
নিজ বাসে গমন কর নইলে পাবে সাজাই॥
মহেশ ঘেরিল সখি সকলে।
যেন কৃষ্ণের ঘেরিল সখি শ্রীরাসমণ্ডলে॥
বৃন্দাবনের যুক্ত কায়া, শিব শক্তি মহামায়া
যত সখি অত্র শিব মায়াতে ছলে॥
শারদ পূর্ণিমা বরণী সর্বানীর মুখখানি,
রাজারামের এই বাণী হইল সুখের হায়॥

এবার শিব উমার বাপের বাড়ীতে এসে পড়ে :

ভিক্ষা দে ভিক্ষা দে বলে ত্রিপুরারি।
হেমন্ত নগরে হইল যোগী দণ্ডধারী॥
সঘনে ডম্বুরে বলে কোথা সর্বমংগলে,
চান্দ্ মুখে শিংগায় বলে কোথা আছ শংকরী॥
শুনিয়া শ্রীমুখের গান গলিত হয় পাষাণ,
মৃত তরু মুঞ্জরে জাহ্নবী বহে উজান॥
চরণে ধরে আরতি সতী করে নিজ পতি,
মতিমান বসন্তের গতি মদনরাজ আজ্ঞাকারী॥
রাজা চিনিতে পারে নাই শিব শংকরে।
শিব শংকরে ত্রৈলক্যের ঈশ্বরে॥
কত পুণ্য করেছিলে বান্ধিলে গংগাধরে॥
ভক্ত নইলে ঠাকুরে বল কে বাঁন্ধিতে পারে,
বন্দী আছে ভক্তির ডোরে পাতালে বলীর ঘরে॥

যার নামে যায় ভববন্ধন তারে ঘরে করি বন্ধন,
রাজারাম কয় রইলাম বন্ধনে গিরিহে তোমার দ্বারে ॥

আজ কবির অসাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির জন্য কালিই "রাসবিহারী নটবর বেশে বৃন্দাবনে।" রামপ্রসাদ (১), আর "কালী, কৃষ্ণ, শিব, রাম, সকল আমার এলোকেশী" রামপ্রসাদ (২) ঐ এক মনোভাব-বশতঃ রাজারাম "শিবশক্তি মহামায়া বৃন্দাবনের যুক্তকায়া" বলতে পেরেছেন।

গৌরীর তপস্যার অনেক পদ পাওয়া যায়। এই পদে ব্যাকুলতা, তপস্যার ধৈর্য্য, মনের উদাসীনতা ও কাম জর্জরিতা উমার ছবি সুন্দরভাবে অংকিত। কিন্তু কবি তাত্বিক, শিবহারা উমার শক্তি সম্বন্ধে সামান্য কয়টি কথায় যে ভাব বুঝাতে চেয়েছেন তার তুলনা বিরল।

বিরহিনীর বিরহে তাপিত তোমার অংগ।
তুমি শির মণি হারা হয়ে যেমন ঐ ভুজংগ ॥
কোপ দৃষ্টে চায় ধনী বাক্যের তর্জন শুনি,
কুণ্ডে যেন কুণ্ডলিনী পাসরিতে সংগ ॥
এক চক্রে কি চক্র ধরা অনুতাপে তনু জরা,
বিষাদে হয় অন্তরা এত কি প্রসংগ ॥
গিরি নন্দিনী গৌরী ত্রিলোক বন্দিনী শ্যামা।
করে সদানন্দ চিত্তে যুগ চিন্তাই মহামায়া ॥
চন্দ্র বিনে চকোরী চন্দ্রচূড় বিনে শংকরী,
কাণ্ডারী বিহনে তরী বারি ছাড়া মীনের কায়া ॥
সদয় হয়ে বিরূপাক্ষ আমারে হবে সাপক্ষ,
করুণা কটাক্ষ করি দাসীরে করিবে দয়া ॥

* * *

পঞ্চানন রে দেখিয়ে মালঞ্চ বন
তারার নয়নে ধারা বরিষণ ॥
ফুলে ফুলে শোভা করে যেমন মধুর বৃন্দাবন ॥

---

(১) কালি হলি মা রাসবিহারী নটবর বেশে বৃন্দাবনে। পৃথক প্রণব নানা লীলা তব, কে বুঝে এ কথা ভীষণ ভারী ॥ নিজতনু আধা গুনবতী রাধা, আপনি পুরুষ আপনি নারী। ছিল বিবসন কোটি, এবে পীতধটী, এলোচুল চূড়া বংশীধারী ॥

(২) ঐ যে কালী, কৃষ্ণ, শিব, রাম—সকল আমার এলোকেশী। শিবরূপে ধর শিংগা, কৃষ্ণরূপে বাজাও বাঁশী।

সারি সারি সারী-শুকে রাধাকৃষ্ণ বলে মুখে
আকুলে কোকিল ডাকে নৃত্য করে শিখীগণ ।;
মকরন্দ আসে কত অলিকুল আনন্দিত,
কেতকী মুখেতে বসি চাতক গায় চণ্ডীর গুণ ॥

* * *

'শিববিবাহ', 'দক্ষযজ্ঞ' প্রভৃতি সম্বন্ধীয় অনেক গানও পাওয়া যায়। প্রত্যেক আখ্যানের মধ্যে কবির নিজস্ব দৃষ্টিভংগীর পরিচয় মিলে। প্রত্যেকটি সংগীতের মধ্যে কবির হৃদয়ের ভক্তি যেন ফুল হয়ে ফুটে ওঠে। ভাষার সাবলীলতায়, ভাবের পরিপূর্ণতায় এই গানগুলি সত্যই রমণীয়।

গীতিময় শাক্ত পদাবলী

রাজারামের শাক্ত-সাহিত্যে, বৈষ্ণব সংগীতের প্রভাব বিশেষভাবে পড়েছে। এই প্রভাবের জন্য তার মায়ের রূপ, মা কে ? আগমনী, বিজয়া প্রভৃতি পদাবলী' দুই ধারার ভাবভাষায় মোহিনী ভাবলোকের সৃষ্টি করেছে।

আগমনী

কি শুনালি গিরিবাসী এল আমার শংকরী।
দে গো তোরা জয়ধ্বনি পূর্ণ ঘট কক্ষে করি ॥
যত পুত্রবতী নারী এস পুত্র কোলে করি
ত্বরায়ে গেঞ উলু দিয়ে নিয়ে আয় মহেশ্বরী ॥
কেহ শুনিয়া মংগল ধ্বনি লযে স্বুবর্ণের বিউলী
চামর বীজন করে নাচে গায় বিদ্যাধরী ॥
নানা বাদ্য বাজে ভেরী মহানন্দে নাচে গিরি,
বলে আজ ধন্য হল পুরী এল ভূবনেশ্বরী ॥ (৩)

মা কি ঃ

শোন গো মা শৈলরাণী বলি গো তোমারে।
মায়া ফেরে জন্ম নিলাম তোমার উদরে ॥
প্রথমেতে ছিলাম আমি ক্ষীরোদ সাগরে।
ব্রহ্মাণ্ড কটাক্ষ মাত্রে আমারে ডরে ॥

(৩) কারু পূর্ণ কলসী কক্ষে, কারু শিশু বালক বক্ষে, কারু আধ বিয়াসি বেণী, কারু আধ অলকা শ্রেণী ; বলে চল চল চল অচল তনয়া হেরি ওমা, দৌড়ে আয়।

(কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য)

কেবা কার মাতা পিতা কেবা কার জননী।
মহামায়ারূপে আমি অনন্তরূপিনী ॥** (৪)

রণরংগিনী মা

রণে ক্যারে রমণী এলরে শিহরে বিহরে।
দিক্‌বসনী, বিকট দশনী, আরক্তলোচনী, এলো চিকুরে ॥
মৃগরাজ জিনি দক্ষ সমরে, দিকরাজ জিনি চরণ নখরে ;
ঘন ঘন রবে কাঁপে হুহুঃকারে ঘন ঘন মা হরে ॥
গণ্ডে গলিত রুধির ধারা, তুণ্ডে রসনা অতি ভয়ংকরা।
কৃপাণ পাণিতে দনুজ দলিতে ঘন ঘন হাঁকেরে ॥
রাজারাম বলে হয়ে কৃতাঞ্জলী, কালীপদে মন দে রে জলাঞ্জলি,
ভবে না আসিবে কালেতে তরিবে, রবিসুতের ভয় হরে ॥(৫)

তত্ত্ববিষয়ক পদ

তারিণী যদি বিচার করে তবে ভবে শমনে জয় করি।
দিয়েছি দরখাস্ত তারার দরবারে হাজির করি ॥
মন উকিলে রাজী করে দরখাস্ত সহি করি।
তাতে যদি হয় শাস্ত ফিরে যায় এসে কৃতান্ত,
রাজারাম হয়ে শান্ত ক্ষান্ত লোকে বসত করি ॥ (৬)

মায়ের নাম

তোমরা কেউ দেখেছ রে ভাই কেউ নাকি জান তারে।
এই পথে মোর জগদম্বা মা গেল কত দূরে ॥
কি চিহ্ন পদ দু'খানি, অরুন তরুন জিনি,
দিনে বিদ্যুৎ খণ্ড করে বিধি চরণ নখরে ॥
মা মোর কৈলাস গর্তে গতিহীনের গতি কর্তে
দণ্ডী ঘরে অধিষ্ঠাত্রী, চণ্ডীনাম ধরে ॥

(৪) আপনার মায়ায় আপনি তুমি যাতায়াত কর বারংবার, আবার নিজে বুঝ না নিজের মায়া এমনি তোমার মায়ার বিকার। (গোবিন্দ চৌধুরী)

(৫) কে ও একাকিনী, কাহার রমনী, শশীশোভা জিনি মসিবরনী। দশনে বসনা ধরা, বদনে রুধির ধারা করাল বদনী। (মহাতাব চাঁদ)

(৬) শ্রদ্ধা নওলা খেলায় দিয়ে, বসবি ভক্তি গোলাম নিয়ে, গোলাম দেখে গোলাম হয়ে কৃতান্ত কাঁপিবে ভয়ে। —(রসিক চন্দ্র রায়)

*প্রবন্ধে উল্লিখিত গানগুলি লোকমুখে শুনে সংগৃহীত।

শাক্ত পদাবলী মানুষের ঘর সংসারের গান, মা ও মেয়ের ভালবাসার উজান এই গানে। তাই বিপর্যস্ত বাঙলার দূর পল্লীতে পল্লীতে এ গানের সুর আজও মিলায়নি। তাই এখনও কত অনাবিষ্কৃত পুঁথি এবং গ্রাম বৃদ্ধের মুখে এখনও এ গান শুনতে পাওয়া যায়। যুগযুগান্তর পূর্বে লিখিত এই সব সাহিত্য উদ্ধার জন্য বহু চেষ্টার প্রয়োজন, তাতে দেশের সাহিত্য শ্রীবৃদ্ধির পথে অগ্রসর হবে। শাক্ত সাহিত্য ধারার পূণ্য সংগমে কৃতার্থ স্নানের জন্য সমগ্র পৃথিবীর লোককে আহ্বান করে বাংলাদেশ।

পটুয়া সংগীতে রাধাকৃষ্ণ

লোকমুখে প্রচলিত সাহিত্যের মধ্যে মধ্যে এমন দেখা যায় যে একধারার গান এক একটা জাতির জীবিকা অর্জনের সহায়তা ক'রে অস্তিত্ব বজায় রাখে। বীরভূমের পটুয়া জাতির মুখে নানাপ্রকার উপাখ্যানকে উপজীব্য ক'রে রচিত গান তাদের হাতে আঁকা পটে দেখাবার সময় চিত্র পরিচিতি হিসাবে গীত হয়। রাধাকৃষ্ণ লীলা, নিমাই সন্ন্যাস, অন্ধমুনি পুত্র বধ, সীতার অগ্নি পরীক্ষা, কলির লীলা, যমপুরীর শাস্তি বিধান প্রভৃতি গান ভিন্ন ভিন্ন পট দেখাবার জন্য রচিত হয়। নিরক্ষর পটুয়াদের রামায়ণ, মহাভারত, বৈষ্ণব পদাবলী প্রভৃতির সংগে সম্যক পরিচয় নেই কিন্তু কথকতা, পালাগান তাদের পূর্ববর্তীদের নিকট হ'তেই কত শত উপাখ্যানের কথা জানতে পারে। এইগুলি তাদের কল্পনাকে উৎসারিত হ'তে সাহায্য করে অবলীলাক্রমে। এই সব গানের মাধ্যমে পল্লীবাংলার জনমানসের ধর্মের প্রতি প্রগাঢ় আনুরক্তিই প্রকাশ পায়।

রাধাকৃষ্ণ লীলাকে কেন্দ্র ক'রে লিখিত গানেব মধ্যে যে অনির্বচনীয় ভাব জাগে তা' যুগযুগান্ত ধ'রে রসিক চিত্ত আপ্লুত করছে; আপামর সাধারণের মধ্যে পরিবেশিত হয়ে পরিতৃপ্ত করছে নির্বিচারে। আর এ গানের সুরে কাল সাপও সম্মোহিত হয়ে যায়। লম্বা লম্বা মাথা-উঁচু-করা গাছের তলে বালিতে-ভরা মরা নদী, বর্ষার কুল-প্লাবিনী, ত'ল-তমাল-শাল-পিয়াল গাছে ঘেরা গ্রাম, রাখালিয়া বাঁশি প্রভৃতির মনের কথাই যেন এর সুর। বিদেশের বাতাস এসে আজও এর ভিত্তিমূল কাঁপাতে পারেনি। পূর্বে জনসাধারণকে আকর্ষণ করবার এ ছিল মোহিনী মন্ত্র। এ গানের রাধা দুরন্ত-যৌবনা, কলহাস্য-মুখরা গ্রাম্য বালিকা ব্যতীত আর কেউ নয়। পটুয়া কবি এর বেশী কল্পনা করবার আর খেই পাইনি; তাতে রাধিকা হয়ে উঠেছে মনোহারিনী। অপর পক্ষে গ্রাম্য সাধারণের মনে আঁকা হয়ে গেছে অনায়াসেই এ ছবি। তত্ত্বের গহনে প্রবেশ করবার ঝামেলা নেই আর কষ্ট-কল্পনার সাহায্যে হৃদয়ংগম করবারও কোন প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয় না। এমনিভাবে গোপাংগণাগণ, কৃষ্ণ, বড়াইবুড়ি প্রত্যেকেই তাদের ঘরের মানুষ যেন। তাই অর্থনৈতিক বিপর্যয়, সামাজিক পরিবর্তন কোন কিছুই এ সাহিত্যের গতি সম্পূর্ণ রুদ্ধ করতে পারেনি, পরন্তু

দেবতাকে ঘরের মানুষ ক'রে ভাববার ক্ষমতাই সাধনা। মানুষের চরম পাওয়ার পথে এই সাধনাই সত্যিকারের আলো আনে।

নিম্নোক্ত কবিতায় কৃষ্ণের যে ছবি পাওয়া যায় তা' গ্রাম্য কবিদের নিজস্ব :

কানাই কদম্ব মূলে যার নাগরীয়া থানা।
বনে বনফল গাঁথি কৃষ্ণের গলে বনমালা॥
উরু বাঁকা ভুরু বাঁকা যার বাঁকা মাঝাখানি।
চরণের নুপূর বাঁকা চূড়ার টালনী॥
কাঁচবেড়া, কাঞ্চনবেড়া আর বেড়া ধরা।
* * ভিন্ন নাইকো তাকে কৈরংগ পারা॥
খোল বাজে মৃদংগ বাজে বাজে করতাল।
তার মাঝে নৃত্য করে মদনগোপাল॥

শ্রীমদ্ভাগবতে নবম ও দশম স্কন্ধে যে রাধাকৃষ্ণ লীলার কিঞ্চিৎ সম্ভাবনা বিশাল সাহিত্য সৃষ্টির জন্য অপেক্ষা করছিল তার পূর্ণ পরিণতি হয়েছে বৈষ্ণব সাহিত্যে। কিন্তু বৈষ্ণব সাহিত্যের বাইরে এই আলোচ্য গানেও যে দাগ কেটে গেছে তার প্রভাব আজও মানুষ অস্বীকার করতে পারে না। রাধাকৃষ্ণ চিরন্তন প্রেমিক প্রেমিকা। চাওয়ার আপন জনকে না পাওয়ার হতাশ্বাসে যে অশ্রু বাষ্প জমে ওঠে তা' বৈষ্ণব সাহিত্য সৃষ্টি করবার পক্ষে যথেষ্ট কিন্তু পটুয়াদের গানে বিরহ ব্যথা গুমরে ওঠে সামান্যই। বৈষ্ণব সাহিত্যের মত বিরহই প্রধান নয়। রাধা আর কৃষ্ণ সম্পর্কিত লীলা বা কল্পিত কাহিনী অবলম্বনে এই সব গান রচিত।

গোপীদের বস্ত্রহরণ

একে একে সখিরা সব স্নানে নামিল।
গোপীদের বসন কদম্ব ডালেতে বাঁন্ধিল॥
জলখেলা করে যদি পাহার পানে চায়।
শুকনো বস্ত্রগুলিকে দেখিতে না পায়॥
ঝড় নাই ঝংকট নাই বস্ত্র কেবা হরে।
নন্দের বেটা চিকন কালা বস্ত্র চুরি করে॥
বস্তর দাও হে চিকন কালা কাপড় দাও হে পরি
আজ থেকে হব তোমার চরণের ভিখারী

বস্ত্র হরণের পট দেখাবার সময় এই গান করে। এই পট গ্রাম্য অংকন চাতুর্য্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। পটুয়া কবি আংগুল দেখিয়ে প্রত্যেক গোপবালার অসহায় অবস্থা সুরে সুরে মাতিয়ে তোলে।

কৃষ্ণের ভার বহন

সাজ সাজ বলে বড়াই নগরে দিল সাড়া।
বড়াঞি বুড়ির বাত্তা পেয়ে সাজে গোয়াল পাড়া ॥
টেনে টেনে নাস পেটার (?) খুলিল ঢাকনি।
হস্ত ভরে বাহির করে সুবন্নের চিরুণী ॥
সুবন্নের চিরুণীতে কেশ করে গোটা গোটা।
কপালের মাঝেতে দেয় সিন্দুরের ফোঁটা ॥
সব সুবন্ন্যের ভারখানি বেউর বাঁশের শিকা।
কৃষ্ণের স্কন্ধে দধির ভার চলিল রাধিকা ॥
ভার লাও ভারতী লাও ও গোয়ালার ঝি।
দুরন্ত বাঁকের জ্বালায় স্কন্ধে জরে মরি ॥
তরুতলে ভার নামিয়ে বসে বনমালী।
মুখে কাপড় দিয়ে দেখ হাসে চন্দ্রাবলী ॥
খেয়েছো রাধিকার কড়ি হয়েছো বেগারী।
এখন কেন বল ঠাকুর ভার বহাতে নারি ॥
যে না দেশে বিকায় দুগ্ধ সেই না দেশে যাব।
মনের সাধেতে ঠাকুরকে নগরে ফিরাব ॥

কৃষ্ণ কীর্তনের বাড়াইবুড়িকে রাধিকা মনের দুঃখ জানাচ্ছে * আর পটুয়া কবির বড়াইবুড়ি নিজে গোপাংগণাদের মধ্যে কৃষ্ণলীলার তোড়জোড় জাগিয়ে তোলে। রাধিকাকে টেনে এনে কেশ-বিন্যাস করে দেয়। মনের সাধে রাধিকাকে সাজায় নায়িকার সাজে। তারপর রাধিকা আর সখিগণ কৃষ্ণের কাঁধে দধির ভার দিয়ে বেসাতি মানসে নগরে নগরে ঘুরে বেড়ায়। তাদের অতি আপনার জনকে বিব্রত দেখে চন্দ্রাবলী হাসে; কত কথা বলে।

মনের সাধে শ্যামকে নগরে ফিরাবার এই অপূর্ব পরিকল্পনা চমকপ্রদ।

* মোঞঁ শিশুমতি বড়ারি করোঁ কোণ বুধী। শুনিআঁ বা কি বুলিবে সাধী গুনিনিধি। অমূল্য রতন মানে ধরে মোর হাথে। যাগু স্বরতি দান সান দেম মাথে ॥ ৮৭ পৃষ্ঠা। কৃষ্ণকীর্ত্তন॥

গোপিনীদের এই কৌতুক এক অপূর্ব ভাবের প্লাবন জাগায়। একমাত্র অশিক্ষিত গ্রাম্য কবিদের দ্বারাই এই গান লেখা হ'তে পারে। এই সামান্য কয় পংক্তির ছবিতে যে রাধিকার দর্শন মিলে তা' প্রসাধন উৎসুকা গ্রাম্য তরুণীরই চিত্র। গোটা গোটা কেশ আর সিন্দুরের ফোঁটাই তাদের সৌন্দর্য্য চর্চাই যথেষ্ট। চোখের সামনে ভেসে ওঠে একটা ভরন্ত মুখ। পটুয়া কবির সৃষ্ট কৃষ্ণ বড় বেকায়দায় পড়েছে—যেমন ব্যতিব্যস্ত গ্রাম্য গোয়ালা বা চাষী তাদের তরুণী স্ত্রীর কাছে পড়ে।

নৌকাবিলাস

কাঠের দেশে থাক ঠাকুর কাঠের কিবা দুখ।
আজ ভাংগা নৌকায় পা দিতে পাচ্ছ কত সুখ॥
ভাংগা নয় চুড়া নয় রাধা অসুবিধার কড়ি।
কত হস্তী ঘোড়া পার করেছি তুমি কত ভারী॥
সব সখীকে পার করিতে নিব আনা আনা।
চিমতিকে পার করিতে নিব কানের সোণা॥
সোণা নাও শাড়ি নাও ঠাকুর সব দিতে পারি।
দু'কূল পাথারে জেনো ভেসে যেতে নারি॥
পার কর পার কর কাণ্ডারী বেলা পানে চেয়ে।
দধি দুগ্ধ নষ্ট হয় বিকীর সময় যায় যে বয়ে॥

অল্প কথায় এমন বিস্তৃত চিত্র সত্যই বিস্ময়ের উদ্রেক করে। এখানে ভক্ত ভগবানের অপূর্ব সম্বন্ধ প্রতিভাত হয়ে ওঠে। অকুল ভব-পারাবারে কৃষ্ণ পারের কাণ্ডারী। নারীরূপী ভক্তের আকুল আবেদনে দশদিক মুখরিত হচ্ছে। কৃষ্ণ চাইছে ভক্তের কাছে সর্বস্ব। দুকূল পাথারে না ভেসে যাওয়ার জন্য সব দিতে চায়। এর মধ্যে কি আকুলতা ফুটে উঠেছে।

শ্রীদাম সুদাম কৃষ্ণ

কাল কৃষ্ণ ধবল গাভী দোহাই মনের সুখে।
চোঙাতে আটে না দুগ্ধ ঢালে চন্দ্রমুখে॥
শ্রীদাম সুদাম দম্মুদর গোষ্ঠেতে সাজিল।
বাথানে বলরামের শিংগা বাজিতে লাগিল॥

তার দিল বালা দিল পাঁচনী দিল হাতে।
সাজায়ে কোজায়ে দিল বলরামের সাথে॥

শ্রীদাম সুদাম কৃষ্ণের কথায় সাথে সাথে ভেসে ওঠে গোচারণের বিস্তৃত মাঠের ছবি।

এই পটুয়া জাতি নিজেদের চিত্রকর বলে পরিচয় দেয়। কিন্তু এখন কচিৎ গৃহস্থের দুয়ারে এদের গানের সুর ভেসে ওঠে। আগে চিত্র-ব্যবসায়, প্রতিমা নির্মাণে আর পট দেখিয়ে এদের জীবিকা নির্বাহ হ'ত কিন্তু আজকাল চাকা ঘুরে গেছে। ভিখারীর ভিক্ষা মেলা ভার; কি ক,রে তাদের লোকে আহ্বান করবে? কিন্তু বাংলাদেশের প্রকৃত স্বরূপ জানতে, মানুষের মাঝে ধর্মের জোয়ার বইয়ে দিতে, লোক-শিক্ষা প্রচার করতে, সংস্কৃতি বাঁচিয়ে রাখতে এই সাহিত্য-ধারার উৎস মুখ রুদ্ধ হওয়ার কল্পনা কি কেউ করতে পারে?

* সমস্ত গান গুলিই পটুয়াদের মুখে শুনে সংগ্রহ করা হয়েছে।

গ্রাম্য সাহিত্যে রাধাকৃষ্ণ

উপাখ্যান-পূর্ব যুগে বাংলাদেশে বহু কাহিনী লোক মুখে প্রচলিত ছিল। এই কাহিনীগুলির রচয়িতার কোন ঠিকানা নেই। বহু লোকের কল্পনা সাকুল্যে এই গল্পগুলি পরিস্ফুট হয়ে এসেছিল। এর পর সেই কাহিনীগুলিকে উপজীব্য ক'রে বহু কবি বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন কল্পনা প্রাচুর্য্যে ও ভাষার চমৎকারিতায় আপন আপন কাব্য সম্ভার সাজিয়ে তোলেন। এমনিভাবে মনসা-মংগল, ধর্ম-মংগল প্রভৃতি কাব্যের সৃষ্টি হয়। এই কাহিনীগুলিতে বাংলার সমাজ, বাংলার মানুষ প্রভৃতির চিত্র সবিশেষ বর্ণিত হয়েছে। বাঙালীর সুখ দুঃখে ঘেরা কুটির জীবনের চিত্র সুপরিস্ফুট। প্রচলিত কাহিনী, প্রবাদ, প্রবচনের দেশে তাই এই কাহিনীগুলি মহাকাব্য হয়ে যুগ যুগ ধরে জাতীয় জীবন বিকশিত করে চলেছে। অপর পক্ষে বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন পরিপ্রক্ষিতে রূপ-সমৃদ্ধি লাভ ক'রেছে। জনচিত্তের অকুণ্ঠ সমর্থনে, নিরতিশয় ভাবালুতায়, কাহিনীর নায়ক-নায়িকা মানুষের দেবতা হয়ে দেখা দিয়েছে।

তাই মনসা-মংগল কাহিনীতে মনসাদেবীকে যেন জোর ক'রে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে প্রতীত হয়। শাক্ত শৈবের দ্বন্দ্ব উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হয়ে এই কাহিনীগুলিতে অনাধিকার প্রবেশ করেছে বলে জোরের সংগে বলতে না পারলেও সাহিত্যের রসাত্মিকতায় বিঘ্ন সৃষ্টি করেছে তা' অনস্বীকার্য্য। সাহিত্য হয়ে উঠেছে উদ্দেশ্য সিদ্ধির বাহক। এই দেবতার স্থলে হয়তো কাহিনীর প্রথম যুগে অদৃষ্টই নির্বাক ভূমিকা অবলম্বন ক'রে গল্পে গতি সঞ্চার করতো। তার মধ্যে বাঙালীর অদৃষ্ট বিশ্বাস সবিশেষ প্রকটিত ছিল। অদৃষ্ট ও পুরুষ-কারের দ্বন্দ্বে তাই বাংলার চাঁদ সদাগর অসাধারণ হয়ে উঠেছে। পুরুষকারে আস্থাবান অদৃষ্ট বিশ্বাসী বাঙালী তাই উপসংহারে সন্ধির ধূপ প্রদীপের আবহাওয়ায় আবার শান্তি পারাবারে সাধের সপ্ত ডিংগায় পাল তুলে দিয়েছে অনাবিল আনন্দে। চণ্ডী-মংগল প্রভৃতি কাব্য গ্রন্থেও দেব মাহাত্ম্য প্রচার বিষয়ক অংশ বাদ দিলে তাতে মূল কাহিনীর গতি ব্যাহত হয় না। মহাকাব্যের অন্যতম প্রধান লক্ষণের পরিস্ফুরণের জন্য রামায়ণ, মহাভারতে কাব্যের মধুর ঝংকারে বীরের শৌর্য্য গাথা কীর্তিত হয়। প্রচারিত হয় তার বাহু বলের মহিমা। তার ধনুকের টংকারে কত ইতিহাস রচিত হয়। বাংলার এই

সব মহাকাব্যের লক্ষণাক্রান্ত গ্রন্থে নায়কের বীরদৃপ্ত স্বভাবই শুধু নয়; নয় সে বাহুবল সর্বস্ব। দৃঢ়চেতা নায়কের মনোবল শুধু সেদিনের বাঙালীর প্রকৃতিসুলভ কল্পনা সৌকর্য্যেই তৈরী। চাঁদ সদাগরকে মনসা-মংগলের নায়ক ধরলে অন্যান্য বীর পুরুষের সন্ধান মেলে। তাই অসম্ভব মনোবল মনসা দেবীর জয়লাভকে সন্ধির নামান্তর বলেই ধরে নেওয়া যায়। কিন্তু রামায়ণের রাম, ও মহাভারতের অর্জুন বহু সময় নিজেদের আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে। তাদের শক্তি সম্পর্কে সজাগ করতে হয়েছে বার বার।

প্রত্যেক মংগল-কাব্যের মতই কৃষ্ণ কথায়ও বাংলার নিজস্ব বৈশিষ্ট বর্তমান। এ দেশে ত 'কানু ছাড়া গীত নেই'। পৌরাণিক কৃষ্ণকথা ও বাঙলার গ্রামে গ্রামে লোকমুখে প্রচলিত উপাখ্যানে আকাশ পাতাল প্রভেদ। শুধু মাত্র গাঁয়ের রাখাল ছেলে কৃষ্ণকে যেন কার নির্বন্ধাতিশয্যে ঠাকুর কৃষ্ণ বলে চিনিয়ে দেবার জন্য কৃষ্ণজীবনের বহু ঘটনাবলী গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু গ্রামের বখাটে রাখাল ছেলে তার জীবন যেভাবে কাটায় কৃষ্ণও সেইভাবে মানুষের মতই, তাদেরই সংগে হেসে খেলে আর গোয়ালাদের রাধার সংগে প্রেম ক'রে চলেছে। পল্লী কবিদের আর এক কৃষ্ণের দেখা মেলে। অতি প্রাকৃত ঘটনা-বহুল জীবন তার। সাধারণের অন্তরে ভয়ে ভক্তি উদ্রেকের উদ্দেশ্য মনে রেখেই এই চরিত্র সৃষ্টি করা হয়েছিল। কিন্তু কৃষ্ণ প্রেমকথা বাঙালী হৃদয়ের মূল সুর। প্রেমিক কৃষ্ণই বাংলার জাতীয় জীবনের শ্রদ্ধার্ঘ্য সম্ভারের একমাত্র অধিকারী। তাই এই দেশের মাটীতেই জন্ম নিয়েছিল প্রেমবিভোল তনু-মন-সমর্পিত গোরা চাঁদ। তাই কৃষ্ণ প্রেমের ঝড় তুফানে ডুবে গেছল বৃহৎ বংগ উৎকল প্রভৃতি। সেদিন কৃষ্ণ প্রেমের চূড়ান্ত পরীক্ষা হয়ে গেছে। এই গোরা চাঁদের কৃষ্ণ বাঙালীরই কৃষ্ণ। এর জন্ম যুগ যুগ আগে। আবার যুগে যুগে নবরূপে, নবভাবে জন্ম নিয়েছে বাঙালীর এই ঠাকুর। দিনের পর দিন প্রাণ মাতানো ব্যাকুল সুরের বাঁশরী লহরীতে আকুল করে তুলেছে জন সাধারণকে। গীতার কৃষ্ণ সারা ভারতের। বাংলার থেকে অনেক দূরে কুরুক্ষেত্র ময়দানে তার কর্ম সাধনা যদিও, তবুও বাঙালীই তার জাতীয় জীবনে সর্বপ্রথম ক্লৈব্য পরিহার ক'রে জেগে উঠেছিল গীতারই ত্যাগ সর্বস্ব কর্ম সাধনায়। কিন্তু বৃন্দাবনের কৃষ্ণের লীলাক্ষেত্র বাঙলা দেশ থেকে বহুদূরে সীমায়িত থাকলেও তা' বাঙলা দেশ পরিব্যাপ্ত হয়ে গেছল। নদীয়ার সেদিনের মাতা মাতি আজিও রণরণিত হয়ে চলেছে। তার কারণ লোক-সম্ভব নায়ক-নায়িকার প্রেম, লোকোত্তরতায়

রূপায়িত হয়ে গেছে। বাংলার প্রেম-বিহ্বল নায়ক-নায়িকা রাধাকৃষ্ণের নামান্তরে প্রতীক সর্বস্ব হ'য়ে যুগ যুগ ধরে মানুষকে প্রেম সাধনায় দীক্ষা দিয়ে চলেছে।

তাই পুরাণ কথা ব্যতিরেকে বহু কল্পিত কাহিনী ও রাধাকৃষ্ণের জীবনের ইতিহাস হয়ে দাঁড়িয়েছে। গ্রামের প্রেমিক প্রেমিকার জীবনের সম্ভব ঘটনা বাহুল্যে গ্রাম্য-সাহিত্যের রাধাকৃষ্ণের চরিত্র রূপায়িত। এই গল্পগুলি কোন সংস্কৃত কাব্যে বা বাংলা সাহিত্যের অনুবাদে পাওয়া যায় না। অবিশ্যি চণ্ডীদাস বা বিদ্যাপতির এমনি কল্পনা-মধুর রাধাকৃষ্ণের মিলন বিষয়ক পদ আছে। এই সব গ্রাম্য কাহিনী গাথার স্মরণেই যেন এই পদগুলি রচিত হয়েছে। গ্রামে সমাজের অসমর্থিত পরকীয়া প্রেমের ব্যাপারে যে সকল ঘটনা সংঘটিত হয় বা হওয়া সম্ভব তাই এই রাধাকৃষ্ণের জীবনের কথা। এর থেকে বংলাদেশে পরকীয়া প্রেম সাধনা সম্পর্কে নতুন আলোকসম্পাত করে। প্রেমের পূজার নতুন ধারা প্রচলিত হ'তে নায়ক-নায়িকার জীবনে সংঘটিত ঘটনা সুসজ্যবদ্ধভাবে রূপ পাওয়ার জন্য গুমরে মরছিল। মানুষে মানুষে ভালবাসার প্রকৃতি মুমুক্ষু সাধারণে আর জাগতিক প্রেমের পরাকাষ্ঠায় রূপান্তরিত ভগবদ্ভক্তির উজান বহাতে প্রেমময় পরমেশ্বরের সাযুজ্য সাধনা ভারতীয় প্রেম সাধনার নবতম অধ্যায়। চির প্রেমময়ের প্রেম সাধনা এই প্রক্রিয়ায় অনায়াসসাধ্য হয়ে ওঠে মানুষের মনে। প্রবর্তন হয় নতুন ধর্ম সাধনার। মানুষের জন্য মানুষের অতি যে কি উদগ্র—যা' ঈশ্বরে আরোপিত হয়ে তার আসন টলিয়েছে বার বার—সার্থক হয়েছে বাংলা দেশের মাটি।

পুরাণের বাইরে এই সব আখ্যানগুলি জনচিত্ত আকর্ষণ করতে পেরেছিল সমধিকভাবে। কৃষ্ণ বিষয়ক গ্রাম্য গীত অনুষ্ঠানে এই গানগুলি আজও গীত হয় সমধিক উৎসাহের সংগেই। সরল গ্রাম্য ভাষায় এই গানগুলি রচিত। এই ভাষায় বিশেষভাবে প্রাণের সাড়া পাওয়া যায়। অন্তরের অনুভূতি দিয়ে এই গানগুলি রচিত। ছন্দের মাধুর্য্যও বহুক্ষেত্রে সবিশেষ লক্ষ্যণীয়। ঘটনা-গুলির প্রত্যেকটি অতি পরিচিত গ্রাম্য পরিবেশ হ'তে সংগৃহীত। অনেক গানে কবির নাম পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না। আবার কোন কোন পদে অজ্ঞাত পরিচয় কবির নাম পাওয়া যায়। এই কবিগণ সামান্য সামান্য পদে নিজেদের পরিচয় প্রকাশের অবকাশ পাননি বা স্বেচ্ছায় আত্মগোপন করেছেন তৎকালীন ভক্ত কবিদের ভক্তি প্রকাশের বহুল প্রচারিত রীতিতে। তা' ছাড়া এঁদের প্রায় সকলের পদই নূন্য গণ্য ছিল। যে জন্য আজিও তা' অনেকাংশে অপ্রকাশিতই

রয়েই গেছে। লুপ্ত হয়ে গেছেও অনেক। জনসাধারণ তাঁদের কাব্যে মশগুল হয়েছিল তখন। এই সব কবিদের অনেকেই আবার কাব্য-প্রতিভার বিশেষ অধিকারী ছিলেন।

গ্রাম্য গোপন প্রেমের মাধ্যমে রাধাকৃষ্ণ প্রেমের গাঢ়তা প্রকাশ করেছে কবি জনসাধারণের একজন হয়েই। আয়ান বেলা অবসান দেখে কর্ম সমাপনান্তে তাড়াতাড়ি বাড়ী চলেছে। এদিকে নায়িকার স্বামীর অনুপস্থিতির সুযোগে কৃষ্ণ এসে রাধিকার সাথে মিলেছে ধরা পড়ার ঝুঁকি ঘাড়ে নিয়েই :

বেল অবসান আয়ান চলিল বাড়ী।
একাকিনী বউ ঘরে নাকি কেউ
পালংকে বসিয়া ফেরি॥
মুচকি হাসিয়ে নিকটে বসিয়ে
কহিছে রসিক রায়॥
তব ননদিনী কোথা বিনোদিনী
আছে লো গোপন প্রায়॥

চোরের মতই কৃষ্ণ রাধিকার সান্নিধ্যে এসেই তার দজ্জাল ননদের কথা জিজ্ঞেস করছে প্রেম নিবেদনের কথা ভুলে গিয়ে। এতে কৃষ্ণের ব্যাকুল প্রেমাকর্ষণের কথাই বিশেষ প্রস্ফুরিত হয়। কেন না ননদের হাতে লাঞ্ছিত হওয়ার আতংকে শিহরিত কৃষ্ণ-রাধার আকর্ষণ উপেক্ষা করতে পারেনি।

শাশুড়ী তোমার বিবাদী আমার
সেই বা গিয়েছে কথি।
তুলিয়া বদন কও না বচন
কোথা গেল নিজ পতি॥

এইবার কৃষ্ণ রাধাকে প্রেম নিবেদন করেন—

তা' শুনে কালা বাড়াইলে জ্বালা
ধরিল রাইয়ের করে।
হাত ছাড় প্রাণনাথ কে কথি আসিবে ঘরে॥
একে কলংকিনী করেছ হে তুমি এ তিন সংসার মাঝে।
লোক জনার কাছে বসিনা তরাসে মরমে মরিহে লাজে॥

ব্রীড়ানতা রাধিকার হাত ছাড়িয়ে নেওয়া তার মনের কথা নয়। কেন না

সংগে সংগে কৃষ্ণ প্রেমের জ্বালা সহ্য করতে সে সকল সময়ই ব্যস্ত তা' প্রকাশ করে ফেলে,

কৃষ্ণ বলে—

কি বা বল প্যারী বুঝিতে না পারি,
তোমার মনের কথা।
সদাই হাস্য মণ্ডলে রও বাক্য নাহি কও,
তুমি হে প্রেমের দাতা ॥
মথুরা নগরে যশোদার ঘরে
জনম নিলাম বা কেন।
রাই প্রিয়ে হব সুখেতে রহিব,
মরণ জীবন মন।।

কৃষ্ণের জন্ম গ্রহণের উদ্দেশ্য রাধা প্রেমের রূপ প্রকাশের জন্য। মানুষের জীবন শুধু ভগ্‌বদ্‌ প্রেমাস্বাদিত নির্বাণ সাধনেই সার্থক।

কৃষ্ণের কথার প্রত্যুত্তরে রাধিকা বলছে—

গুরু এ বিচ্ছেদ মেটে নাকো খেদ,
আমি তো অবলা যদি।
জন্মকে ঘোষণা দিলে কালো সোণা
করিয়ে পিরিতী ।।
মোর অংগ পড়ে ঢলে।
চাই না বিবাদের বেণু মেঘেতে মিশাইলো তনু
ননীর পুতলী তাহে খেলে ॥

এমন সময় জটিলা কুটিলা এল। দজ্জাল গ্রাম্য নারীর ছবি এই স্থানে সুপরিস্ফুট :

হেনকালে জটিলে সমভিব্যারে কুটিলে
এগু ধায় পিছু সারে।
একে এ ঘরে দিয়েছে পা দুয়ারের কাছে উঁকি ঝুঁকি মারে
ঘরে বসে ওগো কে গো মা।
এ যে জাত যাবার গোড়া নন্দের ব্যাটা লাগিয়েছে ল্যাঠা
ছুন্দ্‌সে কালকুটে ছোঁড়া ॥

ল্যাঠা লাগলো, ছুন্দ্‌সে, কালকুটে নন্দ ঘোষের ব্যাটাকে এখানে ভ্রমেও

ঈশ্বর বলে মনে হয় না। এতো স্বাভাবিক হয়েছে এ চরিত্র। এই স্থানেই কবির কৃতিত্ব। গ্রাম্য নারীর মুখে কয়েকটা গ্রাম্য উক্তি কৃষ্ণ চরিত্রে চমৎকার রূপান্তর সাধন করেছে।

লোকের বৌ ঝি জলকে যায়।
কেন গো তার পিছনে ধায়॥

দু'কাখালে হাত দিয়ে বাহিরে শিকল দিয়ে চলে যায় রাণীর নিকটে।

বাইরে শিকল লাগলো কৃষ্ণ আটকা থাকে ঘরের মধ্যে। গোপনীয় গ্রাম্য প্রেমের ঝুঁকি নেওয়ার বাস্তব পরিস্থিতি। সবল কথায় ছোট্ট ঘটনায় স্বাভাবিক চরিত্র সৃষ্টির সার্থক প্রয়াস। যশোদা রাণী তার পুত্রের নির্দোষিতা প্রমাণের মুখ বন্ধ ক'রে দেবার ও এ অঘটন ঘটানোর একটা বিহিত ব্যবস্থা করবার জন্য চাক্ষুষ প্রমাণ দেখাতে তাকে আহ্বান করতে গেল। এখানেও কত স্বাভাবিক হয়েছে। তারা ডাকলো না আয়ানকে; ডাকলো না নন্দ ঘোষকে বা গ্রামের পাঁচজন ভদ্রলোককে। জানালো, প্রয়োজন বুঝলো যার আদরের দুলাল তাঁকে। কি এমন সোহাগ সে মা দিয়েছে যে, ছেলে এমন অন্যায় করে আব্দারে-ছেলের মত। আদরিণী মায়ের কাছে সন্তান বাৎসল্যে যে কোন অন্যায় ক্ষমাই হ'তে পারে, তাই সেইভাবে ছেলের চরিত্র গঠিত হয়েছে কিন্তু সেই ধূর্তপনা অন্যে সহ্য করবে কিসের মোহে? তাঁর আদর অপরকে কিরূপ জ্বালাতন করছে তার সাক্ষী সেই মা-ই স্বয়ং হতে পারে। এখানেও সুন্দর হয়েছে কল্পনা বিস্তার।

শুনে খেদ হবে মনে আগে যদি শুনতাম কানে,
সংগে ক'রে আনিতাম জননী।
দু' কাখালে হাত দিয়ে বাহিরে শিকল দিয়ে
জটিলে রইলো দ্বারে বসে।
কুটিলে তরাসে ধায় পিছাপিছি নাহি চায়
চলে যেন প্রত্যক্ষ রাক্ষসী॥

একজন পাহারা দেয় আর একজন মাকে ডাকতে যায়। ঐ দিকে রাধাকৃষ্ণ ঘরের মধ্যে আটকা থাকে। যশোদাকে ডেকে দেখানোর মধ্যে স্বাভাবিক ঘটনা সংস্থান হয়েছে। মা কখনও ছেলে খারাপ তা' বিশ্বাস করতে চায় না। তাই জটিলা কুটিলা যত বার তার ছেলেকে সাবধান করে দেবার

জন্য বলেছে তত বরেই যশোদা অবিশ্বাস ক'রে আশাহত করেছে তাদের। তাই তাকে ডাকতে যাবার আগে সে কথা কন্যা মাকে মনে করে দিয়েছে।

এ মাগো চল, দিব প্রতিফল, যশোদারে আনি ডেকে ।
নিতি নিতি যাই, কথা কয় তাই, সে যাক আপনি দেখে ॥

এদিকে কোন ভ্রূক্ষেপ না ক'রে রাধাকৃষ্ণ প্রেম সাগরে নিমজ্জিত। রসাস্বাদে আকণ্ঠ ভরপুর তারা।

অতি সুসংগিনীর চিত, অতি ভাব বিপরীত
দেখিলাম মা আপন নয়নে।
নয়ন ঠেরে কহেন কানু, যদি ভুলতো ভুলবো না বেণু,
এহেন দাসে মানিক চন্দ ভাষে
কিসের ভাবনা ভাবো ধণি।
আমি সেই রসের রসিক চূড়ামণি ॥।

যথার্থই এ রসের রসিকদের শিরোমণি এই বেণু-বিমোহন চির-নায়ক। রাধিকাকে কৃষ্ণ বলছে, যদি তুমি আমায় ভুলে যাও, তা'হলেও আমি বেণু ভুলবো না। বেণুর ব্যাকুল কথায় প্রেমের আহ্বানে রাধা ঘরে বাঁধা থাকতে পারবে না তা' সে জানে তাই ঐ কথা বলে।

এখানে কবি মায়ের সাক্ষাতে কৃষ্ণের এই বিপর্য্যয় অবস্থা দেখাবার চেষ্টা করেননি, তাই ছেদ টেনেছেন প্রেম ধর্মের সার কথা বলে। মানুষ ঈশ্বরকে ভুললেও প্রেমিক প্রবর প্রেমের ডাকে সকলকেই শত বাধা বিপত্তি অবহেলা করে আহ্বান করছে অহরহ।

এখানে স্বাভাবিক রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলার অন্য গাথাও পাওয়া যায়। যা' পল্লীর যুবক যুবতীর গ্রাম্য প্রেম রাধাকৃষ্ণের নামান্তরে প্রচারিত ও প্রচলিত। স্বভাব সুন্দরী রাধিকার ছোট্ট ছবি সামান্য কথায় সুন্দরভাবে রাধিকার রূপকে বিকশিত করছে। প্রয়োজন হয়নি কোন বড় বড় কথা বলার। সাহায্যের প্রয়োজন হয়নি বিখ্যাত কাব্য গ্রন্থের।

ওপারে জয়ন্তী গাছটি জয়ন্তী ধরি ধরি।
ডাল নুইয়ে ফুল তুলছেন রাধিকা সুন্দরী ॥
হাতও রাঙা পাও রাঙা, রাঙা মাথার কেশ।
দেখিতে সুন্দর নারীর নবীন বয়েস ॥

বুকের মাঝে নরবর্তন গলায় পুতীর মালা।
রাধিকা জলকে যাবার বেলা॥

রাধিকার জল আনতে যাবার বেলা হয়ে এল। গ্রামের বধূদের সখি সমভিব্যাহারে জল আনতে যাওয়ার রেওয়াজ বহুকালের। আর এই বধূদের জলকে যাওয়া বহু কবিকে তাদের কাব্য সৃষ্টির খোরাক যুগিয়েছে।

এগুকার নারী জলকে যায় তারই বা কেমন বারি।
পেছুকার নারী জলকে যায় হাতেতে সোণার ঝারি॥
জল ফেলে জল আনতে গেলাম কলসী গেল ভেসে।
কদম ডালে ছিলেন কৃষ্ণ ধরলেন হেসে হেসে॥
জলের উপর জলের বসতি তাহার উপর ঢেউ;
পদ্ম কমলা সখিকে তোমরা বসিতে দেখেছ কেউ॥

রাধিকার জল ফেলে জল আনতে যাওয়াতেই যত গলদ। আর এইজন্যই চোখের জলে কলসী ভেসে গেছে। রচিত হয়েছে কত কাব্য। প্রেম বন্যায় ভেসে গেছে বাঙলাদেশ। রাধিকার চোখের জলের জোয়ারে কত শক্তি। তাই সেদিন থেকে কত লোককে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে তার ইয়ত্তা নেই। এই জল ফেলে জল আনতে যাওয়ার কথায় রাধা প্রেমের মূল সুর প্রকাশ করেছে। কদমতলার কৃষ্ণকে বার বার দেখবার লোভ; প্রেমের আকর্ষণে পাগলিনী রাধার গতায়াত লীলা প্রকাশের চরমতম দ্যোতনা। তার ডাক শুনলে ভগবদ্‌মুখী মানুষ আন কাজে শত কাজ করে বেড়ায়। অকারণে কত কারণের সৃষ্টি করে।

এমনিভাবে রাধিকার বিরহ যন্ত্রণার সুরু হয় আর এই বিরহেই রাধাপ্রেমের পরম সার্থকতা। তাই তো মহামিলন এত মধুর। আকুল বাঁশরী তানের সেই জন্যই এত মহিমা। পাণ্ডিত্যধ্বজী কত কবির রাধিকার বর্ণনা আছে; আছে কত কবির বিরহ বিষয়ক পদ। কত শত লোক কত ভাবে, কত ভাষায় বার বার ঐ এক কথাই বলে চলেছে। এখানে অজ্ঞাতনামা গ্রাম্য কবি সহজ, সরল গ্রাম্য কথায় চির প্রতিপাদ্য রাধা প্রেমের কথা বলে চলেছে। রাধিকা বলে,

এক এক সখি ভেবে দেখ দেখি এমন কপাল কার।
আমা ছাড়া হরি গেছে মধুপুরি কেমনে আসিবে আর॥
আসি বলে ভ্রমর গিয়াছে চলে।
বাসি ফুলে ভ্রমর বসিবে কি ভুলে॥
মনে নাই তোমার গরু চড়া' হবে কবে হয় দেখা।
হাসতে হাসতে কাছুকে গিয়ে কেবল নারীর মন রাখা॥

মানব প্রেমের সুন্দর প্রকাশ হয়েছে এখানে। পথের পথিক চলতে চলতে যেন নিজের অজ্ঞাতে এই সাধন পথে ক্রমশঃ অগ্রসর হয়। তার আনুকূল্যে থাকে মানবীয় প্রকৃতি। তাই এই গ্রাম্য সাহিত্য এত প্রসার লাভ করেছিল। এই গাথা কবিতাগুলির ভাব উপলব্ধি করতে কোন বিশেষ শিক্ষকের প্রয়োজন হয়নি। কোন বিশেষ জ্ঞানের সহায়তা করতে হয়নি এই রস আস্বাদন করবার জন্য। রাধিকা কৃষ্ণ প্রেমকে স্বার্থ-দংষ্ট্র প্রমাণ করতে চাইছে; তাতে নিজ প্রেমের প্রগারতার কথাই সবিশেষ প্রকটিত হয়। পুরুষের পক্ষে যেন নারীর মন রাখা শুধু মাত্র দায় হয়ে পড়ে। প্রাণেব সাড়া তাতে নেই। কেবল তার আকুলি ব্যাকুলি নিরর্থক হয়ে যাচ্ছে নিষ্ফল রোদনে।

এমনি ধারা বহু সংগীত গ্রামে গ্রামে লোকমুখে ছড়িয়ে রয়েছে। গ্রাম্য প্রেমের সহজ সরল আকর্ষণে আজিও তা' লোকমুখে বেঁচে আছে। এই গানগুলি সংগৃহীত হলে দেখা যায়, মানুষের কথা কেমনভাবে দেবতার কথায় রূপান্তরিত হয়ে গেছে। দেবতার কথা মানুষের প্রেম-জীবনের ব্যথা প্রকাশে সহায়তা করে চলেছে। এই গানগুলি অনেক সময় ভুলেও পৌরাণিক উপাখ্যানের ধার ঘেঁষেও যায়নি। অনেক সময় শুধুমাত্র কৃষ্ণকে কৃষ্ণ বলে চিনিয়ে দিতে তার জীবনের পৌরাণিক ঘটনা সামান্যই নিয়েছে। এই সাহিত্য দেশের নিজস্ব সাহিত্য এবং সকল রকম সাহিত্যের, এমন কি সংস্কৃতের প্রভাব পর্য্যন্তও মুক্ত। এই সাহিত্য তাই বাঙলার সাহিত্য, বাঙালীর সাহিত্য।

রাধাগোপের সত্যনারায়ণ পাঁচালী

যখন সাহিত্য জগতে মংগল কাব্যের জোয়ার মন্দীভূত হয়ে আসে তখন পাঁচালী রচনার দিকে স্বতঃই কবিদের দৃষ্টি পড়ে। খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি রাষ্ট্রীয় বিপর্য্যয়, মানুষের চারিত্রিক অবনতি, মহামারী-মন্বন্তর বিরাট মংগল কাব্যের কবির জন্ম দিতে পারেনি। বহুক্ষণ ধরে জমায়েত জনগণের দেবদেবীর মাহাত্ম্য প্রচারমূলক মংগল গান শুনবার আগ্রহও স্তিমিত হয়ে এসেছিল। তাই কম সময়ে অল্প লোকের মধ্যে এবং পূজার সাথে সাথে পূজারীর দ্বারা মানুষের অজ্ঞাত সারেই দেব মাহাত্ম্য প্রচার হেতু পূজা প্রসার হ'ত। এমনিভাবে পাঁচালী সাহিত্যের উন্নতি হয়। সেদিনকার সাহিত্যে সত্যনারায়ণ পাঁচালী বিশেষ স্থান অধিকার করেছিল। হিন্দুদের মধ্যে সত্যনারায়ণের পূজা বহুল প্রচারিত, তাই পূর্বে প্রচার মানসেই হোক কিংবা আপামর সাধারণের মধ্যে পূজা প্রচলনের জন্যই হোক সত্যনারায়ণের বহু পাঁচালী বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। সত্যনারায়ণের পাঁচালী রচনা করবার সহজসাধ্যতার জন্যও বহু কবি এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন।

তা'ছাড়া প্রত্যেক কবির উপাখ্যানের বিষয়বস্তু স্কন্ধ পুরাণের আবন্ত্য খণ্ডের অন্তর্গত রেবা খণ্ডের ২০৩ হ'তে ২৩৬ অধ্যায়ে বর্ণিত চারটি কাহিনী। সুদূর অতীত হ'তে এই একই মূল উপাখ্যানের অনুসরণে বহু কবি নিজেদের বর্ণনা চাতুর্য্য এবং শব্দ বিন্যাসের দ্বারা সত্যনারায়ণের ব্রতকথা রচনা করেন। এই পাঁচালী লেখকের মধ্যে জনার্দন ভট্টাচার্য্য, দ্বিজ বিশ্বেশ্বর, রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য, শংকরাচার্য্য, কবি বল্লভ, দ্বিজ রামভদ্র প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। কারো পাঁচালী মূলানুগত, আবার কারো বা মূলের ছায়া অবলম্বনে লেখা। চার অধ্যায়ের স্বতন্ত্র চারিটি উপাখ্যান একত্রে সর্বজনবিদিত লীলাবতী কলাবতীর কথাই সত্যনারায়ণের পাঁচালী নামে অভিহিত।

কিন্তু স্কন্ধ পুরাণের অন্তর্গত বেরাখণ্ডের প্রাগুক্ত চারটি অধ্যায়ের গল্প চতুষ্টয়কে বাদ দিয়েও সত্যনারায়ণের পাঁচালী রচনা করবার প্রয়াস করেছিলেন পাঁচালী-কার রাধা গোপ। যুগের প্রভাবকে কাটিয়ে ওঠা অসম্ভব যদিও, অবশ্য স্বীকার্য্য, তবুও তিনি এ কার্য্যে কৃত সংকল্প ছিলেন। সত্যনারায়ণের পাঁচালীর মতই উপাখ্যানগুলির মূল উদ্দেশ্য দেব মাহাত্ম্য কীর্তনের দ্বারা পূজা প্রচার করা এবং নীতি শিক্ষা দেওয়া। এ গুলিও সাহিত্যের সম্পদ। ধর্মভীরু জনসাধারণের

মধ্যে দেবতার শাপ অভিশাপের মধ্যে পাঁচালীকার ও মংগল-কবি উপাসককে কাব্যের দেবতার পূজাব্রতী করবার জন্যই চমকপ্রদ ঘটনার অবতারণা করেন। ভক্তি-বিহ্বল শ্রোতা মুগ্ধ হয়ে শোনে। তেমনি এই পাঁচালীগুলিও গীত হবার উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছিল এবং প্রত্যেক উপাখ্যানে রাজা কিংবা বণিক ভাগ্যের নিষ্ঠুর নিষ্পেষণে সত্যনারায়ণের অর্চনা করতে বাধ্য হয়েছে। অবশ্য অন্তরাল থেকে সত্যনারায়ণ নায়ককে গুনে গুনে আঘাত দেন এবং পূজার কাঙাল দেবতা পূজা পেয়ে অভীপ্সা পূরণ করেন। সত্য-মংগল গানে এই উপাখ্যান গীত হয়। উপাখ্যানগুলি পাঁচালীর মতই ছোট কিন্তু লেখকের সমস্ত কবিতার ছন্দের সন্ধান পাবার উপায় নেই। কারণ সত্য-মংগল গানের রীতি অনুযায়ী মূল গায়েন কতক 'দোহারের' সাথে কথপোকথনের মধ্যে ঘটনা বর্ণনা করেন।

আবার কখনও সুর করে পয়ার ছন্দ আবৃত্তি করতে থাকেন। মুষ্টিমেয় লোকের মুখে এখন এই সব পাঁচালী আপন সত্বা বাঁচিয়ে রেখেছে। লীলাবতী কলাবতীর উপাখ্যানের আকর্ষণ বশতঃই সাধারণের রাধাগোপের পাঁচালী বিষয়ে অনবহিতই ছিল। তাই সত্য-মংগল গানের উপজীব্য এই পাঁচালীগুলির আসর এখন কৃষ্ণকথা, ধ্রুবচরিত্র প্রভৃতি গানে মুখর। লীলাবতী কলাবতীর উপাখ্যানের মোহে এই পাঁচালীগুলিকে কেউ আমল দিতো না, তাই অবহেলিতও হয়েছে। রাধাগোপের পাঁচালী উদ্ধার করা অনুসন্ধান সাপেক্ষ কারণ কোন পুঁথির সন্ধান পাওয়া যায় না। মূল গায়েনরাও কোন সন্ধান দিতে পারে না।

একত্রে গ্রথিত রাধাগোপের রচিত তিনখানি পুস্তক। উই কবলিত একটি বিরাট পুঁথির সন্ধান পাওয়া গেছে। তাঁর লেখা এই পুস্তক তিনটি মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থ।* এই গ্রন্থে বা সত্যনারায়ণের একটি মাত্র পাঁচালীতে তিনপ্রকার ভনিতা দেখা যায়, আবার কোন কোন পাঁচালীর শেষ অংশ পাওয়া যায় না।

রাধা গোপে ভনে সত্যদেব চরণে
একমনে শুন সর্বজন ॥
পীরের চরণ ধরি রাধব দাসে গায়।
অন্তিমেতে স্থান যেন ঐ পদে পায় ॥
কহিছে গোপের বালা শুন সর্ব্বজন।
সায় কর সভে সত্যদেবর ভজন ॥

* গ্রন্থ তিনটির নাম যথাক্রমে—ইমামের জংগ, হানিফের জংগ ও আমীরের জংগ। বীরভূমের যুবরাজপুর ষ্টেশনের দু'মাইল পশ্চিমে এক মুসলমান পল্লীতে গ্রন্থখানি আছে।

এই লেখকের কবিতায় লেখা আত্মজীবনী পুস্তক তিনটিতে নেই বা অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। মূল গায়েনদের মুখে তার জীবন সম্বন্ধে অল্পকথা শুনতে পাওয়া যায়। তাঁর জীবনের সংগে জড়িত কতকগুলি আলৌকিক গল্প ছাড়া জীবনীতে সত্যকারের জীবনকথা অতি অল্পই অনুসরণ করা যায়। খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ হ'তে অষ্টাদশ শতাব্দীর অর্দ্ধেক কালের মধ্যেই তাঁর আবির্ভাব হয়েছিল মনে হয়। কারণ পাঁচালী কাব্যের চরম অভ্যুত্থানের দিনেই তাঁর কাব্য রচনা করাই সম্ভব। বহু পূর্ব হতেই এক মূল উপাখ্যানকে নিয়েই পাঁচালী রচনা করার পদ্ধতিতে যখন সাহিত্য জগতের সকলেই ব্যস্ত তখন তিনি লেখনী ধারণ করেন—নতুনত্বের আস্বাদন দেবার জন্য। এ ধারণা কল্পিত হলেও অসংগত নয়। রাধাগোপের জন্মস্থান বর্ধমান জেলার ওড়গ্রামে। তিনি বৃদ্ধ বয়সে কুষ্ঠ ব্যাধিতে আক্রান্ত হন। নিজে মূর্খ ছিলেন এবং গরু চরাতেন। একদিন বৈশাখী দুপুরে একটি বটবৃক্ষের তলে শুয়ে ছিলেন। দূরে তাঁর গরুগুলি ঘাস খাচ্ছিল। এমন সময় এক সন্ন্যাসী রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে বিশ্রাম মানসে শ্যাওড়া গাছের তলে বসেন; সংগে সংগে ঐ গাছে পদ্মফুল ফুটে ওঠে। রাধা দাস তা' দেখে সাধুর কাছে যান। তখন সাধু হাতের কিস্তি তাকে দিয়ে বলেন, বাবা, পিপাসায় চলতে পারছি না। দুধ খাওয়াতে পারিস? গ্রাম ত এখনও অনেক দূর।

—বাবা আমার কোন গাইয়েরই বাছুর নাই। দুধ দেবে না কেউ।—রাধা দাস দুঃখে অভিভূত হয়ে পড়েন।

সন্ন্যাসী হাসতে হাসতে বললেন, ঐ সাদা গাইটা দুধ দেবে।

ওটা ত বাঁজা (বন্ধ্যা) গাই।—একটু হাসলে সে। আচ্ছা গিয়ে দেখ না?

তারপর রাধা দাস আশ্চর্য্য হয়ে সাদা গাইটার দুধ সন্ন্যাসীকে দেন। সন্ন্যাসী অর্ধেক দুধ খাওয়ার পর অর্ধেক ফেলে দিতে বললেন। কিন্তু তিনি না ফেলে ভক্তি ভরে খেয়ে ফেলেন এবং সংগে সংগে ব্যাধি মুক্ত হন। তখন সন্ন্যাসীর পা জড়িয়ে ধরে বললেন, আপনি কে মহাপুরুষ?

তিনি বললেন, আমি সত্যনারায়ণ। আজ হ'তে তুই আমার মাহাত্ম্য কীর্তন করতে আরম্ভ কর।

আমি যে মূর্খ, কি গান করবো?

তুই মূর্খ থাকবি না। প্রতি রাতে আমি স্বপ্নে তোকে পাঁচালী গান শিক্ষা দেবো।—সত্যনারায়ণ অন্তর্ধ্যান হয়ে গেলেন।

সেইদিন থেকে নিদ্রিত অবস্থায় রাধাগোপ নাকি সত্যনারায়ণের কাছে গান শিখতেন। প্রাচীন কবিদের প্রায় প্রত্যেকেরই কাব্যোৎপত্তির আদিতে দেখা যায় দেবতা কবিকে কাব্য লিখতে আদেশ দেন এবং শক্তি সঞ্চার করেন। কোন কবি স্বপ্নে দেবতার দেখা পায় আবার কেউ চোখের সামনে অপরূপ রূপ দেখে। কাব্যের প্রতি সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্যই এই অলৌকিক ঘটনার সৃষ্টি করা হতো হয়তো। ঐশী শক্তির ঐরূপভাবে প্রকাশ হিন্দুরা অস্বীকার করে না। রাধা দাসের সৃষ্ট চরিত্রে মানুষের উপর দেবতার দারুণ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। মানুষ তাঁর হাতের ক্রীড়নক ছাড়া আর কিছুই নয়। নিম্নোক্ত সত্যনারায়ণের কথায় দেখা যায়, মংগল কাব্যের দেবতাদের মতই তিনি মানুষের হাতে পূজা পাওয়ার জন্য কত কাণ্ডই না করেন।

কাঞ্চন নগরের রাজার তিন স্ত্রীর চার পুত্র। তৃতীয় স্ত্রীর পুত্রই সর্বাপেক্ষা ছোট। তাঁর নাম দেবব্রত। রাজার বা অন্য পুত্রদের নাম পাওয়া যায় না। রাজার অতুল ধন-ঐশ্বর্য, হাতি-ঘোড়া, লোক-লস্কর; কিন্তু এক বৎসর পূর্বে ছোট রাণীর মৃত্যু হয়েছে। ছোট রাণী সত্যনারায়ণের পূজা করতেন। রাজা কিন্তু এ দেবতাকে বিশ্বাস করেন না। তাই ছোট রাণীর মৃত্যুর সংগে সংগে রাজবাড়ী হ'তে সত্যনারায়ণের পূজা বন্ধ হয়ে গেছে। রাণী রাজাকে লুকিয়ে পূজা করতেন। তাঁর পুত্র দেবব্রতও সত্যনারায়ণের ভক্ত কিন্তু রাজার ভয়ে পূজা করতে পারে না। লুকিয়ে পূজা করবার সাহসও হয় না।

সেদিন কোজাগরী পূর্ণিমা। রাজা তাঁর তিন পুত্রকে ডেকে বললেন, এই চাঁদনী রাতে কি করা উচিত?

কেউ বললে রাজ্য জয় করার জন্য যাত্রা করা উচিত। কেউ বা বললে, ভাল খাবারের বন্দোবস্ত করাই সমীচীন। আবার কেউ বললে, গানের আসর বসানো ও সংগীত শ্রবণ করাই ঠিক। দেবব্রত বললে, এমন চাঁদনী রাতে প্রকৃতি হেসে খান খান হয়ে পড়ছে নিজেকে দেবতার পায়ে উৎসর্গ করবার জন্য। এমন দিনে সত্যনারায়ণের পূজা করা মানুষের উচিত। কে যেন রাজার মাথায় বজ্রাঘাত করলে। তিনি যেন সম্বিৎ হারিয়ে ফেললেন। পরে নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, আমার রাজপুরীতে সত্যনারায়ণের নাম! এ হ'তে দেব না, হ'তে দেব না। দেবব্রত, আজ থেকে রাজপুরীতে তোমার স্থান নেই। বনবাসই তোমার একমাত্র শাস্তি। কথাগুলো বলতে রাজার ঠোঁট কাঁপলো না।

হৃদ্‌কম্প হ'ল না। তিনি যেন আশু বিপদের হাত হ'তে অব্যাহতি পেলেন। অপর পুত্রগণ কুগ্রহের চির-অস্ত দেখে আনন্দ-চঞ্চল হয়ে উঠলো।

দেবব্রত স্ত্রীর কাছে বিদায় নিতে এল। নানা সান্ত্বনার কথা বলে বনবাস যাত্রার কথাও বললে। দেবপদে অটুট মতি রেখে রাজপুরীতেই থাকতে বললে তাকে দেবব্রত। স্বামীর বনবাসের কথা শুনেও যে নারী বিস্ফারিত চোখে তাকায়নি, একবিন্দু জলও পড়েনি চোখ দিয়ে অমংগল আশংকায়, সেই নারী রাজপুরীতে নানা আমোদ প্রমোদের মধ্যে দিন যাপন করার কথায় আর নিজেকে সামলে রাখতে পারলো না।

পর্বত-প্রবাহিনী ঝরণার মত অশ্রুধারা ঝর্‌ঝর্‌ ঝরতে লাগলো।

শুনিয়া এ সব বাণী ক্ষোভ করে রাজনন্দিনী
(বলে) খেলা হইল চল যাই বনে।
আমি যাই পিছু পিছু মনে না ভাবিয়া কিছু
(যেন) স্বামী সহ উলংগ মশানে॥
তুমি ওহে প্রাণনাথ যাই আমি তব সাথ
(তুমি) কৃপা করি না করিহ আন।
রাজপুরী দারুণ শেল, দুঃখ দিবে গো অঠেল,
(দেখে) আলাপ করন্তি নানা থান॥

শত প্রবোধ দেওয়া সত্ত্বেও রাজকন্যা সরলা বাধা মানলো না। তখন সে দশমাস গর্ভবতী। এ সব জেনেও সে দেবব্রতের পা জড়িয়ে ধরে সংগে যাবার জন্য কাঁদতে লাগলো। অগত্যা সে স্ত্রীকে সংগে নিয়ে পূর্ণিমা নিশি ভোরে বনবাস যাবার জন্য রওনা হ'ল।

বনানীর পথে যেতে যেতে তারা নিবিড়তম অরণ্যের মাঝে এসে গেল। সেখানে সূর্য্যালোক মাটি স্পর্শ করতে পারে না। দূরে শ্বাপদ আরণ্য-জীবের গর্জন থেকে থেকে নিঃশব্দ বনভূমিকে শব্দিত করছে। তখন ঘোর অন্ধকার। রাত্রি দ্বিপ্রহর। সেইখানে প্রসব যাতনা-কাতর সরলা ভূমিষ্ঠ পুত্রের মুখ চকিত হয়ে একবার দেখে চোখ বন্ধ করলে। সে তখন জীবন্মৃত। দেবব্রত স্ত্রীর শুশ্রূষা করতে করতে বললে,

হেনক সৃজিল বিধি নাহি জানি কোন বুদ্ধি
এবে আমার হইল গোঁসাই।

এত ডাকি বিধাতারে ধিক বলি অদৃষ্টেরে,
শত বাকে কোন পথ নাই ॥
ভিন বনে থাকিব চাষ কর্ম করিব
ঘুচাইব দুঃখের জঞ্জাল।
আজ মোর একি হল্য সব কিছু কুথা গেল্য,
সরলা পথে হল্য যে গো কাল ॥

সরলা অধিকতর সুস্থ হলে দেবব্রত বললে, একটু আগুনের সেক পেলে তুমি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যাবে। ঐ বহুদূরে ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখা যাচ্ছে। সেখান হতে আগুন নিয়ে আসি। আমি যাবার সময় মাথার পাগড়ীটা ছিড়ে ছিড়ে গাছের ডালে ডালে রেখে দিয়ে যাবো। যদি আমার আসতে বিলম্ব হয়, তা'হলে ঐ চিহ্ন ধরে তুমি আমার সন্ধান করো।

আগুন অন্বেষণে চলে গেল বনবাসী রাজকুমার। সরলা তার গমন পথের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। কিন্তু বহুক্ষণ অতীত হয়ে গেল কৈ সে তো ফিরে এল না। এদিকে দেবব্রত আগুনের সন্ধানে আসতে আসতে একটা বিরাট নদীর ধারে এসে পড়লো। সেখানে—

বণিকে নোঙর করে জলের উপর।
মাঝি মাল্লা রান্না করে বসে বালুচর ॥
রান্নার দফায় কেহ নারে হাতাবেড়ি।
হুজুগে হুজুগে কেহ করে দৌড়াদৌড়ি ॥
কেহ কেহ চড়ে বসি খেলে জুয়াখেলা।
কেহ বলে তারাতারি রান্ধ এই বেলা ॥
ভিপিনীর ঘাটে নৌকা আছে এঁটে বসে।
সন্ধান করিতে হবে নরবলি শেষে ॥
শ্মশান কালিরে দিলে বলি উপহার।
এই ঘাটে নাও চলে একি ব্যবহার ॥
ভিপিনীর ঘাটে রাজ দিলে গো তখন।
ভূতিনীর গান সবে করেছে শ্রবণ ॥

দেবব্রত এসে নাবিকদের কাছে আগুন চাইলে। তখন সকলের চোখে আনন্দ খেলে গেল। কেউ বা ভক্তিভরে শ্মশান কালীর উদ্দেশ্যে প্রণাম নিবেদন করলে। বণিকদের কাছে সংবাদ গেল। উপযুক্ত বলির লোক পেয়ে সকলে

ত্বরিত গতিতে সব ব্যবস্থাই করে ফেললে। নৌকার উপরেই বলি দেবার প্রথা। দেবব্রতকে হাড়-কাঠে বেঁধে বণিক খাঁড়া উত্তোলন করেছে; চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে সকল নৌকা তীর বেগে এক রাজার দেশে পৌঁছে গেল। বণিক ভাবলে যে এ বেশ মজা। নরবলি দেওয়া হ'তে রেহাই পেলাম। এ লোকটিকে না ছাড়লে আর কোথাও নৌকা লাগবে না। বলি না দিয়ে কেবল বলি দেবার ব্যবস্থা করলেই হ'ল!

সরলা আর অপেক্ষা করতে পারলে না। বহুবার নিরীক্ষণ করে করে চিহ্নগুলো লক্ষ্য করতে পারলে কিন্তু বনের মাঝে পা ফেলতে শরীর আড়ষ্ট হয়ে ওঠে তার। তবুও তখন দিন হয়ে এসেছে। একটী অচেনা বালক কোথা হ'তে এসে সরলার হাত ধরে নদীর ধারে নিয়ে এল। কিন্তু সেখানে এসে সরলা দেখলে কারা খাবার দাবার ফেলে চলে গেছে। শৃগাল কুকুরে সেই খাবার নিয়ে মারামারি করছে। সরলা কিছু অনুমান করতে পারে না, শুধু উচৈঃস্বরে কাঁদে।

আমার কপাল গোড়া কেমনে দেশে যাই।
কেমনে ভেটিব সে স্বামীরে কোথা গেলে পাই॥
কোনখানে আছে পিয়া কেবা জানে নাই।
সে কি জলে ডুবে গেল কিংবা আছে গাঁয়॥
হেন ভেবে চোখের জল নিমিষে শুকায়।
তিলেক ধৈরজ নাহি ধরে প্রাণ যে বেরাই॥
না বুঝিয়া কোন মর্ম চারিপানে ধায়।
কে দিবে মোরে স্বামী কারে যাইয়া চাই॥

তখন সেই ছেলেটী প্রবোধ দিয়ে তাকে একটী গ্রামের রাস্তা দেখিয়ে দিয়ে কোথায় চলে গেল। বলা বাহুল্য সত্যনারায়ণ বালকের রূপ ধরে পথ দেখিয়ে সিংহ বাঘের হাত হ'তে তাকে রক্ষা করলেন; যেমন করে বণিকের খড়্গের হাত হতে দেবব্রতকে বাঁচালেন। দীনা সরলা শিশু সন্তানটিকে কোলে করে এক কাঠুরিয়াদের পল্লীতে এসে আশ্রয় নিলে। কাঠুরিয়াগণ তার দুঃখের কথা শুনে এক বিধবার ঘরে থাকবার বন্দোবস্ত করে দিলে।

সেখানে দেবব্রতের পুত্র স্বর্ণময় 'মানুষ' হ'তে থাকে। একদিন পুত্রকে স্নান করিয়ে দেবার সময় সরলা দেখে তার শরীর হ'তে বিন্দু বিন্দু জল মাটিতে পড়ে সোণা হয়ে যাচ্ছে। সেদিন থেকে সে সোণার বিন্দুগুলি কুড়িয়ে রাখতো। এমনিভাবে দু' কলসী সোণা তার জড়ো হয়েছে। পূর্ণিমার চাঁদের মত

স্বর্ণময়ের মুখ দেখে সে দেবব্রতের মুখ ভুলতে চেষ্টা করে কিন্তু পুত্রের মুখ পিতার মুখকেই বার বার স্মরণ করিয়ে দেয়। সে আর স্থির থাকতে পারে না। পাগলের মত হয়ে যায় সরলা। কিছুতেই আর নিজেকে সামলে র'খতে পারে না। মনে পড়ে শ্বশুরের কুব্যবহার। সকলের অবিচার অত্যাচারের কথা সে ভুলতে পারে না।

এদিকে এক রাজ্যের রাজা গত হয়েছেন। তার সিংহাসন শূন্য পড়ে আছে। রাজার একটি মাত্র নাবালিকা কন্যা আছে। রাজ্য প্রায় অচল।

গড়ুর নামে এক পক্ষ অতি বড় বুঝা।
যার মাথে ছায়া দেয় সেই হয় রাজা॥

এই গড়ুর পক্ষী স্বর্ণময়কে ছায়ায় ঢেকে ফেললে এবং সংগে সংগে নীচে নেমে এসে তাকে পিঠে চড়িয়ে নিয়ে অতি দ্রুত উড়ে গেল। তখন স্বর্ণময়ের বয়স চৌদ্দ বৎসর। সেই বিধবা তা দেখে হায় হায় করতে লাগলো। সরলা ঘরে ছিল না। কাঠ কুড়াতে গিয়েছিল বনে। এ দুঃখ সংবাদ গ্রামে রাষ্ট্র হ'ল। সরলা শুনে মূর্চ্ছা যায়। ধিক্কার দিয়ে যায় সকলে সরলার অদৃষ্টকে। সরলা কি করে পুত্রের সন্ধান করবে? পাগলিনী সরলা যে নদীর ঘাটে তার স্বামী নিরুদ্দেশ হয়েছে সেখানে পূর্ব সঞ্চিত সোণা খরচ করে এক বিরাট প্রাসাদ নির্মাণ করিয়ে সেখানে বাস করতে লাগল।

আর প্রতিদিনের কাজ শুধু নদীর দিকে তাকিয়ে থাকা। কত নৌকা যায় যদি তার ভেতর থেকে সে স্বামীকে দেখতে পায় এই তার আশা। কিন্তু একদিন একটা নৌকা এসে সেই ঘাটে নোঙর করলে। তার ভেতর হ'তে পুত্রকে নামতে দেখে সরলা নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারে না।

মাতা পুত্রে মিলন হ'ল। ছেলে রাজা হয়েছে শুনে আনন্দ আর ধরে না। স্বর্ণময় বললে এবার বাবার সন্ধান করা কর্তব্য। নদীর ধারে তিনি এসেছিলেন হয়তো কেউ তাঁকে ধরে নিয়ে গেছে। হয়তো আবার কোন নৌকায় তাঁর সন্ধান মিলতে পারে।

মা বললেন, গত রাতে একজন জ্যোতির্ময় পুরুষ আমায় বলেছিলেন, নৌকা সন্ধান করতে। তারপর আমার ঘুম ভেংগে যায়। নদীতে যে সব নৌকা যাতায়াত করে সে সব অনুসন্ধান করবার জন্য লোক নিযুক্ত করা হ'ল। তারা প্রত্যেক নৌকা দেখার পর আরোহীদের দু'লক্ষ করে টাকা দেয়। কিন্তু একদিন এক নৌকার মাঝির টাকার লোভেও নৌকা ভিরাতে রাজী হয় না

দেখে সকলে স্বর্ণময়কে সংবাদ দিলে। স্বর্ণময় এল। মালিক বললে, আমার সময় নষ্ট করলে খুব অন্যায় হবে। ব্যবসার ক্ষতি হয়ে যাবে অনেক। স্বর্ণময় কোটী কোটী টাকা দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়েও রাজী করাতে পারলো না। তখন জোর করে নৌকা দেখলে পিতার সন্ধান মিলল। বণিক বলির পাঁঠার মত কাঁপতে থাকে। ছেড়ে দিলে স্বর্ণময় তাকে। সরলা স্বামীকে দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল।

সেখানে বন কেটে রাজ্যপুরী নির্মাণ হতে লাগলো। হাজার হাজার শ্রমিক কাজ করছে। এক বৃদ্ধ তিনজন শ্রমিকের জন্য খাবার নিয়ে এল। ছাদের উপর থেকে তাদের দেখে সরলা স্বর্ণময়কে বললে, লোকগুলোকে চেনা চেনা লাগছে, তুমি ওদের সকলকে এখানে আন। স্বর্ণময়ের কথা শুনে কেউ রাজপুরীতে যেতে রাজী হ'ল না। বৃদ্ধকে ধরে আনা হ'ল। কিন্তু দোতলার উপর হতে ভয়ে সে লাফিয়ে পড়লো। সংগে সংগে একটা অদৃশ্য হাত তাকে ধরে আবার তুলে দিলে। ইনিই দেবব্রতের পিতা। সত্যনারায়ণের রোষ বহ্নিতে রাজত্ব ছারখার হয়ে গেছে। আজ এই অবস্থা। দিন মজুর খেটে সকলে উদরান্নের সংস্থান করে। সরলা শ্বশুরকে পরিচয় দিলে না। বৃদ্ধ রাজাও চিনতে পারলেন না। সরলা শ্বশুরকে খাওয়াবার জন্য রান্না করতে লাগলো।

প্রথমে রান্ধিল শাক পাটললিতা ঘৃতভাজ
গুলা মাছে ঘুনন্টারী ধান (?)।
তরিতরকারী বহু আনিল পিড়িং কোদরী অম্বল
জাল মাছে ফুলবড়ি চচ্চড়ি॥
চেঙ মাছে ঝোল করে পাকাল মাছ ভাটা ধরে
রুই মৃগা ভাজে দড় বড়ি।
আম কুটে ইলসা মাছ কাতলা আড়ই গড়ুই সাত
আর কত রান্না যে রান্ধিল।

খাবার সময় বৃদ্ধ রাজা তার পুত্র দেববতের কথা স্বর্ণময়কে বলতে লাগলেন। স্বর্ণময় বললে, আপনি এখনও ত সত্যনারায়ণের পূজা করতে পারেন। আজ তো কোজাগরী পূর্ণিমা। আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

বৃদ্ধ বললেন, কিন্তু আমার ছেলেটিকে পাবার ব্যবস্থা কে করবে?

আমিই।—হাসে স্বর্ণময়। বাবা; বাবা। দেবব্রত এসে পায়ে পড়লো। মিলন হ'ল সকলের সাথে সকলের। সত্যনারায়ণও পূজা পেয়ে সন্তুষ্ট হলেন।

সত্য মংগল গানে এমনি ধারা তু'একটী উপাখ্যান শুনতে পাওয়া যায়। তাছাড়া নাগা বৈরাগী প্রভৃতি জাতির কাছ থেকেও সন্ধান মিলে। সত্যপীরের গানেও অনেক গাথা কাহিনী সত্যপীরের মহিমা উদ্দীপনা করে। তবে তা' অতি অল্প। মুখে মুখে ফেরে বলে অতি দ্রুত লুপ্ত হয়ে চলেছে। ভিক্ষা দান করাই যে দেশের ধর্ম ছিল, সে দেশে ভিক্ষুক ভিক্ষা পায় না আজ। তাই জাত ভিখারীরা আর যত্ন করে পিতা পিতামহেব কাছ হ'তে শিখে রাখে না এ সব উপাখ্যান। এই উপাখ্যানগুলি একত্রে কোন পুঁথির পাতায় নিবদ্ধ আছে হয়তো কিন্তু তা' দূরে পল্লীতে অবহেলায় ধ্বংস হয়ে চলেছে। কি সাংস্কৃতিক, কি সামাজিক, কি আর্থিক কোন দিকেই আজ পল্লীর উন্নতি নেই। একদিন পল্লীবাসীর জীবনের সাথে এইসব উপাখ্যান প্রভৃতি অংগাংগীভাবে জড়িত ছিল। খনার বচন অনুসারে আকাশে বৃষ্টির লক্ষণ খুঁজতো চাষী। চলিত প্রবাদ বাক্য মানতো সকল লোকে। পল্লীতে পল্লীতে কবিগান, পাঁচালীগান হ'ত। এদিন বুঝি গত হয়ে যায়। হয়তো আবার পল্লীর সুদিন আসবে। পেটভরে তুবেলা খেতে পাবে সকলে। কিন্তু সেদিনের পল্লী হারিয়ে গেছে তাকে হয়তো খু জে পাওয়া যাবে না।

লোক সাহিত্যে সাঁওতাল বিদ্রোহ

মানুষ ইতিহাস লিখতে আরম্ভ করে সভ্যতার কোন আদিতে। শিলাপটে, পর্বত গাত্রে, তাম্রফলকে, হর্ম্যশীর্ষে যশো গাথা কীর্তিত রাখবার প্রবণতা থেকে ইতিহাস লেখার চর্চা আরম্ভ হয়। বেঁচে থাকবার আগ্রহই মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে। চারণদের রাজ প্রশস্তি থেকে এই ধারা লোকমুখে বেঁচে থাকে। গাথা গানে রচিত হয় ইতিহাস। গ্রাম্য সাহিত্যও কত বিচিত্র ঘটনা লোক কবির কল্পনায় কবিতার ছন্দে রূপায়িত হয়ে মানুষের মুখে মুখে প্রচারিত হতে থাকে। অনেক সময় ইতিহাস নতুন ভাবকল্পনা লাভ করে কাব্য সুষমায় ঝংকৃত হয়ে ওঠে।

স্থানীয় কোন ঘটনাও অনেক সময় গাথা গানে রূপলাভ করে। ক্ষুদিরামের ফাঁসি লোক কবির কল্পনাকে এমন করে বিক্ষুব্ধ করে যে—একবার বিদায় দাও মা ঘুরে আসি—এই অপূর্ব সংগীতের জন্ম দেয়। বর্গীর হাঙ্গামা ঘুমপাড়ানী গান রচনা করবার প্রেরণা জোগায় লোক কবিকে। কখনও বা ক্যানেল কাটাকে কেন্দ্র করে গানে গানে ক্যানেলের ইতিহাস রচিত হয়। ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা বা দামোদর পরিকল্পনার সুন্দর ইতিহাস জন সাধারণ্যে প্রচারিত হয়। বাল্য বিবাহ রোধের ইতিহাস আইন পাশ হ'লেও সে বিষয়ে অনেক গান রচিত ও লোকমুখে প্রচারিত ছিল। পাকিস্তান সৃষ্টির বিষয় বস্তুকে নিয়েও লিখিত অনেক গান শোনা যায়। এরোপ্লেন, রেলগাড়ী এমন কি ধান ভানা কলকে নিয়ে যে সব লোকসংগীত রচিত হয় তার মধ্যেও অনেক সমসাময়িক ইতিহাসের উপাদান বিধৃত হয়। কখনও বা গ্রাম্য ঘটনাকে কেন্দ্র করেও লোক গাথা রচিত হয়। যথা কুলত্যাগিনী কোন নারীর কাহিনী, অসবর্ণ বিবাহ, অবৈধ প্রেমকথা, কোন বৃদ্ধের তরুণী ভার্য্যা, বা হাড়কিপ্টে কোন লোককে আক্কেল দেবার কাহিনী বা বান ভাসির বর্ণনা লোক রচনায় অপূর্ব হয়ে ওঠে।

তেমনি সাঁওতাল বিদ্রোহের কাহিনীও সমসাময়িক কবির গানে লোক মুখে মুখে প্রচারিত আছে। সাঁওতাল হাঙ্গামায় উপদ্রুত এলাকা থেকে এই সব গান লোক মুখে শুনতে পাওয়া যায়। সংগৃহীত গানে সুসম্বদ্ধ কোন ইতিহাস শুনতে পাওয়া যায় না। তবে কিছু কিছু পারম্পর্য রেখে ঘটনা বিবৃত হয়েছে।

বিদ্রোহের কারণ বা এই হাঙ্গামা দমন বিষয়ে কোন কথা জানা যায় না। তবে সাঁওতালদের অত্যাচারের বর্ণনা মুখ্যতঃ প্রাধান্য লাভ করে।

১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে সাঁওতাল বিদ্রোহে ভাগলপুর থেকে তিন পাহাড়, রাজমহল থেকে বীরভূম জেলার উত্তর পশ্চিম এলাকা, সমগ্র সাঁওতাল পরগনা প্রভৃতি বিরাট এলাকা অত্যাচারিত হয়েছিল।

আরণ্য জীবন ত্যাগ করে সাঁওতালরা কৃষিজীবি হওয়ার সাথে সাথে উর্বর অঞ্চলে জংগল কেটে আবাদী জমি তৈরী করে। এইভাবে সাঁওতালরা ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সাঁওতাল অধ্যুষিত এলাকায় ৮৬০ বর্গমাইল উচ্চভূমি ও দামন অঞ্চলের ৫০০ বর্গমাইলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। এই সুবিস্তীর্ণ সাঁওতাল পরগনায় তারা প্রচুর শস্য উৎপন্ন করতে লাগলো। ঘর বাঁধলো, ধানের মড়াই বাঁধলো, গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, হাস, মুরগী প্রতিপালন করতে আরম্ভ করলো তারা। কলাই, আলু, সরষে, তিল, তিসি, বুট প্রভৃতি রবিশস্য প্রচুর উৎপন্ন হ'তে লাগলো। পর্য্যাপ্ত ডিম, মাংস, দুধ, ঘি প্রভৃতি বিক্রয়ের জন্য লোকালয়ের সাথে অভিন্ন যোগাযোগ করতে হ'লো। সাঁওতালদের লবণ, কাপড় পুতির মালা প্রভৃতির জন্যও তাদের দেহাতি বাজারে আসতে হলো।

এইভাবে সাঁওতালদের সভ্য মানুষের সাথে যোগাযোগের প্রথম মুহূর্তেই সভ্য মানুষ লোলুপ হয়ে গ্রাস করতে চাইলো তাদের। সাঁওতাল ব্যাপারে নিযুক্ত জেমস পন্টেট সাহেব জমি জরিপ না করে, ফসলের যথাযথ হার নির্দ্ধারিত না হওয়া সত্ত্বেও মৌজাবদ্ধ জমির উপর খাজনা ধার্য্য করেন। খাজনা ধার্য্যের সাথে সাথে জমিদার এলো। নির্ধারিত খাজনার উপর উপরি লাভের জন্য গোমস্তার সম্মান, জমিদারের ছেলের সম্মান, জমিদারের ঘোড়ার সম্মান প্রভৃতি বাবদে টাকা এবং কখনও ঘি, দুধ, হাস, মুরগী, ছাগল এমন কি দুগ্ধবতী গাভীও দিতে হতো সাঁওতালদের। ৮০,০০০ হাজার টাকা পরিশোধ করতো সাঁওতালরা এক লক্ষ আশি হাজার টাকা দিয়ে। এ যেন বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বীচি। ইংরেজ সাহেবরা টাকার লোভ দেখিয়ে সাঁওতালদের রেললাইন পাতবার সময় কুলি খাটবার জন্য নিয়োগ করতে থাকে। সেই সময় সাঁওতাল রমণীদের নারীত্ব অপমানিত হতে আরম্ভ হয়। সেই জন্য সাঁওতালরা বিক্ষুব্ধ হয়। এদিকে মহাজনেরা দেনার সুদ উশুল দিতেই জমি জায়গা গ্রাস করে নিতে থাকে। এমন কি জমি জায়গা, ধান, চাল, হাস, মুরগী নিঃশেষ করার পর ক্রীতদাসের মত বেগার খাটিয়েও ঋণ পরিশোধ করতে বাধ্য করতো মহাজনরা।

উদয়াস্ত পরিশ্রমের পরিবর্তে সামান্য আহার্য্য পেত তারা। এমনও জানা যায় যে কোন মহাজনের চক্রবৃদ্ধিহারে বর্দ্ধিত-কলেবর ঋণের বোঝা ঘাড় থেকে নামাতে সাঁওতালদের দু' তিন পুরুষ মহাজনের ঘরে বেগার খাটতে হতো। ঠাকুর্দার ঋণ পরিশোধ করবার জন্য নাতিকে ক্রীতদাস হয়ে জীবন কাটাতে হয়েছে।

তখন মহাজনদের দেশ চলতি পরিমাপের পাত্র 'পাই' 'সের' প্রভৃতির রকমফের থাকতো। লোকের কাছে ক্রয় করবার পাত্রকে বলতো কেনারাম অর্থাৎ বড় পরিমাপের পাত্র। আর বেচারাম ছিলো ছোট পরিমাপের পাত্র। সাঁওতালদের সংগে কারবারে মানুষ আরও লোলুপ হতো। পাই, সের প্রভৃতির তলায় ফুটো থাকতো। তাই সাঁওতালরা মাপবার সময় ঘি দুধ ঢেলে হয়রাণ হয়ে যেতো। পাই সের পূর্ণ করতে আর পারতো না। মা লক্ষ্মীর খাতা সুদের কড়িতেই ধান খেতো, চাল খেতো, ঘি, দুধ, গরু, মহিষ, হাঁস, মুরগী জমি জমা খেয়ে ফেলে শেষে পুরুষের গতর আর নারীর কাপড় ধরে টানাটানি করতো। যন্ত্রনার অস্থির হয়ে সাঁওতালরা অনেক সময় রাতারাতি গ্রামের পর গ্রাম থেকে হাস মুরগী ধান চাল নিয়ে পালিয়ে যেতো। আবার অন্যত্র বন কেটে বসত করতো। হেমন্তে গতর খাটিয়ে তৈরী করা মাঠে মাঠে সোণা ফসল উপছে পড়তো। দিনের শেষে দেবতার থানে নিজের হাতে তৈরী করা মদ খেয়ে ফূর্তি করতো। নারী পুরুষ হাত ধরাধরি করে নেচে নেচে গানের ছন্দে আকাশ বাতাস মদির করে তুলতো। বুনো জোকের মত সেখানেও সভ্য মানুষ এগিয়ে এসেছে তাদের লোভনীয় পসরা নিয়ে। দরদ ভরা মিষ্টি কথায় ভাব জমিয়ে ঢুকে পড়তো তাদের সমাজে। কাচের চুড়ি, পুতির মালা, পিছন পাড় শাড়ির সংগে সংগে দেনা ঢুকিয়ে দিতো। —যে দেনা শেষ হতো না জমি জায়গা ধানের মরাই গরু বাছুর শেষ হলেও। সাঁওতাল পরিবারে হাসির উৎসও শেষ হয়ে যেতো।

অনেক সময় পুলিস অফিসাররা এসে পড়তো তাদের সমাজে। ইংরেজ প্রভুদের ভীতি সাঁওতালদের সচকিত করে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াতো। এদের লালসার জোগাড় দিতে আরও পয়সা রোজগারের জন্য সাঁওতালদের সহরে গঞ্জে খাটতে আসতে হতে লাগলো। নারী পুরুষ উভয়কেই। বুনো যৌবন উপভোগের ক্ষুধায় সভ্য মানুষ ক্ষেপে ওঠে। লুটের মালের মত সভ্য মানুষের টানাটানি সাঁওতালদের উন্মাদ করে দেয়।

কর্তব্যবিমূঢ় সাঁওতালরা আর পলাবার পথ পায় না। অসন্তোষ ধূমায়িত হতে থাকে তাদের মধ্যে। পালবন্দী বন্য মহিষ যেমন তাড়া খেতে খেতে বাঘের

সামনেই রুখে দাঁড়ায় এক সময় তেমনি সাঁওতালরা জেগে ওঠে। ভগ্নাডিহি গ্রামের সিধু কান্থ তুই ভাইয়ের উপর দেবতার আদেশ হয়েছে বলে লোকমুখে প্রচার চলতে থাকে। তাদের নিমন্ত্রণের রীতি অনুযায়ী শালপাতা গ্রামে গ্রামে পাঠিয়ে দিয়ে দেবতার লীলা দেখবার জন্য একতাবদ্ধ হবার আহ্বান জানায় তাঁরা। হাজার হাজার সাঁওতাল ঐ ডাকে অদ্ভুতভাবে সাড়া দেয়। বন্যার স্রোতের মত মানুষ এসে জমতে থাকে ভগ্নাডিহির মাঠে। বিদ্রোহের ক্ষেত্র পূর্ব থেকেই প্রস্তুত হয়েই ছিলো। শুধুমাত্র আহ্বানের যা অপেক্ষা। ঢাল, তরোয়াল, টাংগি, বর্শা, তীর ধনুক আর কয়েকদিনের খাবার সংগে নিয়ে নারী পুরুষ সমবেত হতে থাকে। একত্র হবার অদ্ভুত শক্তি দেখে নিজেরাই প্রেরণা পায়। প্রতিকার চায় তারা অন্যায়ের। কিন্তু সাঁওতালদের কোন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছিলো না, কিভাবে তাদের আন্দোলন পরিচালনা করবে তার কোন সুসম্বদ্ধ নীতি নির্ধারিতও হয়নি। নিজেদের দুর্দশার জন্য রুখে দাঁড়ায় শুধু।

রাজমহলের বারহারওয়া ষ্টেশনের ১২ মাইল পশ্চিমে বারহেট বাজারের নিকট ভগ্নাডিহি গ্রামের সিধু, কান্থ ও ফাগু নামে তিনজন মাঝি ইংরেজদের সাঁওতাল রমণীর প্রতি লোলুপতা, পুলিস, মহাজন ও জমিদারদের উৎপীড়নের জন্য প্রকাশ্য বিদ্রোহের নেতৃত্ব করে। সিধু কান্থ লাট সাহেবের কাছে সকলে মিলে কলিকাতায় আবেদন করতে যাবার জন্য প্রস্তুত হতে থাকে।

১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে জুন নেতারা জোটবদ্ধ সাওতালদের কলিকাতা অভিমুখে রওনা হ'তে আদেশ করে। নেতাদের দেহরক্ষী ছিলো ৩০,০০০ হাজার সাঁওতাল। লক্ষ লক্ষ সাঁওতাল পথ চলতে আরম্ভ করে। কিন্তু পথ চলতে চলতে সংগৃহীত খাবার ফুরিয়ে যায়। ক্ষুধার তাড়ণায় তারা ধনীদের কাছ থেকে খাবার চেয়ে বিফল হবার সাথে সাথে খাদ্য সংগ্রহের জন্য লুটপাট আরম্ভ করে। খাদ্যের জন্য নরহত্যাও সংঘটিত হতে লাগলো। ৭ই জুলাই মহেশপুরের দারোগা মহেশলাল আগুনে যেন ঘৃতাহুতি দিলো। চুরির দায়ে সাঁওতালদের গ্রেপ্তার করতে গেল হিন্দু মহাজনদের প্ররোচনায়। সাঁওতালরা ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে হত্যা করলো। তারপর আরম্ভ করলো অত্যাচার। কেউ তাদের বাধা দিতে অগ্রসর না হওয়ায় লুটপাট, খুন জখম করতে করতে বহু গ্রাম ধ্বংস করে সাঁওতালরা।

লোক গীতি হতে যে সাঁওতাল বিদ্রোহের ইতিহাস সংগ্রহ করা যায় তা' অনেক ক্ষেত্রে তথ্য সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে।

:২৬২ তে উত্তরেতে উৎপাত জন্মিল।
আমীর মুলুক থেকে সাঁওতাল জুটিল॥
বেটাদের একান বড় মাঝি দড় যে যেখানে ছিলো।
আড়াই শ' গ্রামের সাঁওতাল একত্র হইল॥

এই গানে সাঁওতাল বিদ্রোহ আরম্ভ হওয়ার যথার্থ সাল পাওয়া যায়। এই তারিখ ইতিহাস সম্মত ; এবং গোনা আড়াই শ' গ্রামের সাঁওতালই যে একত্র হয়ে এই বিদ্রোহের সূচনা করেছিলো তা' নয় হয়তো আরও কম বা বেশী গ্রামের লোক এই হাঙ্গামায় যোগ দিয়েছিলো কিন্তু লোক কবির গান থেকে এই বিদ্রোহ যে ব্যাপকতরো হয়েছিলো তা' ধারণা করা যায়।

:করলে পরামর্শ মনে হর্ষ মুলুক মারবার তরে।
ইংরেজ মারিয়ে আমরা রাজ্য লিব কেড়ে॥

সিপাহী বিদ্রোহের ঠিক পূর্বে যে আদিবাসীরা ইংরেজকে এ দেশ থেকে তাড়াবার সংকল্পে অস্ত্র ধারণ করেছিলো তার সাক্ষী লোক কবির এই গান। অবশ্য অনেক ঐতিহাসিক এই সাঁওতাল বিদ্রোহকে নিছক স্থানীয় হাঙ্গামা বলেই বর্ণনা করেছেন। জমিদার, মহাজনদের প্রতি বিশিষ্ট সাঁওতালদের অত্যাচার বলেও অনেকে বর্ণনা করেন। ইংরেজরাও অনেক সময় ভুল বুঝেছিলো। তাই বহুদিন অত্যাচার চলার পর এই বিদ্রোহ দমন করবার জন্য সৈন্যদল নিয়োগ করে।

পাঁচপিঠের পাহাড়ে সব একত্র হইল।
সাজ সাজ ডাক সাঁওতাল সেখান হতে দিলো॥

"মহেশপুরের দারোগা পাঁচকেঠেয় আসিয়াছিল।" * এখানে এই দারোগাকে হত্যা করেই সাঁওতালরা প্রথম রক্তের আস্বাদ পায়।

কথা ধার্য্য করে পাহাড় ঘেরে পাঁচপিঠের গ্রামে।
মারুত বান্ধিব আমরা সুভবাবুর নামে॥
সুভয়া তিন ভাই শুনতে পাই শুন সবে ক্রমে।
সিধু কানু দুই ভাই কাণ্ড মাঝির নামে॥

সিধু কানু' সকলেই ঐতিহাসিক ব্যক্তি। তবে এই গানে বিদ্রোহ বোধ

* [illegible] ইতিহাস—স্বর্গীয় গৌরীহর মিত্র (৫)

নেতৃত্বে পরিচালিত হয়েছিলো বলেই মনে হয়। ইতিহাসেও একক দায়িত্ব কারো উপর ন্যস্ত করা যায় না।

করলে হুকুম জারি আমাদের জাতি ওরে।
ডাল ঘুরিয়ে নেওতা দোব সবার ঘরে ঘরে ॥

সাঁওতালদের সামাজিক রীতি অনুযায়ী গাছের ডাল পাতা ঘরে ঘরে পাঠিয়ে এই বিদ্রোহের ডাক দেওয়া হয়েছিলো।

বেটাদের হাসি খুসি বসি বসি করে মন্ত্রনা।
তাই এসে পোড়াইলে লাঙ্গুলের বাজা ॥

বীরভূম জেলার লাঙ্গুলিয়া থানা আক্রমণের কথা এই পংক্তিতে জানা যায়। বলা বাহুল্য যে এই গানে বীরভূম ও সাঁওতাল পরগনার গ্রামের নাম দেখে মনে হয় যে লোক কবি এই অঞ্চলের লোক।

ঢুকলো বাঁশকুলি কুলি কুলি বাজিয়ে নাকাড়া।
বাঁশরা, মুলুক, তালবেড়ের লোক হলো ভাগোড়া ॥

সাঁওতাল পরগণার গ্রাম বাঁশকুলির ভেতর রাস্তায় নাকড়া বাজিয়ে সাঁওতাল ঢোকার খবর পেতে পেতেই বাঁশরা, মুলুক, তালবেড়ে প্রভৃতি গ্রামের লোক পালিয়ে যায়।

এই গানের অনেক পাঠান্তর আছে। অন্য একজনের নিকট সংগৃহীত গানের পাঠ :—

বাঁশকুলি কুলি কুলি বাজায়ে নাকড়া।
উদাসিনী কামবাসিনী হইল ভাগোড়া।

কামবাসিনী প্রতিষ্ঠিত গ্রাম্য দেবতা। সাঁওতালরা এত প্রচণ্ড অত্যাচার করেছে যে দেবতাও ভেগে গেছে।

লুটলে রামপুর, কাঠিকুর আর বেদেনারাণপুর।
পাহার রাজার মাটি লুটলি কত দূর ॥
পরেরপুরের ঘরে ঘরে কাটিল বিস্তর।
ভাণ্ডিবনের গোপাল ঠাকুর মনে পেয়েছেন ডর ॥

পরিহারপুর গ্রাম সাঁওতাল পরগণায় অবস্থিত। এখানে সাঁওতালরা চূড়ান্ত অত্যাচার করেছিলো। ভাণ্ডিবনের গোপাল বিগ্রহসেবা এখনও বর্তমান। এই মন্দির দুইশত বৎসর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত। এখানের গোষ্ঠ ও রাসমেলা বিখ্যাত।

ঘর বাড়ী কুড়ি কুড়ি ভাঙ্গলে দালান কোঠা।
কুমড়োবাদের লোকগুলোকে করলে কুমড়ো কাটা ॥

এই কুমড়োবাদ গ্রামও সাঁওতাল পরগণায় অবস্থিত।

দু'জনা রাজপুত যমের দূত ঢাল কাঁধে করে।
তাই সাহেবরা পলাই ছুটে মুরগী কাঁধে করে॥
আল্লা রাখ জান মেহের বাণ সিন্নী দোব কোথা।
ফুল বাগানে কাটলে এসে তৌসিলদারের মাথা॥
বেটাদের এক বুলি কুলি কুলি দেয় না ঘরের কাঠি।
সাত হাজার সাঁওতালে লুটলে মহেশপুরের মাটি॥
রাজা প্রাণ ভয়ে রাণী লয়ে পলায় দক্ষিণে।
সাঁওতালের হাতে পুত্র ত্যজিল পরাণে॥
ওহে হরি মরি মরি ধিক আমাদের প্রাণ।
কাঁদিতে কাঁদিতে রাজা গেলেন বদ্দমান॥

কোন বড় জমিদারের পরিণামের কথাই বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এই গানের কথায় ঐতিহাসিক ব্যক্তিকে খুঁজে পাওয়া যায় না।

রক্তে ভাসলো নদী হাদি গাদি শুন সভে ভাই।
ধনুক ধরিয়া আমরা ইংরেজ মেরে যাই॥
ইংরেজ পিছু হলো তোপ গাড়িল তোপে দিল টানা।
আড়াই শ' গ্রামের সাঁওতাল নাইক একজনা॥
পাঁচশ' হাতি তুরূপ গাঁধি আনিল বিস্তর।
লি সাঁওতাল করবো আজ পৃথিবী ভিতর॥
সাঁওতাল কাটা গেল ভালই হলো করে গো বিকুলি।
সাঁওতালদের মেয়েগুলো বেড়ায় কুলি কুলি॥*

*সাঁওতাল বিদ্রোহে উপদ্রুত এলাকা জাওীরবন রাইপুর হ'তে শ্রীনতা প্রসন্ন মান্না ও উপদ্রুত অঞ্চল সাদিপুর—সাঁওতাল পরগণা—হ'তে শ্রীগঙ্গাধর চক্রবর্তীর নিকট সংগৃহীত॥

'সাদিপুরে লুটলে এসে কাপড়ের বুঝা'—বীরভূমের ইতিহাসে সংগৃহীত ছড়া হতে। এবং 'জাওীবনের গোপাল ঠাকুর মনে পেয়েছেন ডর।'—এই প্রবন্ধে সংগৃহীত ছড়া।

সংগ্রহ পঞ্জী

	বর্ণানুক্রমিক সূচী	যার নিকট হতে সংগৃহীত তার নাম	ঠিকানা	পৃষ্ঠা
	অ			
১।	অচিনপুরের মনের মানুষ কোন বা স্থানে যাও	শ্রীনবীন ধর বাউল	কেন্দুয়া, বীরভূম	২
২।	অবোধ নারী করে সব যৌবনের গোরব	শ্রীগোপাল ডোম	কালীপুর, শিউরী, বীরভূম	৫
৩।	অমুককে পেয়ে মাগো তুমি দিও বর	শ্রীযোগেশ মাল	আড্ডা, শিউরী, বীরভূম	৯
৪।	অপ্সরী কিন্নরী আর মানবী রাক্ষসী	শ্রীগোপাল দাস	খোড়ামাঠ, করিধ্যা, বীরভূম	৮২
৫।	অংগদ নামেতে তুই বালীর নন্দন	ঐ	ঐ	৮৪
৬।	অকালে ভাংগাইলে ওগো কুম্ভকর্ণের নিদ্রা	ঐ	ঐ	৮৫
৭।	অতি সুসংগিনীর চিত্ত অতিভাব বিপরীত	অভিলাষ বাগদী	জামথলিয়া, দুবরাজপুর, বীরভূম	১২৮
৮।	অগ্রাণ মাসে নবান্ন হয় সরু ধান্য কেটে	সত্যকিংকর দাস	গোবিন্দপুর, শিউরী, বীরভূম	৪০
	আ			
৯।	আম ধরে থোবা থোবা	অভিলাষ দাস	জামথলিয়া, দুবরাজপুর, বীরভূম	৩২
১০।	আঠরো গণ্ডা মরাই ভীম গামছাতে বান্ধিল	নবনী ধর দাস	কেন্দুয়া, বীরভূম	৩৭
১১।	আশ্বিনে অম্বিকা পূজা মেষ মহিষের ঘটা	সত্যকিংকর দাস	গোবিন্দপুর, শিউরী, বীরভূম	৫২
১২।	আগুন বাড়ী খুঁজলাম, বেগুন বাড়ী খুঁজলাম	অম্বিকা চরণ ওঝা	গোবিন্দপুর (অস্থায়ী বাসস্থান	৫৩
১৩।	আমি ব্রজের রাই কিশোরী	কালিপদ গড়াই	করিধ্যা, শিউরী, বীরভূম	৬০
১৪।	আর ত আমি ভুলবো না শ্যাম	কালিপদ গড়াই	ঐ	৬৩

বর্ণানুক্রমিক সূচী	যার নিকট হতে সংগৃহীত তার নাম	ঠিকানা	পৃষ্ঠা
১৫। আমি আছি ভয় কিবা সাগর লংঘিব	শ্রীগোপাল দাস	বোড়ামাঠ, করিধ্যা, বীরভূম	৮১
১৬। আর গন্ধুর এসে জীয়াইল প্রভু দয়াময় বলে	ঐ	ঐ	৮৪
১৭। আগুনের ভিতরে সীতা হাসে খলখল	ঐ	ঐ	৮৭
১৮। আমার মূলাধারে কুণ্ডলিনী	যোগেশ চন্দ্র ঘোষ	গড়জুড়ি, সাঁওতাল পরগণা, বিহার	১০৪
উ			
১৯। উলু উলু মান্দারের ফুল	অনিমা ঘোষ	বাতিকার, ইলামবাজার, বীরভূম	৩১
২০। উজান টানে রাধার তরী ভেসে যায়	কালিপদ গড়াই	করিধ্যা, শিউরী, বীরভূম	৬৩
এ			
২১। এস পৌষ যেয়ো না	গোবিন্দপুর গ্রামের মায়েদের কাছে সংগ্রহ	গোবিন্দপুর, শিউরী, বীরভূম	৪০
২২। এই রথেতে আছেন ভগবান	কালিপদ গড়াই	করিধ্যা, শিউরী, বীরভূম	৬০
২৩। এলাম রথে প্রভাসেতে দেখিতে হরি	কালিপদ গড়াই	করিধ্যা, শিউরী, বীরভূম	৬৪
২৪। এখানে আছে এক সর্প পথ আগুলিয়া	শ্রীগোপাল দাস	বোড়ামাঠ, শিউরী, বীরভূম	৭১
২৫। এই বারেতে সোণার লংকার স্বর্ণচূড়া	শ্রীগোপাল দাস	বোড়ামাঠ, শিউরী, বীরভূম	৮২
২৬। একে একে সখিরা সব স্নানে নামিল	শ্রীভক্তি চিত্রকর	পানুরিয়া, শিউরী, বীরভূম	১১৮

বর্ণানুক্রমিক সূচী	যার নিকট হতে সংগৃহীত তার নাম	ঠিকানা	পৃষ্ঠা
২৭। এ মাগো চল দিব প্রতিফল	শ্রীমতি কনক নলিনী সরকার	গোবিন্দপুর, শিউরী, বীরভূম	১২৮
২৮। এগুকার নারী জলকে যায়	ঐ	ঐ	১২৯
২৯। এক এক সখি ভেবে দেখ দেখি	শ্রীমতি আকালি দাস	ঐ	১২৯
ও			
৩০। ও মহিষাল বন্ধুরে কোথা যাওরে গুণী	শ্রীপঞ্চা দাস	কুষ্টিকুড়ির মাঠ, ইলামবাজার, বীরভূম	৮,
৩১। ওহে কৃষ্ণ কংসারী, হয়েছ তুমি সংসারী	বাশী মাল	গোবিন্দপুর, শিউরী, বীরভূম	৬১
৩২। ওরে ঠেংগুয়ারে রত্না চলিত তরি গাগরি	শামু মাল	ঐ	৬৯
৩৩। ও রামের মা ও রামের মা আজকে রামের অধিবাস	বীরভূম জেলার ভাদু গানের দলে শোনা যাবে	—	৮১
৩৪। ও মা ছি ছি লাজে মরি দেখে হাসি পায়	যোগেশ ঘোষ	গড়জুড়ি, সাঁওতাল পরগণা, বিহার	১০২
৩৫। ওহে দক্ষ আমার বাক্য কর অবধান	ঐ	ঐ	১০৩
৩৬। ওহে যোগী দেখেছি কোথায় আমরা তোমায়	যোগেশ ঘোষ	গড়জুড়ি, সাঁওতাল পরগণা, বিহার	১১২
ক			
৩৭। কবি চন্দ বলে মাগো অবণীতে চল	শংকর গোয়ালী	বিস্মৃত (কিন্তু দামোদর নদী রাণীগঞ্জের ঘাটে পার হয়ে মেঝে ইত্যাদি অঞ্চলে অনেক গ্রামেই গোয়ালী জাতির বাস। তা ছাড়া এই ছড়া একটু পরিবর্তিতভাবে নিতাই চিত্রকর-ইটেগড়েজুনিদপুর বীরভূম এর নিকটও পাওয়া গেছে)	১৪

বর্ণানুক্রমিক সূচী	যার নিকট হতে সংগৃহীত তার নাম	ঠিকানা	পৃষ্ঠা
৩৮। কাঁদির বাড়ী মুরকি মুড়ি	শ্রীমতি আকালি দাস	গোবিন্দপুর, শিউরী, বীরভূম	৩২
৩৯। কাটা গাছ বাড়ে তবু হিংসা গাছ না বাড়ে	শ্রীনবীন ধর দাস	কেন্দুয়া, বীরভূম	৩৭
৪০। কোথা হতে আসিলে ভাই অন্ধকার রাতি	শ্রীধনপতি ভাণ্ডারী	লায়েকপুর, লাভপুর, বীরভূম	৪৫
৪১। কে হে তুমি আছ দ্বারে রুধিয়া আমায়	ঐ	ঐ	৪৮
৪২। কাঁহাকার দাঁতিনী দন্ত করমর করে	শামু মাল	গোবিন্দপুর, শিউরী, বীরভূম	৬৯
৪৩। কৌশল্যা রাণী গর্ভে জন্মিল রঘুমণি	গোপাল দাস	ঝোড়ামাঠ, শিউরী, বীরভূম	৭৫
৪৪। কৌশল্যা বলিছে রাজা ওদের পুত্তু কেনে	বাণী মাল	গোবিন্দপুর, শিউরী, বীরভূম	৭৮
৪৫। কুম্ভকর্ণ মরে গেইছে আর কিবা ভয়	বাণী মাল	ঐ	৮৬
৪৬। কোথাকার জংলা ছেলে জন্ম নিলে এ জংগলে	কালিপদ গড়াই	করিধ্যা, শিউরী, বীরভূম	৯০
৪৭। কড়ার কর রাজা কথার সময়ে	ঐ	ঐ	৯০
৪৮। কি করে বলবো তোমার পূর্ণব্রহ্ম সনাতন	ঐ	ঐ	৯১
৪৯। কর যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ আরম্ভন	যোগেশ ঘোষ	গড়জুড়ি, সাঁওতাল পরগণা, বিহার	১০৩
৫০। কি করব গো যোগী শিংগায় গৌরীর গুন গায়	যোগেশ ঘোষ	গড়জুড়ি, সাঁতওাল পরগণা, বিহার	১১১
৫১। কার তরে যোগী হয়েছ	ঐ	ঐ	১১১
৫২। কি [illegible] গিরিবাসী এল আমার শংকরী	ঐ	ঐ	১১৪

বর্ণানুক্রমিক সূচী	যার নিকট হতে সংগৃহীত তার নাম	ঠিকানা	পৃষ্ঠা
৬৫। ছুট ছুট কুঁড়ি দুহু হাঁসুলী	শামু মাল	গোবিন্দপুর, শিউরী, বীরভূম	৬৮
জ			
৬৬। জগতের দুঃখের বালা রাখিবার তরে	ভক্তি চিত্রকর	পান্নুরিয়া, শিউরী, বীরভূম	১২
ঝ			
৬৭। ঝাঁই বাজে ঝংকার বাজে বাজে করতাল	শামু মাল	গোবিন্দপুর, শিউরী, বীরভূম	৬৭
ট			
৬৮। টিকি নারে ঘুঁটো	বিস্মৃত	বালিচুর মাঝিপাড়া, রাজনগর থানা, বীরভূম	২৩
ঠ			
৬৯। ঠাকুর বাড়ীর কাল তুলুসীপাত ঢলমল করে	ডাক্তার কাকার স্ত্রী	গোবিন্দপুর, শিউরী, বীরভূম	৫৪
ঢ			
৭০। ঢোল, কাঁসি, কাড়া, শিংগা, নাকড়া বাজায়ে	কালিপদ গড়াই	করিধ্যা, শিউরী, বীরভূম	৮৫
ত			
৭১। তারিণী যদি বিচার করে তবে ভবে শমনে	যোগেশ ঘোষ	গড়জুড়ি, সাঁওতাল পরগণা, বিহার	১১৫
৭২। তোমরা কেউ দেখেছরে ভাই	ঐ	ঐ	১১৫
থ			
৭৩। থাক পৌষ থাক তুমি ঘরেতে	গোবিন্দপুরে মায়েদের নিকট সংগ্রহ		৪২

বর্ণানুক্রমিক সূচী	যার নিকট হতে সংগৃহীত তার নাম	ঠিকানা	পৃষ্ঠা
দ			
৭৪। দর্প করে বলছে ব্যাঙ	গোপাল ডোম	কালিপুর, শিউরী, বীরভূম	৬
৭৫। দাদাভাই চালভাজা খায়	বহরমপুর যাওয়ার পথে ঠিকানা বিহীন ভিখারী	—	৩১
৭৬। তুয়ার ভাংগানী ছড়া শুন সর্বজনে	শ্রীধনপতি ভাণ্ডারী	লায়েকপুর, লাভপুর, বীরভূম	৪৯
৭৭। দিকে দিকে জাগলো দেখ বসন্তের বা	ডাক্তার কাকার স্ত্রী	গোবিন্দপুর, শিউরী, বীরভূম	৫৪
৭৮। দশ মুণ্ড কুড়ি হাত পর্বত প্রমাণ	বাশী মাল	গোবিন্দপুর, শিউরী, বীরভূম	৮৮
৭৯। দে দে শিংগা ডম্বুরে	যোগেশ ঘোষ	গড়জুড়ি, সাঁওতাল পরগণা, বিহার	১১১
ধ			
৮০। ধান ভানরে মুরলী বসনী	শ্রীকনক নলিণী সরকার	গোবিন্দপুর, শিউরী, বীরভূম	২৮
৮১। ধৈর্য্য ধর সীতা তুমি হয়ো না উন্মাদ	গোপাল ডোম	ঝোড়ামাঠ, শিউরী, বীরভূম	৮৪
৮২। ধরেছি যজ্ঞের ঘোড়া আমরা তুইজনে	বাশী মাল	গোবিন্দপুর, শিউরী, বীরভূম	৮৯
ন			
৮৩। নাগর ছেড়ে দে কলসীর কানা যায় বেলা	সত্য প্রসন্ন মান্না	ভাণ্ডীরবন, রাইপুর	৮
৮৪। নব ঘন কার্ত্তিক আমাকে ছেলে দাও	শ্রীমতিসূত্রধর	গোবিন্দপুর, শিউরী, বীরভূম	৩২
৮৫। নেশা ছাড়া জগতে কিছু নাই ভেবে	বাশী মাল	গোবিন্দপুর, শিউরী, বীরভূম	৫৮

বর্ণানুক্রমিক সূচী

	বর্ণানুক্রমিক সূচী	যার নিকট হতে সংগৃহীত তার নাম	ঠিকানা	পৃষ্ঠা
৯৮।	বল বাবা রাম লক্ষণ কোন পথে যাইবে	বাণী মাল	গোবিন্দপুর, শিউরী, বীরভূম	৭৯
৯৯।	বিশ্বামিত্তা বলে বাবা দশরথ নন্দন	ঐ	ঐ	৭৯
১০০।	বিশ্বা মিত্তা মুনি তখন করিলা গমন	ঐ	ঐ	৮০
১০১।	বনের বিড়াল সেও চায় দেখতে সীতার মুখ	ঐ	ঐ	৮৩
১০২।	বিদ্যুজিল রামের মুণ্ড বসাইয়া দিল	বাণী মাল	ঐ	৮৩
১০৩।	বুঝিলাম ঘরের ভেদ দিল কে তাহারে	ঐ	ঐ	৮৬
১০৪।	বর বেশে গিরির ভবনে শূলপাণি	যোগেশ ঘোষ	গড়জুড়ি, সাঁওতাল পরগণা, বিহার	১০১
১০৫।	বেলা অবসান আয়ান চলিল বাড়ী	শ্রীআকালি দাস	গোবিন্দপুর, শিউরী, বীরভূম	১২৫
১০৬।	বণিকে নোঙর করে জলের উপর	শ্রীমাগারাম দাসের মা	হালসোত, দুবরাজপুর, বীরভূম	১৩৬
	ভ			
১০৭।	ভীমেরে ডাক দিয়া বলেন মাতাঠাকুরাণী	শ্রীনবনী ধর দাস	কেন্দুয়া, বীরভূম	৬৬
১০৮।	ভবানীর ভয়ে ভব মোহিত হইয়া	শ্রীধনপতি ভাণ্ডারী	লায়েকপুর, লাভপুর, বীরভূম	৪৬
১০৯।	ভিক্ষা দে ভিক্ষা দে বলে ত্রিপুরারী	যোগেশ ঘোষ	গড়জুড়ি, সাঁওতাল পরগণা, বিহার	১১২
	ম			
১১০।	মন দিয়া শোন সবে কোপিলা মংগল	শংকর গোয়ালী	বাঁকুড়া জেলা	১১